সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

দ্বাবিংশ ভাগ—প্রথম সংখ্যা

—০—

পত্রিকাধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ্ ডি

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

সূচী

২৪৩।১ নং আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press',
9, Kantapukur Bye Lane, Calcutta.

১৩২২

গ্রাহকপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸৹ বার আনা।

মফস্বলে ৩৷৵৹ তিন টাকা ছয় আনা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(দ্বাবিংশ ভাগ)

বৰ্দ্ধমানের কথা

যে বর্দ্ধমানে সাহিত্য-সম্মেলনের আয়োজন হইয়াছে—এই বর্দ্ধমান কত দিনের? কোন্ সময় হইতে বর্দ্ধমান নামকরণ হইয়াছে? বর্দ্ধমানের কোন্ অংশে সর্ব্বপ্রথম সভ্যতালোক প্রবেশ করে? কোন্ কোন্ স্থান প্রাচীন ও অতীত গৌরবের নিদর্শন? বর্ত্তমান সম্মেলনে তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার জন্য বর্দ্ধমানের অভ্যর্থনা-সমিতি আমার উপর ভারার্পণ করেন। আমিও সমিতির আহ্বান শিরোধার্য্য করিয়া প্রথমে বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বাংশ পরিদর্শনে বাহির হই। কিন্তু যে যে স্থান দর্শন করিব আশা করিয়াছিলাম, দৈব বাধা-বিপত্তিতে ও সময়াভাবে তাহার অনেক স্থানই দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। নানা অন্তরায় ও বিপদের মধ্যে সমিতির আদেশ প্রতিপালন-উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র বিবরণী প্রকাশিত হইল। রাঢ়ভূমির হৃদয়-স্বরূপ বর্দ্ধমান-ভূভাগের প্রকৃত পরিচয় দান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। সমগ্র বর্দ্ধমান-বিভাগ-পরিদর্শন,—বহুকালসাধ্য অতীত গৌরব-কীর্ত্তি রক্ষার আয়োজন, আমার বা এই অস্থায়ী সমিতির সাধ্যায়ত্ত নহে। সম্মুখে যে অনন্ত কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া আছে, আমাদের অতীত গৌরবের স্পর্দ্ধা করিবার নানা সম্পদ্ বর্দ্ধমানের নানা স্থানে যাহা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সেই সকলের পরিচয় দিতে হইলে রাঢ়বাসীর সমবেত উদ্যোগ আবশ্যক। এই মহান্ উদ্দেশ্য সুসাধনকল্পে রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্য এখনও প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হয় নাই। আমাদের সর্ব্বজন-মান্য অনুসন্ধান-সমিতির পৃষ্ঠপোষক বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, আমাদের পূজ্যপাদ সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও সমিতির অধিকাংশ সদস্যই বর্ত্তমান সম্মেলন-ব্যাপারে জড়িত আছেন। আশা করা যায়, সম্মেলন-উৎসব সুসম্পন্ন হইবার পরই অনুসন্ধান-সমিতি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন।

বর্ত্তমান সাহিত্য-সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির উৎসাহে গত ৬ই ফাল্গুন হইতে ১৫ই ফাল্গুনের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি দর্শন করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল—

কাঁটোয়া, দাঁইহাট, জগদানন্দপুর, অগ্রদ্বীপ, ঘোড়াইক্ষেত্র, বেগে, দেবগ্রাম, বিক্রমপুর, বিশ্বেশ্বর, কুলাই, কেতুগ্রাম ও অট্টহাস। আমার পরিদর্শন-কার্য্য অতি সত্বর সমাধা করিবার

অভিপ্রায়ে আমাদের রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতির পৃষ্ঠপোষক মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধি-রাজ বিজয়চন্দ্র মহ্‌তাব্‌ বাহাদুর এবং অগ্রদ্বীপের জমিদার শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় স্ব স্ব হস্তী দিয়া আমার এই কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন প্রসূন-সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয় কুলাই, কেতুগ্রাম ও অট্টহাসে আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং কাঁটোয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার এই অনুসন্ধান-কার্য্যে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই সুযোগে আমি সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

সময়াভাবে অপরাপর বহু স্থান দর্শনের যেমন সুযোগ ঘটে নাই, যে যে স্থান পরিদর্শন করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবারও সুবিধা হয় নাই। যে বিবরণ মুদ্রিত হইল, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ পরিচয় বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

অভ্যর্থনা-সমিতির অভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় মহাশয়ের লিখিত 'বর্ত্তমান বর্দ্ধমান' শীর্ষক প্রবন্ধ বিবরণীর সহিত প্রকাশিত হইল। অল্প দিনের উদ্যোগের ফল এই অসম্পূর্ণ বিবরণী পাঠ করিয়া কেহ যেন নিরুৎসাহ বা আমাদের উপর অসন্তুষ্ট না হন, ইহাই এই অধমের একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

বর্দ্ধমানের পুরাকথা

বর্দ্ধমান নাম কত দিনের

মার্কণ্ডেয়পুরাণে (৫৮।১৪) ভারতবর্ষরূপ কূর্ম্মের মুখদেশে তাম্রলিপ্ত ও একপাদপদেশের পরই বর্দ্ধমানের উল্লেখ আছে। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতাতেও ভারতের পূর্ব্বদিকে তাম্রলিপ্তের সহিত এই বর্দ্ধমানের প্রসঙ্গ পাইতেছি।[১] এদিকে মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্রের সহিত সুহ্মের উল্লেখ আছে,[২] কিন্তু বর্দ্ধমানের উল্লেখ নাই। ভীমের পূর্ব্ব-দিগ্বিজয় উপলক্ষে সভাপর্ব্বে লিখিত আছে, 'পাণ্ডববীর (ভীম) মোদাগিরিস্থিত অতিবলশালী রাজাকে মহাসমরে বাহুবলে নিহত করিলেন। পরে তীব্র-পরাক্রম ও মহাবাহু পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেব এবং কৌশিকীকচ্ছ-নিবাসী রাজা মহৌজা এই দুই নৃপতিকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবিত হইলেন। সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন নরপতিকে পরাজয় করিয়া তাম্রলিপ্তরাজ, কর্ব্বটাধিপতি, সুহ্মাধিপতি ও সাগরবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন।'[৩] কালিদাসের রঘুবংশে লিখিত আছে, 'জয়ী রঘু পূর্ব্বদিকে সমস্ত জনপদ আক্রমণ করিয়া মহাসাগরের তালীবনশ্যামল উপকূলে উপনীত হইলেন। সুহ্মগণ বেতলতার মত জড়সড় হইয়া উদ্ধতগণের উন্মূলনকারী রঘুর নিকট নত হইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। পরে (রঘুবীর) নৌবলসম্পন্ন বঙ্গদেশীয় ভূপালগণকে বাহুবলে উৎখাত করিয়া গঙ্গাপ্রবাহ-মধ্যবর্ত্তী দ্বীপের উপর জয়স্তম্ভ সকল

---

(১) বৃহৎসংহিতা ১৩।৭, ১৬।৩।

(২) মহাভারত, আদিপর্ব্ব ১০৪ অঃ।

(৩) "অথ মোদাগিরৌ চৈব রাজানং বলবত্তরম্।
পাণ্ডবো বাহুবীর্য্যেণ নিজঘান মহামৃধে॥
ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্॥
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ॥
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ॥"

(সভাপর্ব্ব ৩০।২১—২৪)

স্থাপন করিয়াছিলেন।'[৪] পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'বিষয়' শব্দের জনপদ অর্থ-প্রসঙ্গে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্রের একত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়।[৫]

সিংহলের বৌদ্ধ ইতিহাস দীপবংশ ও মহাবংশ হইতে জানিতে পারি, বুদ্ধদেবের সমকালে লালের রাজধানী সিংহপুর হইতে বিজয় নির্ব্বাসিত হইয়া সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহা হইতেই সিংহল সভ্যতালোকে আলোকিত হইয়াছিল।

জৈনদিগের সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ আচারাঙ্গসূত্র পাঠে জানা যায়,—(২৪শ তীর্থঙ্কর মহাবীর বা) বর্দ্ধমানস্বামী 'লাঢ়'দেশে 'বজ্জভূমি' ও 'সুব্ভভূমি'র মধ্যে অতিকষ্টে ১২ বর্ষ কাটাইয়াছিলেন। তৎকালে বজ্জভূমিতে কুকুরের বড় উৎপাত ছিল। অনেক সন্ন্যাসী কুকুর তাড়াইবার জন্য দণ্ড লইয়া বেড়াইতেন। জৈন সূত্রকার লিখিয়াছেন যে, লাঢ়দেশে ভ্রমণ করা কঠিন।[৬] জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনাসূত্রেও আর্য্য বা পুণ্যভূমিসমূহের মধ্যে কোটিবর্ষ ও রাঢ়দেশের উল্লেখ আছে।[৭]

জৈনদিগের সর্ব্বপ্রাচীন অঙ্গ আচারাঙ্গসূত্রে যে বজ্জভূমি ও সুব্ভভূমির উল্লেখ আছে, তাহাই আমাদের পুরাণে বর্দ্ধমান ও সুহ্ম নামে পরিচিত হইয়াছে এবং সেই সুপ্রাচীন কালে প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সুহ্ম ও বর্দ্ধমান রাঢ়দেশেরই অন্তর্গত ছিল। মহাভারত-টীকাকার নীলকণ্ঠ সুহ্মেরই অপর নাম 'রাঢ়' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[৮] এদিকে মার্কণ্ডেয়-পুরাণ ও মহাভারতের শ্লোক একত্র পাঠ করিলে সুহ্ম ও বর্দ্ধমান অভিন্ন বলিয়াই যেন মনে হইবে। কিন্তু বরাহমিহির রাঢ়ের উল্লেখ না করিলেও সুহ্ম ও বর্দ্ধমান পৃথক্ ভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। উপরি উক্ত প্রমাণগুলি একত্র আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, বরাহমিহিরের সময়ে যে স্থান সুহ্ম ও বর্দ্ধমান নামে পরিচিত ছিল, বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থে সেই উভয় স্থানই

---

(৪) "পৌরস্ত্যানেবমাক্রামংস্তাংস্তান্ জনপদান্ জয়ী।
প্রাপ তালীবনশ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ॥
অনম্রাণাং সমুদ্ধর্ত্তুস্তস্মাৎ সিন্ধুরয়াদিব।
আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈর্বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম্॥
বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ॥"
(রঘুবংশ ৪।৩৪-৩৬)

(৫) "বিষয়াভিধানে জনপদে লুব্ বহুবচনবিষয়াৎস্বত্বং। অঙ্গানাং বিষয়ো দেশঃ অঙ্গাঃ। বঙ্গাঃ। সুহ্মাঃ। পুণ্ড্রাঃ।" (মহাভাষ্য ৪।২।১)

(৬) আয়ারঙ্গসুত্ত ১।৮।৩।

(৭) "কোড়িবরিসং ব লাঢ়া"—পন্নবণা।

(৮) "সুহ্মাঃ রাঢ়াঃ"—মহাভারত, সভাপর্ব্ব ৩০।২৪ নীলকণ্ঠটীকা।

একত্র রাঢ় বলিয়া পরিচিত হইয়াছে,—তবে সুহ্ম নাম অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলিয়াই মনে হইবে। সুতরাং পূর্ব্বকালে সুহ্ম, রাঢ় ও বৰ্দ্ধমান বলিলে সময় সময় এক স্থানই বুঝাইত।

যাহা হউক, আমরা বুঝিতেছি যে, বৰ্দ্ধমান নামটী নিতান্ত আধুনিক নহে, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীরও বহুপূর্ব্বে মার্কণ্ডেয়পুরাণের সময় হইতেই বৰ্দ্ধমান নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ২৪শ তীর্থঙ্কর বৰ্দ্ধমানস্বামী এখানে দ্বাদশ বর্ষকাল অতিবাহিত করায় জৈনসমাজে এই স্থান পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বৰ্দ্ধমানস্বামীর পুণ্য সমাগমে এই স্থান বৰ্দ্ধমান নামে পরে পরিচিত হইয়া থাকিবে।

আচারাঙ্গসূত্রের মতানুসারে বলিতে হয় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রাঢ়দেশ বজ্রভূমি ও সুহ্ম এই দুই অংশে বিভক্ত ছিল, তৎপরে কিছুকাল এক হইয়া যায়। গুপ্ত-সম্রাট্‌গণের প্রভাব খর্ব্ব হইলে নানা সামন্তগণের স্বাধীনতা-গ্রহণের সহিত খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী হইতে রাঢ়ের অন্তর্গত সুহ্ম ও বৰ্দ্ধমান আবার স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়া গণ্য হইতে থাকে।

বৰ্দ্ধমানের প্রাচীন ভূ-সংস্থান

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দশকুমারচরিতে দামলিপ্তকে সুহ্মের অন্তর্গত[৯] বলা হইয়াছে, এ অবস্থায় বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার কতকটা তৎকালে সুহ্ম বা রাঢ় বলিয়া পরিচিত ছিল। গঞ্জাম্‌ হইতে আবিষ্কৃত ২য় মাধবরাজের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, কোঙ্গোদপতি মাধবরাজ কর্ণসুবর্ণপতি শশাঙ্করাজকে আপনার অধীশ্বর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এ অবস্থায় বলিতে পারা যায় যে, কর্ণসুবর্ণ বা বৰ্দ্ধমানপতি শশাঙ্করাজের সময় সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত[১০] ও উৎকল পর্য্যন্ত রাঢ়দেশ বিস্তৃত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই কারণেই সম্ভবতঃ দক্ষিণরাঢ়ের সুদূর দক্ষিণে অবস্থিত ময়ূরভঞ্জ অদ্যাপি অধিবাসিগণের নিকট রাঢ় বলিয়া পরিচিত।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে এই বৰ্দ্ধমান জেলায় যে স্থানে সাতশত ঘর ব্রাহ্মণের উপনিবেশ ছিল ও ব্রাহ্মণগণের আধিপত্য চলিত—সেই স্থানই সাতশতকা বা সাতশইকা পরগণা নামে পরিচিত। বলা বাহুল্য—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ গৌড়াধিপপ্রদত্ত অধিকাংশ শাসন গ্রাম এই বৰ্দ্ধমান জেলায় লাভ করিয়া গ্রামীণ বা গ্রামাধিপ হইয়াছিলেন, অদ্যাপি তাঁহাদের বংশধরগণ তত্তৎগ্রামীণ বা গাঞী নামেই পরিচিত। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে এই স্থান বিভিন্ন রাজবংশের শাসনে ও সাম্প্রদায়িক বৈচিত্র্যে উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ় এই দুই খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়। উত্তররাঢ়ের পালবংশের অধিকারে বৌদ্ধপ্রভাব, এবং দক্ষিণরাঢ়ে শূর ও দাস প্রভৃতি বংশের কর্ম্মনিষ্ঠতায় ব্রাহ্মণপ্রভাবের সন্ধান পাই। সম্ভবতঃ এই সাম্প্রদায়িক ও রাজনীতিক পার্থক্য হইতেই রাঢ়দেশের বিভিন্ন জাতির মধ্যে উত্তররাঢ়ীয় ও দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রেণীবিভাগ ঘটিয়াছিল।

---

(৯) দশকুমারচরিত, ৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

(১০) জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ 'পন্নবণা' বা প্রজ্ঞাপনাসূত্রের মতে "তামলিত্তি বঙ্গায়" অর্থাৎ বঙ্গের মধ্যে তাম্রলিপ্ত। এই প্রমাণে বলা যাইতে পারে যে, কোন সময়ে তাম্রলিপ্ত বঙ্গের মধ্যেও পরিগণিত হইত

খৃষ্টীয় ৯ম হইতে ১১শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ পাল, বর্ম্ম ও চন্দ্রবংশের শাসনে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা পৌণ্ড্রভুক্তি, শ্রীনগরভুক্তি ও তীরভুক্তি এই তিনটী ভুক্তি বা Provinoe এর উল্লেখ পাইয়াছি। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ মহারাজ বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসনে আমরা সর্ব্বপ্রথম বর্দ্ধমানভুক্তির সন্ধান পাই। এখন বর্দ্ধমান বিভাগ বলিলে যতটা বুঝায়, পূর্ব্বকালে ইহার অধিকাংশ বর্দ্ধমানভুক্তি নামে পরিচিত ছিল। তবে মহাভারত ও রঘুবংশ-রচনা-কালে বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগের সর্ব্ব নিম্ন দক্ষিণ অংশের কতকটা সমুদ্রতরঙ্গ বিধৌত বা জাঙ্গলরূপে পরিগণিত ছিল, পূর্ব্বোদ্ধৃত ভীমের দিগ্বিজয় এবং রঘুর দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গ হইতে তাহার কিছু কিছু আভাস পাইতেছি।

আবার বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেনের সমকালে লিখিত ধোয়ী কবির 'পবনদূত' কাব্যে সুহ্মের মধ্যে লক্ষ্মণসেনের রাজধানী বিজয়পুর কীর্ত্তিত হইয়াছে। এ অবস্থায় সেনরাজবংশের রাজত্বকালে সুহ্ম বর্দ্ধমানভুক্তির মধ্যেই ছিল বলা যাইতে পারে। যাহা হউক উপরি উক্ত প্রমাণ হইতে বেশ বুঝিতেছি যে, বর্দ্ধমান নামটীও অতি প্রাচীন ও বহু পূর্ব্বকাল হইতেই একটী স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। তবে রাঢ় বলিলে তদপেক্ষা বৃহৎ জনপদও বুঝাইত। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ লিখিয়া গিয়াছেন, "গঙ্গার দুই ধারে লখ নৌতীরাজ্যের দুইটী পক্ষ, পূর্ব্বদিকে রাল (রাঢ়), এই ধারেই লখ্‌নোর নগর এবং পশ্চিম বরিন্দ (বরেন্দ্র) নামে খ্যাত, এই ধারেই দেওকোট নগর।" মিন্‌হাজের এই উক্তি হইতে মনে হয় বর্ত্তমান বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, সাঁওতাল পরগণা, ও হুগলী জেলা তৎকালে রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল।

উপরে বর্দ্ধমানের যে সীমা দিলাম, তাহা ঠিক কতটা ছিল তাহা বলা কঠিন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে রেনেল সাহেব যে বাঙ্গালার মানচিত্র প্রকাশ করেন, সেই মানচিত্রে বর্দ্ধমানের উত্তরে বীরভূম, দক্ষিণে মেদিনীপুর ও হুগলী জেলা, পূর্ব্বে হুগলী, কৃষ্ণনগর ও রাজসাহী জেলা এবং পশ্চিমে পঞ্চকোট, বিষ্ণুপুর ও মেদিনীপুর জেলা পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে রচিত—ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ড[১১] নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—'পুণ্ড্রদেশ সপ্ত প্রদেশে বিভক্ত—গৌড়, বরেন্দ্র, নিবৃত্তি, নারীখণ্ড, বরাহভূমি, বর্দ্ধমান ও বিন্ধ্যপার্শ্ব। ইহার মধ্যে বর্দ্ধমান মণ্ডল ২০ যোজন।'[১২] খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে রচিত দিগ্বিজয়-প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থের মতে—'অজয়নদের দক্ষিণভাগে, শিলাবতী নদীর উত্তরে, গঙ্গার পশ্চিমপারে এবং দারিকেশি নদীর পূর্ব্বে দৈর্ঘ্য ১১ যোজন ও প্রস্থে ৮ যোজন পরিমিত বর্দ্ধমান দেশ।'[১৩] 'ইহার মধ্যভাগে দামোদর প্রবাহিত হইতেছে, পূর্ব্বদিকে যে সমস্ত

বর্দ্ধমানের পূর্ব্ব আয়তন

---

(১১) হ হ উইলসন্ সাহেবের মতে এই গ্রন্থ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের পর রচিত হয়। Indian Antiquary, 1891. Vol XX. p. 419 দ্রষ্টব্য।

(১২) ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড ৬।২।

(১৩) বিশ্বকোষ, ১৭শ ভাগ ৬১২-৬২৮ পৃষ্ঠার মূল বচন দ্রষ্টব্য

নদী আছে, তন্মধ্যে মুণ্ডেশ্বরী, বকুলা ও সরস্বতী নদীই প্রধান। দক্ষিণেও বড় নদী আছে।' ব্রহ্মখণ্ডের মতে, 'বর্দ্ধমানের মধ্যে বহুসংখ্যক নগর ও গ্রাম আছে, তন্মধ্যে এই কয়টী প্রধান— খাটুল, দারিকেশিনদীর পার্শ্বে জানাবাদ, মায়াপুর, শঙ্কর-সরিৎপার্শ্বে গরিষ্ঠ গ্রাম, মুণ্ডেশ্বরীর নিকট শ্রীকৃষ্ণনগর (খানাকুল), এখানে অভিরামপ্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দর, দামোদরের পার্শ্বে রাজবল্লভ, ভাগীরথীর পার্শ্বে বিদ্যাস্থান নবদ্বীপ—গৌরাঙ্গের জন্মস্থান, নালাজোর, একলক্ষক, রাঘববাটিকা, অম্বিকা, বালুগ্রাম, মীরগ্রাম, ভূরিশ্রেষ্ঠিক, সেনাপি, জনায়ি, স্ফুরণ, আক্কন, তট, স্বর্ণটীক, বর্দ্ধমানের দক্ষিণে পারুল, কুমারবীথিকা, কুলক্ষিপ্তা, কপল, লৌহপুর, গোবর্দ্ধন, হান্তক, শ্রীরামপুর, বেলুন, অগ্রদ্বীপ, পাটলি, কর্ণগ্রাম, জ্যোতিবনি, চন্দ্রপুর, বলিহারিপুর, বচ্ছিকবালা, কুশমান, গঙ্গচারি, জাবট, চন্দ্রলেশ ও জাঙ্গলের নিকট রসগ্রাম। এ ছাড়া ৮টী পত্তনের নাম যথা—বৈষ্ণপুর, পাটলি, শিলাবতীনদীর পার্শ্বে লোহদা, দামোদরের নিকট চন্দ্র-বাটী, বর্দ্ধমানের পশ্চিমাংশে বৃশ্চিকপত্তন, ত্রিবক্রসরিৎপার্শ্বে হাটকনগর, ভাগীরথীর পশ্চিমে বিল্বপত্তন এবং বর্দ্ধমানের ত্রিশক্রোশ দূরে সামন্তপত্তন।'[১৪]

উদ্ধৃত গ্রাম ও নগরাদির অবস্থান আলোচনা করিলে বলিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলা ব্যতীত বর্ত্তমান হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, পাবনা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কতকাংশ পূর্ব্বে বর্দ্ধমান প্রদেশের অন্তর্গত ছিল।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, জৈন আচারাঙ্গসূত্রের মধ্যে বজ্জভূমির পথে কুকুরের উৎপাত উল্লেখ পাইয়া কেহ কেহ বলিতে চান যে, ২৪শ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর সময় বজ্জভূমি বা বর্দ্ধমান জন-পদ বন্যজন্তুর বিহারক্ষেত্র ও অসভ্য লোকের বাসস্থান বলিয়াই গণ্য ছিল।

বর্দ্ধমানের সভ্যতা

বাস্তবিক সে সময় বর্দ্ধমান সেরূপ বন্য ও অসভ্য ছিল না। তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই এ অঞ্চলে উচ্চ সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল এবং পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়বীরগণের বাস ছিল, কুরুক্ষেত্রের মহাসমরেও যে তাঁহারা স্ব স্ব বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, মহাভারতেই তাহার বর্ণনা রহিয়াছে। মহাবীর স্বামীর সময়েই শাক্যবুদ্ধের আবির্ভাব। সিংহলের পালি-মহাবংশেই প্রকাশ যে, তৎকালে সিংহপুরে রাঢ়ের রাজধানী ছিল এবং তথায় সিংহবাহু রাজত্ব করিতেছিলেন। দুষ্কর্ম্মের জন্য তিনি আপন প্রিয়পুত্র বিজয়কে তাঁহার সাত শত অনুচরসহ নির্ব্বাসন করেন। তৎকালেও রাঢ়বাসী যে, সমুদ্রগামী নৌকা ব্যবহার করিতেন এবং মহা-সমুদ্রের উর্ম্মীমালা ভেদ করিয়া সমুদ্রান্তরে ভিন্ন দেশে যাতায়াত করিতে সমর্থ ছিলেন, ঐ মহা-বংশ হইতেই তাহার প্রমাণ পাইতেছি।

তৎকালে বর্দ্ধমান, রাঢ় বা সুহ্মপ্রদেশের পার্শ্ব ভূভাগ সমুদ্র-তরঙ্গ বিচুম্বিত ছিল। বর্দ্ধমানস্বামীর আগমনকালে যে স্থান বজ্জভূমি নামে পরিচিত ছিল, তাহাই মার্কণ্ডেয়-পুরাণে ও বরাহমিহিরের গ্রন্থে 'বর্দ্ধমান' নামে সম্ভবতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ

---

(১৪) ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড ৭ম অধ্যায়।

শতাব্দীতে গ্রীকরাজদূত মেগস্থিনিস্ Gangaridæ নামে একটী বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী জনপদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'যে বিস্তৃত জনপদের রাজধানী পাটলিপুত্র সেই প্রাচ্য জনপদের পূর্ব্বদিকে উক্ত 'গঙ্গারিডি' জনপদ।'[১৫] প্রাচীন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক দিওদোরস্ মেগস্থিনিসের দোহাই দিয়া লিখিয়াছেন,—'গঙ্গানদী গঙ্গারিডির পূর্ব্ব সীমা হইয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে।' আবার প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমীর মতে 'গঙ্গার মোহানার অদুরস্থিত প্রদেশে গঙ্গারিডিগণের বাস। এখানকার রাজা 'গঙ্গে' নগরে বাস করেন।'[১৬] সুপ্রাচীন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকের উক্তি হইতে বেশ মনে হইবে যে, বর্ত্তমান ভাগীরথীর পশ্চিম কূল হইতে প্রাচীন মগধের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত রাঢ়দেশই 'গঙ্গারিডি' নামে পরিচিত ছিল। প্লিনি লিখিয়াছেন,—'গঙ্গার শেষাংশ গঙ্গারিডি-কলিঙ্গির মধ্য দিয়া গিয়াছে।'[১৭] প্লিনির এই বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, কলিঙ্গের উত্তরাংশ বা উৎকলের কতকটা তৎকালে রাঢ়দেশের অন্তর্গত ছিল। কাহারও মতে গঙ্গারাঢ়ী বা গঙ্গালীই গ্রীক্-ভাষায় গঙ্গারিডি হইয়াছে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক দিওদোরাস্ বলিতেছেন,—'গঙ্গারিডিগণের অসংখ্য রণদুর্ম্মদ হস্তী থাকায় কখন কোন বিদেশীয় রাজা তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে পারে নাই। কারণ অপর দেশের লোকেরা সকলেই সেই হস্তীকে ভয় করে।' প্লিনি লিখিয়াছেন—'সর্ব্বদা ৬০০০০ পদাতি, ১০০০ অশ্বারোহী ও ৭০০ হস্তী সুসজ্জিত থাকিয়া সেই রাজ্যের নরপতির দেহরক্ষা করিতেছে। রাজধানীর নাম পর্থলিস্ বা পরতালিস্'। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে পেরিপ্লস্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, 'গঙ্গে বন্দর হইতে শ্রেষ্ঠ মস্‌লিন, প্রবাল, ও নানা দ্রব্য রপ্তানী হইত।' রোমের মহাকবি ভার্জ্জিল খৃষ্টপূর্ব্ব ১ম শতাব্দীতে উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, 'তিনি জন্মস্থানে ফিরিয়া যাইবেন, তথায় মর্ম্মরের একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবেন, তন্মধ্যে রোমসম্রাটের মূর্ত্তি রাখিবেন,—মন্দিরের দ্বারদেশে স্বর্ণ ও গজদন্তের গঙ্গারিডিগণের অপূর্ব্ব যুদ্ধের চিত্র ও সম্রাট্ কুইরিনাশের লাঞ্ছন আঁকিবেন।'[১৮] সিংহলের কবি-ঐতিহাসিকের মহাবংশ ও গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা হইতে আমরা বেশ বুঝিতেছি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব ১ম শতাব্দী পর্য্যন্ত রাঢ়দেশ সভ্যতার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিল।

বর্দ্ধমান বা রাঢ়ের প্রাচীন রাজধানী

সিংহলের মহাবংশে পাইতেছি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে 'সিংহপুর' নামক স্থানে রাল বা রাঢ়ের অধীশ্বর সিংহবাহু রাজত্ব করিতেন। তৎকালে এখানে সিংহের বড়ই উৎপাত ছিল, তাহা হইতে অথবা সিংহবাহুর বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিবার জন্য মহাবংশকার রাঢ়াধীশ্বরকে সিংহীর দুগ্ধে প্রতিপালিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সেরগড়পরগণায় সিংহারণ নামে যে নদী আছে, কেহ কেহ মনে করেন ঐ

(১৫) McCrindle's Ancient India as described by Megasthenes and Arrian, p. 58.
(১৬) McCrindle's Ptolemy, p. 172.
(১৭) McCrindle's Megasthenes, p. 135.
(১৮) Georgics, III, 27.

নদীর তীরে সিংহপুর রাজধানী ছিল,—এখানে সিংহবাহু রাজত্ব করিতেন। সিংহপুর ধ্বংস হইলে এই স্থান 'সিংহারণ্য' নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই সিংহারণ্য হইতেই 'সিংহারণ' নদীর নামকরণ হইয়া থাকিবে।

তৎপরে গ্রীক ও রোমকদিগের বিবরণী হইতে পাইতেছি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ হইতে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর মধ্যে বর্দ্ধমানপ্রদেশে পরতালিস্ (Portalis), গঙ্গৈ (Gangai) ও কাটাদপা (Katadupa) নামে তিনটী প্রধান নগর বা বন্দর ছিল। ফরাসীপুরাবিদ্ সেণ্টমার্টিন বর্ত্তমান বর্দ্ধমান সহরকেই Parthalis বা Portalis স্থির করিয়াছেন। এই নামটী দেশীয় 'পরতাল' শব্দেরই বিকৃত রূপ বলিয়া মনে হয়। দিগ্বিজয়প্রকাশে সপ্তজাঙ্গলের বিবরণের পর বঙ্গাল-পরতালের প্রসঙ্গ আছে। এই প্রসঙ্গ অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, বর্ত্তমান রাঢ় ও পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যস্থলে 'পরতাল' বলিয়া কোন প্রসিদ্ধ স্থান ছিল এবং বিক্রমপুরে সেই পরতালরাজের প্রমোদভবন ছিল।[১৯] যদি দিগ্বিজয়প্রকাশের 'পরতাল' এবং গ্রীক ঐতিহাসিক-গণের Parthalis বা Portalis এক হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান সহরকে Portalis বলিয়া ধরিয়া লইতে সন্দেহ হয়। যাহা হউক এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আবশ্যক।

'গঙ্গৈ' বন্দর কোথায় ছিল, তাহা এখন স্থির করা কঠিন। তৎকালে যেখানে গঙ্গাসাগরসঙ্গম ছিল, সেই স্থানেই 'গঙ্গৈ' বন্দর হওয়া সম্ভবপর। কণ্টপদ্বীপ বা কাঁটাদীয়ার অপভ্রংশে 'কাটাদপা' হইয়া থাকিবে, এখন কাঁটোয়া নামেই পরিচিত।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক রাঢ়দেশে আগমন করেন। তিনি এখানকার সমৃদ্ধির কথা উজ্জ্বল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে সুহ্ম, রাঢ় বা বর্দ্ধমানভুক্তি কর্ণসুবর্ণ নামে পরিচিত ছিল। তৎকালে এই স্থান বহু জনাকীর্ণ, বহু ধনকুবের ও বিদ্যানুরাগী জনগণের বসবাস ছিল। তৎকালে এখানকার রাজধানী কর্ণসুবর্ণে ১০টী মাত্র বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, কিন্তু নানা সম্প্রদায়ের ৫০টী দেবমন্দির ছিল। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, এখানে বৌদ্ধসম্প্রদায় অপেক্ষা অপর সম্প্রদায়ের লোকই বেশী ছিল। তখনকার এই কর্ণসুবর্ণ বা রাঢ়ের রাজধানী লইয়া মত ভেদ আছে। কেহ বলেন, বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় রাঙ্গামাটী বা কাণসোণা নামক স্থানে, আবার কেহ বলেন যে, বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী কাঞ্চন-নগরেই কর্ণসুবর্ণের প্রাচীন রাজধানী ছিল। বলা বাহুল্য এই দুইটী স্থানই এক সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও রাঢ়ীয় সভ্যতার কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিল এবং এখনও উভয় স্থানেই সেই অতীত কীর্ত্তির নিদর্শন বিদ্যমান। উক্ত উভয় স্থান ব্যতীত এই বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে সিংহারণ, প্রদ্যুম্নপুর, শূরনগর, মন্দারণ, ভূরসুট প্রভৃতি শত শত

---

(১৯) "বিদ্বজ্জনানাং যাসশ্চ বিক্রমপুর্য্যাশ্চ ভূরিশঃ।
পরতালভূমিপস্ত ভোবিহ্বলং বিদুর্ব্বুধাঃ॥" দিগ্বিজয়প্রকাশ ৯২)

স্থানে পূর্ব্ব-ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার যথেষ্ট নিদর্শন ছড়াইয়া রহিয়াছে। আশা করি, রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতি সেই সকল কীর্ত্তির তত্ত্বোদ্ধারে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

খৃষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে সমগ্র রাঢ়দেশ শূরবংশীয় নৃপতিগণের অধিকারভুক্ত ছিল। তৎপরে পালরাজগণের প্রভাববিস্তারের সহিত তাঁহাদের অধিকারভুক্ত স্থান উত্তররাঢ় এবং শূর ও দাসবংশের অধিকারভুক্ত স্থান দক্ষিণরাঢ় নামে পরিচিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার উত্তরাংশে ও মুর্শিদাবাদ জেলায় অদ্যাপি উত্তররাঢ়ীয়দিগের আদি সমাজস্থান এবং বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণাংশে এবং হুগলী জেলা ও ২৪ পরগণার মধ্যে দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগের সমাজস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বর্দ্ধমানজেলাস্থ শূরনগর, প্রদ্যুম্নপুর ও গড়মন্দারণ নামক স্থানে বিভিন্ন শূররাজের এবং হুগলীজেলাস্থ ভূরসুট নামক স্থানে দাসবংশের ও তৎপরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণরাজবংশের রাজধানীর চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

ধর্ম্মপ্রভাব

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, জৈনদিগের প্রজ্ঞাপনাসূত্র নামক উপাঙ্গে রাঢ়দেশ পুণ্যভূমি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কল্পদ্রুমকালিকা নামে জৈন কল্পসূত্রের টীকায় পাওয়া যায় যে, মহাবীর স্বামী এখানকার কেবল সুসভ্য জাতি বলিয়া নহে, অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও ধর্ম্মালোক বিতরণ করিয়াছিলেন। এই বর্দ্ধমানস্বামীর পুণ্য-সংস্রবে সম্ভবতঃ অতি পূর্ব্বকাল হইতেই জৈনসমাজে বর্দ্ধমান পুণ্যভূমি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাবও রাঢ়দেশে অল্পদিন হয় নাই। বশিষ্ঠের সিদ্ধিস্থান তারাপীঠ ও কিরীটেশ্বরী বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার বাহিরে হইলেও বর্দ্ধমানভুক্তি বা রাঢ়দেশের মধ্যেই অবস্থিত। রাঢ় বা বর্দ্ধমানপ্রদেশ এক সময়ে শৈব ও শাক্তগণের লীলাস্থান বলিয়া গণ্য ছিল, তাহার কারণ ৫১টী পীঠের মধ্যে এই রাঢ়দেশেই ৯টী ডাকার্ণব পীঠ অবস্থিত। কুব্জিকাতন্ত্রের ৭ম পটলে কর্ণস্বর্ণ বা কর্ণসুবর্ণ, ক্ষীরগ্রাম, বৈদ্যনাথ, বিল্বক, কিরীট, অশ্বপ্রদ বা অশ্বতীর্থ, মঙ্গলকোট ও অট্টহাস এই আটটী সুপ্রাচীন সিদ্ধপীঠের উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য, মুসলমান-আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই ঐ সকল স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।[২০] ঐ সকল স্থান বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিলে এখনও প্রাচীন কীর্ত্তির বহু নিদর্শন বাহির হইতে পারে।

আরও কত শাক্তস্থান আছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ অসম্ভব। এইরূপ যে সকল শৈব-কীর্ত্তি আছে তন্মধ্যে বৈদ্যনাথ ও বক্রেশ্বর সর্ব্বপ্রাচীন ও প্রধান। এইরূপ ভক্তপ্রবর জয়দেবের লীলাস্থলী কেন্দুবিল্ব—বৈষ্ণবজগতে আজও প্রধান পুণ্যস্থান বলিয়া

(২০) তন্ত্রচূড়ামণি নামক পরবর্ত্তী সংগ্রহ গ্রন্থে (রাঢ়দেশের মধ্যে) বহুলা, উজানী, ক্ষীরখণ্ড, কিরীট, নলহাটী, বক্রেশ্বর, অট্টহাস ও নন্দিপুর এই ৯টীকে মহাপীঠ স্থান বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু তৎপরে রচিত শিব-চরিতসংগ্রহ গ্রন্থে অট্টহাস, নলহাটী ও নন্দিপুর উপপীঠ মধ্যে গণ্য এবং তৎপরিবর্ত্তে সুগন্ধা, রণখণ্ড ও বক্রনাথ এই তিনটী মহাপীঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এরূপ মতভেদস্থলে অতিপ্রাচীন কুব্জিকাতন্ত্রের মতই গ্রহণীয়।

কীর্ত্তিত হইতেছে। রাঢ়দেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ধর্ম্মপূজার অল্প-বিস্তর প্রচার আছে। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীমহাশয় এই ধর্ম্মপূজাই বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ নিদর্শন বলিয়া বহুদিন প্রমাণ করিয়াছেন। তাহা অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। মুসলমানপ্রভাবকালে সাধু ও ভক্তপ্রভাবে যে সকল অসংখ্য পীঠ ও পাটের উৎপত্তি হইয়াছে, এই সংক্ষিপ্ত পুরাতত্ত্ব মধ্যে সে সকলের আর উল্লেখ করিলাম না। "বর্ত্তমান বর্দ্ধমান" প্রসঙ্গে তাহার কিছু কিছু আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

বর্ত্তমান বর্দ্ধমান

অবস্থান

বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বে ভাগীরথী। ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরে নবদ্বীপের চতুঃপার্শ্বস্থ কিঞ্চিৎ ভূভাগ ভিন্ন নদীয়া জেলার সমস্ত অংশ ভাগীরথীর পূর্ব্ব-তীরে অবস্থিত। দক্ষিণে হুগলী জেলা, পশ্চিমে বাঁকুড়া ও মানভূম। উত্তরে সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ। পূর্ব্বের সীমা-রেখা যেমন ভাগীরথী, উত্তরে তেমনই কোন কোন স্থানে অজয় এবং পশ্চিমে দামোদর ও বরাকর।

আয়তন ও লোক-সংখ্যা

বর্দ্ধমান জেলার আয়তন ২৬৯১ বর্গ-মাইল। লোকসংখ্যা ১৫৩৮৩৭১। সদর, আসানশোল কাঁটোয়া ও কালনা এই চারিটি মহকুমা। ৬টি মিউনিসিপালিটি, ১৭টি থানা এবং ২৭৬৯ গ্রাম আছে। জেলার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ১২২০৫৫১ ও মুসলমানের সংখ্যা ২৯০৬৮১।

জেলার সমস্ত লোকের মধ্যে শতকরা ১০ জন শিক্ষিত। শিক্ষায় বাঙ্গলার জেলার মধ্যে বর্দ্ধমান ৫ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। সমস্ত বাঙ্গলায় শতকরা ৩·১ ইংরাজী শিক্ষিত, বর্দ্ধমান জেলায় ৩।

বর্দ্ধমান জেলায় ২৭টি উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে ৩টি বর্দ্ধমান নগরে। তদ্ভিন্ন বর্দ্ধমান নগরে একটি ২য় শ্রেণীর কলেজ ও একটি টেক্‌নিক্যাল স্কুল আছে।

বিভিন্ন জাতি

বর্দ্ধমান জেলায় ৯৪টি জাতি আছে। ইহার মধ্যে বাগ্‌দির সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। ব্রাহ্মণ, বাউরি ও সদ্‌গোপদিগের সংখ্যা প্রত্যেকের এক লক্ষের অধিক। তদ্ভিন্ন উগ্রক্ষত্রিয়, কায়স্থ, ডোম, গোয়ালা, হাড়ি, কৈবর্ত্ত, কলু, মুচি ও তিলি জাতির সংখ্যা ২০০০০এর অধিক।

সমস্ত বাঙ্গলার উগ্রক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শতকরা ৭৭·৫ জন বর্দ্ধমান জেলায় বাস করে। তদ্ভিন্ন বাগ্‌দি, বারুই, ভুঁইয়া, ডোম, গন্ধবণিক, কলু, কোরা, মুচি ও সাঁওতাল জাতির সংখ্যা বাঙ্গলার অন্যান্য জেলা অপেক্ষা বর্দ্ধমানে অধিক। কেবল মেদিনীপুরে ব্রাহ্মণ ও সদ্‌গোপ জাতির সংখ্যা বর্দ্ধমান অপেক্ষা অধিক।

নাম

অধুনা বিভাগ, জেলা ও প্রধান নগরের নাম বর্দ্ধমান। মুসলমানদিগের আমলে বর্দ্ধমান নামে নগর, মহাল, পরগণা ও চাকলা ছিল। হিন্দুদিগের সময়ে নগর ও ভুক্তি বর্দ্ধমান নামে অভিহিত হইত। রাজ্যের এক এক বৃহৎ ভাগকে ভুক্তি বলিত। সেকালের ৬টি ভুক্তির

নাম পাওয়া যায়—বর্দ্ধমান, দণ্ড, তীর, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, জেজা ও শ্রীনগর। এক সময়ে সমস্ত মগধ ও বাঙ্গলা দেশ কোন রাজা বা সম্রাট্‌বিশেষের অধীনে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

প্রাকৃতিক বিবরণ

দামোদর, অজয় ও ভাগীরথী ভিন্ন বৃহৎ নদ নদী আর নাই। বরাকর, সিংহারণ, খড়ি, বাঁকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র নদীও জেলার মধ্যে আছে। খড়ি ও বাঁকার উৎপত্তি স্থান দেখিয়া বোধ হয়, এগুলিও কাণানদীর ন্যায় এককালে দামোদরের শাখা ছিল। বল্লুকা ও গাঙ্গুড় নদীর শুষ্ক খাত বর্দ্ধমানের সন্নিকটে বর্ত্তমান আছে। ধর্ম্মমঙ্গলে প্রথমটির ও মনসামঙ্গলে দ্বিতীয়টির উল্লেখ আছে।

বর্দ্ধমানে পাহাড়-পর্ব্বত নাই, তবে পশ্চিমাংশে প্রস্তরময় ভূমি আছে, যাহা হইতে বর্দ্ধমানের "রাঙ্গামাটী" নাম। এই অংশে "লেটারাইট"-প্রস্তর ও তজ্জাত ভূমি আছে। নিম্নে কয়লার খনি। এখানকার ভূমিতে যথেষ্ট লৌহ আছে। সদর, কালনা ও কাঁটোয়া মহকুমার ভূমি পল্বলময় ও যথেষ্ট উর্ব্বরা।

উৎপন্ন দ্রব্য

ধান্য ও কয়লা বর্দ্ধমানের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। রাণীগঞ্জে কাগজ ও বার্ণ্ কোম্পানীর মৃন্ময় দ্রব্যের কারখানা আছে। জেলায় কয়েকটি তেলের ও চাউলের কল আছে। কাঞ্চন-নগরের ছুরী-কাঁচি, বনপাশের পিত্তলনির্ম্মিত দ্রব্য ও বামের দেশীধুতি বিখ্যাত। মিহিদানা ও সীতাভোগ নামক মিষ্টান্নের জন্য বর্দ্ধমান নগর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন

রাঢ়প্রদেশে বর্দ্ধমান-ভুক্তির কতদূর বিস্তৃতি ছিল, জানিবার উপায় নাই। আইন্-ই-আকবরী গ্রন্থে শরিফাবাদ সরকারে বর্দ্ধমান একটি মহাল বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭২২ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলা দেশকে ২৩ চাকলায় বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে বর্দ্ধমান এক চাকলা। ১৭৪০ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমানের রাজা চিত্রসেন রায় এই বর্দ্ধমান চাকলার রাজরূপে দিল্লীর বাদশাহের নিকট সনন্দ প্রাপ্ত হন। মীরকাশিম নবাব হইয়া ১৭৬০ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমান চাকলা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দান করেন। তখন বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার সমস্ত এবং বীরভূম ও হুগলী জেলার কিয়দংশ ইহার অন্তর্গত ছিল। ১৮২০ খৃঃ অব্দে বাঁকুড়া ও ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে হুগলী জেলা পৃথক্ হইয়া যায়।

প্রাকৃতিক উৎপাত

১৮৫৫ খৃঃ অব্দে রেলওয়ে খুলিবার পরে বর্দ্ধমান স্বাস্থ্যনিবাস হয়। কিন্তু ১৮৬২-৭৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর অত্যাচারে বর্দ্ধমানের পল্লী ও নগর প্রায় জনশূন্য

হইয়াছিল। এখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সেরূপ না থাকিলেও বাঙ্গলার কোন অংশ অপেক্ষা অত্যাচার এখানে কম নয়।

দামোদরের বন্যায় মধ্যে মধ্যে লোকের সর্ব্বনাশ হয়। ১৭৭০, ১৭৮৭, ১৮২৩, ১৮৫৫ ও ১৯১৩ খৃঃ অব্দে দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার বহু স্থান প্লাবিত হয়। ইহাতে বহু সম্পত্তি নষ্ট হয় এবং বহু লোক ও গবাদি পশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

পরগণা

বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান জেলায় বহু পরগণা আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি নাম মুসলমান-যুগে প্রদত্ত; যথা,—শাহাবাদ, হাভেলি, মজঃফরশাহী, আমিরাবাদ, আজমতশাহী, জাহাঙ্গীরাবাদ, শেরগড়, শিলামপুর প্রভৃতি। আর কতকগুলি হিন্দু-যুগের নাম; যথা,—বর্দ্ধমান, সাতশইকা, খণ্ডঘোষ, গোপভূম, সেনভূম, শিখরভূম, সেনপাহাড়ী, চম্পানগর, ইন্দ্রাণী ইত্যাদি।

প্রবাদ

এই চম্পানগরে চাঁদসদাগরের বাটী ছিল। গাঙ্গুড় বা বেহুলা নদী দিয়া বেহুলা লখিন্দরের শবদেহ কলার মান্দাসে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। গোপভূম এককালে সদ্গোপদিগের রাজ্য ছিল। বর্দ্ধমান জেলার মানকরের সন্নিকটে গোপরাজ মহেন্দ্রনাথের গড় ছিল। ইহা উমরার গড় নামে প্রসিদ্ধ। সেনপাহাড়ীতে লাউসেনের প্রতিদ্বন্দ্বী ইছাইঘোষের রাজধানী ছিল। সেনভূম সম্ভবতঃ লাউসেনের পিতা কর্ণসেনের বা তদীয় বংশধরগণের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

গড়

বর্দ্ধমান জেলায় বহু প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কতকগুলি হিন্দু-যুগের আর কতকগুলি দুর্গ মুসলমানেরা নূতন নির্ম্মাণ করে অথবা হিন্দু-নির্ম্মিত গড়গুলিই নিজেরা ব্যবহার করিত। কয়েকটি গড়ের নাম নিম্নে লিখিত হইল,—

১, তালিতগড় বা মহবৎগড়—বর্দ্ধমানের এক ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। ইহারই নিকটে নবাবের হাটে ১০৮ শিবমন্দির অবস্থিত। ২, খাঁজাহানখাঁর গড়—বর্দ্ধমানের দক্ষিণস্থ উচালনের নিকট। ৩, শক্তিগড়—ই, আই, কোম্পানীর ষ্টেশন। ৪, রামচন্দ্রগড়—ভাঁটাকুলের নিকট। ৫, নরপালগড়—কামারকিতার নিকট। ৬, উমরারগড়—মানকরের নিকট। ৭, শেরগড়—রাণীগঞ্জের নিকট। ৮, সমুদ্রগড়। ৯, পানাগড়। ১০, রাজগড় ও আরও দুই একটি গড়ের চিহ্ন কাঁকসার নিকটে আছে। ১১, কুলীনগ্রামের গড়। ১২, মঙ্গলকোট। ১৩, গড় সোণাডাঙ্গা। ১৪ ও ১৫, দিঘা ও চুরুলিয়ার গড়। ১৬, কালনার গড়।

সম্ভ্রান্তবংশ

(১) বর্দ্ধমান-রাজবংশ, (২) শিয়ারশোল-রাজবংশ, (৩) চকদীঘির সিংহরায়, (৪) বৈদ্য-পুরের নন্দী, (৫) দেবীপুরের সিংহ, (৬) শ্রীবাটীর চন্দ, (৭) কাইগ্রামের মুন্সী, (৮) বর্দ্ধ-মানের তেওয়ারি এবং (৯) কুসুমগ্রাম, বোহার প্রভৃতি স্থানের মিঞাবংশ জেলার মধ্যে সম্ভ্রান্ত বলিয়া খ্যাত।

বর্দ্ধমান-রাজবংশ

বর্দ্ধমান-রাজবংশের স্থাপয়িতা সঙ্গমসিংহ প্রথমে বর্দ্ধমান হইতে ২॥০ ক্রোশ দূরে বৈকুণ্ঠ-পুরে বাস করিতেন। বল্লুকানদী তীরস্থ বৈকুণ্ঠপুর তখন বাণিজ্যের স্থান ছিল। এখনও এই রাজবংশের গড়খাই করা বৃহৎ বাটীর ভগ্নাবশেষ বৈকুণ্ঠপুরের প্রান্তে দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গমরায়ের পুত্র বঙ্কুবিহারী রায়। তৎপুত্র আবুরায় ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমান চাকলার ফৌজদারের অধীনে বর্দ্ধমান নগরের অন্তর্গত পেকাবে বাগান বা রেখাবে বাজারের কোতোয়াল ও চৌধুরী নিযুক্ত হন। তৎপুত্র বাবুরায় বর্দ্ধমান পরগণা ও অন্য তিনটি মহালের অধিকারী হইয়াছিলেন। তৎপুত্র ঘনশ্যাম রায় ও তৎপুত্র কৃষ্ণরাম রায়। ইনি কয়েকটি নূতন মহাল হস্তগত করিয়া বাদশাহ আওরঙ্গ-জেবের নিকট প্রথম সনন্দ প্রাপ্ত হন (১৬৮৯ খৃঃ অব্দ)। ইঁহারই সময়ে ১৬৯৭ খৃঃ অব্দে চিতুয়া বরদার জমীদার শোভাসিংহ পাঠান-সর্দ্দার রহিমখাঁর সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহী হইয়া ইঁহাকে যুদ্ধে নিহত করেন। তৎপুত্র জগৎরাম রায় দিল্লীর বাদশাহের নিকট ২য় সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া ১৭০২ খৃঃ অব্দে শত্রুকর্ত্তৃক কৃষ্ণশায়র পুষ্করিণীতে নিহত হন। ইঁহারই পুত্র বিখ্যাত যোদ্ধা কীর্ত্তিচন্দ্র। তিনি চন্দ্রকোণা, বর্দ্দা, বালিগড়ি ও বিষ্ণুপুরের রাজাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগের রাজ্য হস্তগত করেন। পরে বিষ্ণুপুরের রাজার সহিত সন্ধি করিয়া নবাব আলিবর্দ্দীর পক্ষে মার্হাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৭৪০ খৃঃ অব্দে তৎপুত্র চিত্রসেন রায় বাদশাহের ৩য় সনন্দে প্রথম রাজোপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি নিঃসন্তান হইয়া পরলোক গমন করিলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে রাজ্যলাভ করেন। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে তিনি দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদশাহের নিকট ৪র্থ সনন্দ প্রাপ্ত হন ও কিয়দ্দিন পরে মহারাজাধিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার আমলে বর্দ্ধমান চাকলা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদত্ত হইলে ইনি বীরভূমের রাজার সহিত বিদ্রোহী হন। দুইবার ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া তৃতীয় বার স্বয়ং পরাজিত হন। তৎপরে ১৭৬০ ও ১৭৬১ খৃঃ অব্দে তিনি কোম্পানীকে স্বয়ং রাজস্ব প্রদান করেন। ১৭৬২ হইতে ১৭৭৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কোম্পানী বর্দ্ধমান জমিদারী খাস দখলে রাখিয়া বর্দ্ধমান রাজকে মালিকানা প্রদান করিতেন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে মহারাজ তিলকচন্দ্রের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র তেজচন্দ্র রাজ্য প্রাপ্ত হন। ১৭৭১-১৮৩২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মহারাজ তেজচন্দ্র রাজত্ব করেন। বর্দ্ধমান জমীদারীর রাজস্ব আদায়ের জন্য মহারাজ নবকৃষ্ণ সাঁজোয়াল হইয়া ১৭৮০-১৭৮২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে ছিলেন। মহারাজ তেজচন্দ্রের সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

বর্দ্ধমানরাজ-কর্তৃক পত্তনী-প্রথার প্রচলন হইলে ১৮১৯ খৃঃ অব্দে পত্তনী-আইন বিধিবদ্ধ হয়। মহারাজ তেজচন্দ্রের পুত্র প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যু হইলে মহাতাপচাঁদ পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হন। মহারাজ মহাতাপচাঁদ ১৮৩৩-১৮৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি মহাভারত ও হরিবংশ বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া বিতরণ করেন। তিনি নামের পূর্ব্বে হিস্ হাইনেস্ (His Highness) লিখিবার অধিকার পাইয়াছিলেন ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কবি

বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ঠিক করিয়াছেন, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের ৫৬ গাঁইএর মধ্যে ২৪টি গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে আছে।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব বর্দ্ধমান জেলার কাঁটোয়ায় সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বর্দ্ধমান জেলায় শ্রীখণ্ড, কুলীন গ্রাম প্রভৃতি স্থানে বহু বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিয়া বর্দ্ধমান জেলাকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। কড়চা-প্রণেতা গোবিন্দদাস বর্দ্ধমানের কাঞ্চননগর পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ঝামটপুরে, চৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা জয়ানন্দ আমাইপুরে ও চৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা লোচনদাস কোগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অভয়ামঙ্গল বা চণ্ডী-প্রণেতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ও কাশীরামদাস বর্দ্ধমানের দামুন্যা ও সিঙ্গি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ধর্ম্মমঙ্গল-প্রণেতা ঘনরাম চক্রবর্ত্তী খণ্ডঘোষ থানার অধীন কৃষ্ণপুরে জন্ম গ্রহণ করেন ও মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। মহারাজ তেজচন্দ্রের গুরু সাধক কমলাকান্ত অম্বিকায় জন্ম গ্রহণ করিয়া চান্নায় বাল্যকাল অতিবাহিত করেন ও শেষ বয়সে বর্দ্ধমান নগরে বাস করিয়াছিলেন। রামরসায়ন-প্রণেতা রঘুনন্দন গোস্বামী মানকরের সন্নিকটে সাড়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ও বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা নীলকণ্ঠ বর্দ্ধমান জেলার লোক ছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত, দাশরথি রায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়, মতিলাল রায়, চিরঞ্জীব শর্ম্মা ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর জন্মস্থানও বর্দ্ধমান জেলায়।

বিখ্যাত গায়ক দেওয়ান মহাশয় ও "সখি! শ্যাম না আইল" গানের রচয়িতা রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বর্দ্ধমান রাজ-সংসারে চাকরী করিতেন।

বর্দ্ধমান নগরের কথা

শায়র বা পুষ্করিণী

নগরে প্রবেশ করিতেই যে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়, তাহা রাণীশায়র, মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের জননী রাণী ব্রজসুন্দরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ ঘাটে শিলালিপি আছে। ইহার পশ্চিমে শামশায়র, ঘনশ্যাম রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহার পশ্চিমে কৃষ্ণশায়র, কৃষ্ণরাম রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

কাঞ্চননগর পল্লীই পুরাতন বর্দ্ধমানের বাণিজ্যের স্থান ছিল। এই কাঞ্চননগরের ছুরী-কাঁচি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানে রথযাত্রার সময়ে মেলা হয়। মহারাজাদিগের

দুইটি কাষ্ঠের বৃহৎ রথ আছে। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে রাস্তার উপর বারদ্বারী নামে একটি ফটক আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র বিষ্ণুপুর-রাজকে পরাজিত করিয়া কীর্ত্তি-চিহ্ন স্বরূপ এই ফটক প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে ইদিলপুর। বৰ্দ্ধমান খাসে থাকিবার সময় এখানে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছারী ছিল।

পল্লী

কাঞ্চননগরের উত্তরে বাঁকা নদীর পরপারে রাজগঞ্জের মহন্ত-মহারাজের "অস্থল"। এই সন্ন্যাসিগণ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত। বর্ত্তমান মহন্ত-মহারাজ আনুমানিক দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ইহার উত্তর-পশ্চিমে লাকুর্ডি। এখানে জলের কল আছে, ১৮৮৪-৮৫ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়। নিকটেই বৰ্দ্ধমানের উত্তর-মশান-স্থিত দুর্ল্লভাকালীর মন্দির। দামোদরের তীরে ও ইদিলপুরের পূর্ব্বে দক্ষিণ-মশান-স্থিত তেজগঞ্জের কালীর মন্দির। ইহাতেই অনুমান হয়, পুরাতন বৰ্দ্ধমান ইহারই মধ্যে অবস্থিত ছিল।

লাকুর্ডির পূর্ব্বে টিকরহাট ও কোটালহাট। টিকরহাটের দামোদরকুণ্ড নামক পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় বহু দেবমূর্ত্তি ও স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছিল। কোটালহাটে সাধক কমলাকান্ত বাস করিতেন।

টিকরহাটের পশ্চিমোত্তরে কাজীর বেড় ও কাজীর হাট। তাহার পশ্চিমে মুসলমান-প্রধান গোদাপল্লী। প্রবাদ এইরূপ, পাঠানগণ প্রথমে গোদার রাজাকে পরাজিত করিয়া বৰ্দ্ধমান অধিকার করে। প্রথমে মুসলমানগণ পরাজিত হয়, পরে কৌশলে 'জীওতকুণ্ড' নষ্ট করিয়া জয় লাভ করে। যে স্থানে প্রথমে মুসলমান নিহত হইয়াছিল, তাহা সহিদতলা নামে বিখ্যাত। সেখানে একটি পুরাতন মস্‌জিদ আছে। নিকটে গোদা-রাজার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। গোদার উত্তর-পূর্ব্বে প্রান্তর মধ্যে মহারাজের দিলকুশা বা গোপালবাগ অবস্থিত।

রাজবাড়ীর উত্তর-পূর্ব্বাংশে বোরহাটে মহারাজাদিগের পুরাতন জেলখানা ছিল। অপরাধীর কারাবাসের ব্যবস্থা ১৭৯০ খৃঃ অব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী স্বয়ং গ্রহণ করেন ও এই স্থানেই বহু দিন কোম্পানীর কাছারী ছিল। ইহারই সন্নিকটে মহারাজ নবকৃষ্ণ দুই বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তেওয়ারীদিগের বসত বাটী ইহারই সন্নিকটে।

রাজবাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজ-কলেজ। ইহা প্রথমে বাঙ্গলা ও ইংরাজী বিদ্যালয়রূপে ১৮১৭ খৃঃ অব্দে স্থাপিত হয়। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে ইহা ২য় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয়। সন্নিকটে রাধাবল্লভ, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি ৩টি দেবায়তন আছে।

রাজ-কলেজের পূর্ব্বে পুরাতন চক। ইহার উত্তরাংশে আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুশ্বানের চারি বৎসর বৰ্দ্ধমানে অবস্থিতির সময় তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত জুমা-মস্‌জিদ আছে। পুরাতন চকের দক্ষিণে পীর বহরাম, শের আফ্‌গান ও কুতুব উদ্দীনের সমাধি আছে। বহরাম সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া গুরুর আদেশে

পীর বহরাম

মক্কায় পিপাসিত তীর্থযাত্রীদিগকে সুশীতল বারি পান করাইতেন, তজ্জন্য শক্কা উপাধি পান। তিনি বাদশাহ আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চট্টগ্রাম প্রদেশে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে বর্দ্ধমানে কিছুদিন অবস্থান করেন। যোগী জয়পালকে অলৌকিক কার্য্য দেখাইয়া তাঁহার আশ্রম প্রাপ্ত হন। তাঁহার রচিত কবিতার অনুলিপি বর্ত্তমান মাতোয়ালির নিকটে আছে। ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার লোকান্তর হয়। বাদশাহ জাহাঙ্গীর শের আফ্গানকে মারিবার জন্য নিজের দুধ-ভাই কুতুব উদ্দীনকে বাঙ্গলার সুবাদার করিয়া প্রেরণ করেন। রাজমহলে শের আফ্গানকে মারিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পরে শের বর্দ্ধমানে আসিয়া বাস করেন। এখানেও কুতুব উদ্দীন আগমন করিলে শের সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে কুতুবের সঙ্গিগণ তাঁহাকে অপমান করেন। শের কুতুবের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া কুতুবকে হত্যা করিলে কুতুবের অনুচরগণ শের আফ্গানকে একযোগে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন (১৬০৬ খৃঃ অব্দে)। কাহারও মতে এই ঘটনা স্বাধীনপুরে (সাধনপুর) সংঘটিত হয়। সাধনপুর পল্লী বর্দ্ধমান ষ্টেশনের উত্তরে।

এই পুরাতন চকের দক্ষিণাংশে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তূপের খিলানের উপরি ভাগকে লোকে সুন্দরের সুড়ঙ্গ বলিয়া দেখায়। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক, তাহা বোধ করি এখন সকলেই স্বীকার করিবেন।

রাজবাড়ীর পূর্ব্বাংশ আঞ্জমান বা কাছারী, মধ্যাংশ অন্তঃপুর ও পশ্চিমাংশ প্রাসাদ। এই পশ্চিমাংশের দক্ষিণ-ভাগে খক্কর সা নামক ফকীরের সমাধি আছে। এই অংশের পূর্ব্বে বরহান বাজার ছিল।

রাজবাড়ীর পূর্ব্বে শ্যামবাজারে হাস্যরসের অবতার স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথের বাসবাটী আছে। ইহারই নিকটে জনৈক রাজপুরোহিত কর্ত্তৃক ১১৬৮ সালে স্থাপিত বহু শিব-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে।

শ্যামবাজারের পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্ব্বমঙ্গলার সুবৃহৎ মন্দির অবস্থিত।

রাজবাড়ীর ঠিক পূর্ব্বে বড়বাজার ও তৎপূর্ব্বে রাণীগঞ্জ বাজার। বড়বাজার রাস্তার পার্শ্বে চার্চ্চ মিশনারি সোসাইটীর প্রথম মিশনারি ওয়েটব্রেট সাহেবের স্মৃতিচিহ্ন রূপে একটি হল ও মহারাজ আফ্তাবচাঁদ কর্ত্তৃক স্থাপিত "বর্দ্ধমান রাজ ফ্রি পাব্লিক লাইব্রেরী" অবস্থিত। ইহারই পূর্ব্বে "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" গেট। লর্ড কার্জ্জনের বর্দ্ধমানে আগমনের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ইহা বর্ত্তমান বর্দ্ধমানাধিপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইহার পূর্ব্বদিকে ১৮২০ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত গৃহ। দক্ষিণে মহারাজাধিরাজ আফ্তাবচাঁদের জনক-বংশ গোপালবাবুর সম্পূর্ণ ব্যয়ে নির্ম্মিত সুবৃহৎ টাউন-হল। টাউনহলের দক্ষিণে বীরহাটা নামক পল্লী। ভারতচন্দ্রের "আট হাট ষোল গলি বত্রিশ বাজার"এর মধ্যে ৫টি হাট বর্ত্তমান বর্দ্ধমানের পশ্চিম অংশে অবস্থিত। রাজবাড়ীর পূর্ব্বাংশ সমস্তই মুরাদপুর নামে পরিচিত ছিল। বাঁকানদীর উত্তরে বর্ত্তমান বর্দ্ধমানের অধিকাংশ

অবস্থিত। তেজগঞ্জের উত্তর-পূর্ব্বে ও বাঁকার দক্ষিণ তীরে খাজানর বেড়, জগৎ বেড় ও মিঞার বেড় অবস্থিত। বেড় সম্ভবতঃ গড়খাইকরা স্থানের নাম। ১৭৪০-১৭৬১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মার্হাট্টাগণ বর্দ্ধমানে অত্যন্ত উপদ্রব করে। সেই সময়ে এই বেড়গুলি নির্ম্মিত হয়।

খাল ও নদী

বর্ত্তমান বর্দ্ধমানের মধ্যে কেবল কাঞ্চননগর, ইদিলপুর, তেজগঞ্জ ও সদরঘাট পল্লী দামোদরের সন্নিকটে অবস্থিত। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দামোদরের বাঁধ প্রস্তুত হইলে দামোদরের শাখা কাণা নদীর মুখ বন্ধ হওয়ায় কাণা নদীর তীরে অবস্থিত গ্রামে জলকষ্ট উপস্থিত হয়। তন্নিবারণকল্পে ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে একটি সাময়িক খাল কাটা হয়। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান ইডেন খাল কাটা হয়। ইহা জুজুতি হইতে নির্গত হইয়া জলের কলের নিকট বাঁকায় মিলিত হইয়াছে, তৎপরে দামোদরের বাঁধের উত্তর পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

বাঁকা নদীর উপর ৩টি পুল আছে। প্রথম রাধাগঞ্জের পুল। ইহা ১৮২১ খৃঃ অব্দে মহারাজ তেজচন্দ্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ২য় পুল সর্ব্বমঙ্গলার ঘাটের নিকট, মিউনিসিপালিটি কর্ত্তৃক অল্পদিন হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। ৩য় বীরহাটার পুল। ইহা ১৮০২ খৃঃ অব্দে কোম্পানী কর্ত্তৃক বর্ত্তমান গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্করোডের উপর ২০০০০৲ ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়।

বাঁকার দক্ষিণ-তীরস্থ পল্লী

খাজানর বেড় খাজা আনোয়ার শব্দের অপভ্রংশ। খাজা আনোয়ার আজিমুশ্বানের মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। রহিম খাঁ চাতুরী করিয়া সন্ধির অছিলায় খাজা আনোয়ারকে ৭ জন অনুচরসহ সাক্ষাৎ করিতে বলিলে, খাজা আনোয়ার যেমন রহিম খাঁর নিকটে আগমন করিলেন, অমনই অসতর্কভাবে বহু সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন। আজিমুশ্বানের পুত্র ফরোখশিয়ার বাদশাহ হইয়া খাজা আনোয়ারের সমাধির জন্য দুই লক্ষ মুদ্রা ও কয়েকখানি গ্রাম ব্যয় স্বরূপ প্রদান করেন। তাহাতেই খাজা আনোয়ারের ও তাঁহার ৪ জন অনুচরের সমাধি সমন্বিত বেড়ের নবাববাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বাটীর সমস্ত গৃহগুলি খিলানে নির্ম্মিত। ক্ষুদ্র ইষ্টক নির্ম্মিত জালায়নগুলি দ্রষ্টব্য। গম্বুজ ব্যতীত এখানে হস্তিপৃষ্ঠের ন্যায় ২টি খিলান আছে। বৃহৎ গজগিরি পুষ্করিণীতে ১টি জলটুঙ্গি আছে।

খাজা আনোয়ার

খাজানর বেড়ের সন্নিকটে রম্‌পুর, গোলাহাট ও ভাতশালা নামক তিনটি মুসলমান-প্রধান পল্লী। খাজানর বেড়ের পূর্ব্বে জগৎ বেড় ও তাহার পূর্ব্বে নীলপুর। এই নীলপুরের সন্নিকটে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্করোডের পার্শ্বে কানাই নাটশালের দুইটি কুঠী আছে। যেটি মিউনিসিপ্যাল সীমানার বাহিরে, সেটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠী ছিল। নিকটেই বাম নামক পল্লীতে কোম্পানীর আমলে বহু তন্তুবায় বাস করিত। এখনও বামে সুন্দর দেশী ধুতি প্রস্তুত হয়। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে বা তাহার পূর্ব্বে কোম্পানী ব্যবসা বন্ধ করিলে সুকলের কুঠীর ম্যানেজার টীপ

সাহেবের স্থাপিত ডেভিড্ আর্স্কিন কোম্পানী এই কুঠী ক্রয় করিয়া নীলকুঠীতে পরিবর্ত্তিত করে। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে ইহাদের ব্যবসা ফেল হইলে, এই কুঠী বিক্রীত হয়। ইহার বর্ত্তমান অধিকারী চকদীঘির সুপ্রসিদ্ধ জমীদার রায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহরায় বাহাদুর।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক কর্ম্মচারী কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট ১৮১৬ খৃঃ অব্দে চার্চ্চ মিশন সোসাইটী স্থাপন করেন। এই মিশন কর্ত্তৃক এই সময়ে ২টি বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া পরে ১০টি পর্য্যন্ত হয়, ইহাতে ছাত্রসংখ্যা ১০০০ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠীর পশ্চিম পার্শ্বে এই মিশনের একটি আড্ডা ছিল। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে ছাত্র-সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় বিদ্যালয়গুলি উঠিয়া যায়।

অন্যান্য বিবরণ

বর্দ্ধমান নগরের দৈর্ঘ্য ৩·৮ মাইল ও বিস্তার ২·৩ মাইল; আয়তন ৮·৭১৬ বর্গ-মাইল; লোক সংখ্যা ৩৫৯২১, তন্মধ্যে হিন্দু ২৬৫৩১ ও মুসলমান ৯১৫৮।

বর্দ্ধমান নগর বিষুবরেখার ২৩° ১৪′ ১০″ উত্তরে অবস্থিত। বর্দ্ধমান নগরের কিঞ্চিৎ উত্তর দিয়া জেলার মধ্যে মকরক্রান্তি গিয়াছে। গ্রীনিচের অক্ষরেখা হইতে পূর্ব্বদিকে ৮৭° ৫৩′ ৫৫″ দূরে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০৪ ফুট উচ্চ।

বর্ত্তমান গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্করোড নগরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন কালনা, কাঁটোয়া, বাঁকুড়া ও জাহানাবাদ যাইবার বড় রাস্তা বর্দ্ধমান হইতে বাহির হইয়াছে। কাঁটোয়ার রাস্তার সহিত গৌড় হইতে বাদশাহী রাস্তা মিলিত হইয়া বর্দ্ধমান নগরের মধ্য দিয়া জাহানাবাদ অঞ্চলে গিয়াছে।

মুসলমান-যুগের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ

পাঠানেরা বঙ্গ-বিজয়ের প্রথম অবস্থায় বর্দ্ধমান জেলা অধিকার করে। তজ্জন্য ইহার অধিকাংশ শরিফাবাদ সরকারের অন্তর্গত বলিয়া আইন্-ই-আকবরীতে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে বঙ্গের শেষ স্বাধীন রাজা দাউদ খাঁর পরিবারবর্গ বর্দ্ধমান নগরে ধৃত হয়। বর্দ্ধমান শের আফ্গানের জায়গীর ছিল। সাহাজাদা খুরম বিদ্রোহী হইয়া বর্দ্ধমান অধিকার করিয়াছিলেন। শোভাসিংহের বিদ্রোহের পর অরঙ্গজেবের আদেশে সাহাজাদা আজিমুশ্বান বিদ্রোহ দমন ও পরে শান্তি স্থাপনের জন্য বর্দ্ধমানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় ৪ বৎসর বাস করেন। সুফী বায়াজিদ নামক ফকীর বর্দ্ধমানে বাস করিতেছেন শুনিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য তিনি স্বীয় পুত্র ফরোখশিয়ার ও করিম উদ্দীনকে প্রেরণ করেন। ফরোখশিয়ার স্বীয় অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ফকীরের পাদ বন্দনা করিলে ফকীর আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তুমি দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিবে।" আজিমুশ্বান বাদশাহী লাভের আকাঙ্ক্ষা নাই জানাইলে, ফকীর স্বীয় আশীর্ব্বাদ বাক্য প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না বলিয়া অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলেন।

ফকীরের ভবিষ্যদ্বাণী যে সফল হইয়া ছিল, তাহা ইতিহাসের পাঠক জানেন। ফরোখশিয়ারের ব্যয়ে নির্ম্মিত মস্জিদ ও ফকীরের সমাধি কালনা রোডের পার্শ্বে খাঁপুকুরের সন্নিকটে অবস্থিত।

বর্দ্ধমান নগরের ১ ক্রোশ পশ্চিমে নবাবের হাট নামক স্থানে মহারাজ তেজচন্দ্রের জননী মহারাণী বিষ্ণুকুমারী কর্ত্তৃক কয়েকটি মন্দির ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে স্থাপিত হয়। মন্দিরগুলি আয়ত-ক্ষেত্রাকারে অবস্থিত।

কালনার ১০৮ শিব মন্দির বৃত্তাকারে দুই পংক্তিতে অবস্থিত। কালনায় কীর্ত্তিচন্দ্রের পরবর্ত্তী কয়েকজন মহারাজের "সমাজ" আছে। দাঁইহাটে কীর্ত্তিচন্দ্রের ও পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাজদিগের "সমাজ" আছে।

শ্রীরাখালরাজ রায়।

স্থান-পরিচয়

কাঁটোয়া

কাঁটোয়া বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে একটী অতি প্রাচীন বন্দর। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক আরিয়ানের গ্রন্থে কাঁটাদীয়া বা কণ্টকদ্বীপের অপভ্রংশে 'কাঁটাদুপা' (Katadupa) নামে এই স্থান পরিচিত হইয়াছে। গঙ্গা ও অজয়-নদের সঙ্গমে অবস্থিত বলিয়া পূর্ব্বকালে দূরদেশ হইতে সমুদ্রপোত বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া এখানে আগমন করিত। যদিও এখানে এখনও জেলার মহকুমা থাকায় এই স্থান এককালে শ্রীহীন হয় নাই, কিন্তু পূর্ব্বকালের তুলনায় প্রাচীন সমৃদ্ধির কিছুই নাই। পূর্ব্বতন কীর্ত্তিরাশির অধিকাংশই গঙ্গা ও অজয়ের গর্ভশায়ী। পূর্ব্বে এই স্থান 'কাঁটাদীয়া' নামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের একটী প্রধান সমাজ বলিয়া গণ্য ছিল। মুসলমান-বিপ্লবে সেই সমাজ ভঙ্গ হয়। এই স্থানের সমৃদ্ধি ও অবস্থান লক্ষ্য করিয়া নদীয়া-বিজয়ের পরই মুসলমানেরা এখানে আসিয়া কেন্দ্র স্থাপন করেন। তজ্জন্য ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিগণ এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অনেকে পূর্ব্ববঙ্গ আশ্রয় করেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়কালে এই স্থানে বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও ভক্তগণের আশ্রম ছিল। মহাপ্রভু এই কাঁটোয়ায় আসিয়া কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষিত হন। তাহার স্মৃতি লইয়া বর্ত্তমান কাঁটোয়া সহরে 'মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের বাড়ী' বলিয়া একটী বৃহৎ দেবালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। (১ চিত্র দ্রষ্টব্য) এই মন্দিরটী বেশীদিনের প্রাচীন না হইলেও তন্মধ্যে অনেক প্রাচীন স্মৃতি এখনও বিদ্যমান। এই গৌরাঙ্গ-বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই পশ্চিমদিকে মহাপ্রভুর মস্তকমুণ্ডনের স্থান। এখানে অনেক বৈষ্ণব ভক্ত আসিয়া মাথা মুড়াইয়া কেশ দিয়া যান। এই মুণ্ডন-স্থানের পূর্ব্বদিকে মহাপ্রভুর কেশ-সমাধি ও গদাধর দাসের সমাধি রহিয়াছে। গদাধর দাস জাতিতে কায়স্থ, বাটী আঁড়িয়াদহ। তিনি চৌষট্টি মোহন্তের মধ্যে একজন। ভক্তিরত্নাকরে তাঁহার পরিচয় আছে। তিনিই এখানকার গৌরাঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। গদাধর দাসের সমাধি ছাড়াইয়া বামদিকে ঘেরা প্রাচীর মধ্যে কেশব ভারতীর সাধনা ও সিদ্ধি-স্থান। তথায় মহাপ্রভুর দীক্ষার আসন, গুরু-শিষ্যের পদচিহ্ন ও তাহার সম্মুখে মধু নাপিতের সমাধি আছে। (২ চিত্র দ্রষ্টব্য) দীক্ষা-স্থানের পশ্চিমে এখানকার গৌরাঙ্গ বিগ্রহের সেবাইত বেণীমাধব ঠাকুরের সমাধি। তৎপরে বাড়ীর ভিতর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে গদাধর দাস-প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভুর মূর্ত্তি। (৩ চিত্র দ্রষ্টব্য) তাঁহার পার্শ্বে পরবর্ত্তী কালে প্রতিষ্ঠিত নিত্যানন্দের মূর্ত্তি আছেন। মহাপ্রভুর প্রাচীন মন্দির ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় গত ১২৮৮ সালে সেই প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার হইয়াছে। ইহার সম্মুখে নাটমন্দির ও পার্শ্বে ভোগমন্দির। গদাধর দাস তাঁহার প্রিয় শিষ্য যদুনন্দন ঠাকুরকে গৌরাঙ্গের সেবার ভার দিয়া যান। এই যদুনন্দন ঠাকুরই প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব-গ্রন্থরচয়িতা। যদুনন্দন ঠাকুরের বংশধর রাঢ়ীয় শ্রেণির ব্রাহ্মণগণই এখানকার

সেবাইত। ভেট দ্বারা মহাপ্রভুর সেবা চলে, কোন দেবোত্তর নাই। গৌরাঙ্গ-বাড়ী ছাড়াইয়া কিছু দূর গেলে গঙ্গা-অজয়-সঙ্গম। এই সঙ্গম ছাড়াইয়া কিছু দূর আসিয়া গৌরাঙ্গ-ঘাট, এখন সেই প্রাচীন স্থান গঙ্গা-গর্ভে। এই খানেই কেশব ভারতীর আশ্রম ছিল। এই স্থান ছাড়াইয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে মাধাই-তলা।

কাঁটোয়া সহর মধ্যে বড়-প্রভুর আখড়া, ফরুখ্‌শিয়ারের মস্‌জিদ ও গড়খাই,* পলাশী যাইবার সময় ক্লাইব যেখানে শিবির করিয়াছিলেন, সেই স্থান এবং কেরি সাহেবের কুঠী—এই গুলি দেখিবার জিনিস।

দাঁইহাট

কাঁটোয়া সহরের সাড়ে চারি মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে দাঁইহাট। এক সময় কাঁটোয়া হইতে দাঁইহাট পর্য্যন্ত একটী বৃহৎ সংলগ্ন সহর ছিল ও লক্ষাধিক লোকের বাস ছিল। অদ্যাপি সেই প্রাচীন সমৃদ্ধির ক্ষীণ স্মৃতি বর্ত্তমান দাঁইহাট হইতে কাঁটোয়া পর্য্যন্ত বিদ্যমান। এক সময় যে এই স্থান মধ্যে কত হাট, কত মন্দির, কত ঘাট ছিল, অদ্যাপি সেই সমুদায়ের ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন গঙ্গাগর্ভের অদূরে কাঁটোয়া হইতে দাঁইহাট যাইবার রাস্তার ধারে পড়িয়া হিয়াছে। এক সময় এই স্থানেই ইন্দ্রাণী পরগণার কেন্দ্র ছিল। তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে কবি কাশীরাম এই ইন্দ্রাণীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন,—

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥"

এই দ্বাদশ তীর্থের মধ্যে অধিকাংশ কাঁটোয়া হইতে দাঁইহাট আসিবার রাস্তার ধারে অবস্থিত ছিল, এখন সেই তীর্থের ঘাট বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে, গঙ্গা তাহার এক মাইলেরও দূরে সরিয়া গিয়াছেন। কাঁটোয়া হইতে আসিবার সময় ঘোষহাটে ঘোষেশ্বর, পাতাই-হাটে পাতাই-চণ্ডী ও একাই-হাটে একাই-চণ্ডী প্রথমে নয়নগোচর হয়। ইন্দ্রাণী পরগণার রাজা ইন্দ্রেশ্বর গঙ্গাতটে যে সুবৃহৎ শিব-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, মুসলমান-হস্তে তাহা বিধ্বস্ত হইয়াছে। যেখানে সেই শিব-মন্দির বা রাজবাটী ছিল, সেই স্থান আজও "রাজার ডাঙ্গা" নামে পরিচিত। তাহার নিকটে একটি মস্‌জিদ রহিয়াছে। এই মস্‌জিদের সম্মুখে ইন্দ্রেশ্বরের দ্বারের চৌকাটের মাথার প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। এই সুচিকণ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর-খণ্ড দৈর্ঘ্যে ৭ ফুট ৮ ইঞ্চ ও প্রস্থে দেড় ফুট, ইহার মধ্য ভাগে এক দ্বিভুজ গণেশ মূর্ত্তি। (৪ চিত্র দ্রষ্টব্য) এই সুন্দর ও বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, ইন্দ্রেশ্বরের প্রস্তর-মন্দির কত বৃহৎ ও কিরূপ সুন্দর ছিল। উক্ত মস্‌জিদের ভিত্তি ও প্রাঙ্গণে এখনও পূর্ব্বতন

---

* গেজেটিয়ারে উক্ত গড় ও মস্‌জিদ মুর্শিদকুলী খাঁর (ওরফে জাফর খাঁর) কীর্ত্তি বলিয়া ধরা আছে (Burdwan District Gazetteer, 1910, p. 200) কিন্তু কাঁটোয়াবাসী ইহাকে ফরুখ্‌শিয়ারের কার্ত্তি বলিয়াই জানে।

প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন-স্বরূপ কত কাটা-পাথর রহিয়াছে, তাহা দেখিলেই ইন্দ্রেশ্বরের অতীত গৌরবের কতকটা সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। ঐ স্থানের পার্শ্ব দিয়া যে ভাগীরথী বহিতেন—এখন তিনি প্রায় এক মাইলেরও বেশী দূরে সরিয়া গিয়াছেন। মস্‌জিদ হইতে ১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে জনসাধারণে 'ইন্দ্রেশ্বরের ঘাট' দেখাইয়া থাকেন। এখানে প্রাচীন ইষ্টক-স্তূপ রহিয়াছে। আজও কেবল ইন্দ্রদ্বাদশীর দিন ইন্দ্রেশ্বরের ঘাটে বহু যাত্রী স্নান করিতে আসেন। মস্‌জিদ, তাহার নিকটস্থ 'রাজার ডাঙ্গা' এবং 'ইন্দ্রেশ্বরের ঘাট' পুরাবিদ্‌গণের অনুসন্ধের প্রাচীন স্থান।

ইন্দ্রেশ্বরের ঘাটের নিকট সিদ্ধেশ্বরী-তলার মধ্যে রামানন্দের পাট। (৫ চিত্র দ্রষ্টব্য) সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের উত্তরে রামানন্দ সিদ্ধি লাভ করেন। এখানে তাঁহার পঞ্চমুণ্ডী আসন আছে। এই রামানন্দই "শ্যামা দিগম্বরি রণমাঝে নাচো গো মা!" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গান-রচয়িতা। মন্দিরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে "কেশেগ'ড়ে"। এখানকার কেহ কেহ এই কেশেগ'ড়কে কাশীরাম দাসের স্মৃতি-জ্ঞাপক মনে করেন, কিন্তু কাশীরামের জন্মস্থান সিঙ্গি গ্রাম এই স্থান হইতে বহু দূর।

বর্ত্তমান দাঁইহাটের উত্তরাংশে দেওয়ানগঞ্জ। পূর্ব্বে এখানে বহুলোকের বসতি ও একটী বৃহৎ হাট ছিল। এখনও এখানে অনেক বড় বড় ভাঙ্গা বাড়ী পড়িয়া আছে। হাটও দাঁইহাট গ্রামের মধ্যে উঠিয়া গিয়াছে। গঙ্গাও এখান হইতে ১ মাইলের উপর সরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে এই দেওয়ানগঞ্জের হাটের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা বহিতেন এবং এই স্থানে বহুলোকের বাস ও যথেষ্ট জাঁকজমক ছিল। বিজয়রাম বিশারদের তীর্থমঙ্গল-গ্রন্থ হইতে তাহার বেশ পরিচয় পাইয়াছি। সে সময়ে এখানে 'মাণিকচাঁদের ঘাট' প্রসিদ্ধ ছিল।* এখানকার স্থানীয় লোকের মুখে শুনা যায় যে, এখানে 'পাতালঘর' আছে। পূর্ব্বে বড় বড় পাথরের মন্দির ছিল, তাহারই কতক অংশ লইয়া বর্ত্তমান 'বদরশার কবর' প্রস্তুত হইয়াছে। এই দরগার সম্মুখ-দ্বারে প্রাচীন দেবমন্দিরের শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত প্রস্তর বিদ্যমান, তাহা দেখিলেই প্রাচীন হিন্দু মন্দিরেরই নিদর্শন বলিয়া বোধ হয়। একটী বৃহৎ স্তূপের উপর বদরশার দরগা উঠিয়াছে। ইহার নিকট এখনও বহু পুরাতন কাটা-পাথর পড়িয়া আছে। ঐ দরগার সেবাইত আমায় জানাইলেন যে, বৰ্দ্ধমানরাজের দেওয়ান মাণিকচাঁদ বদরশাহ আউলিয়াকে এই স্থান দান করেন। সুতরাং যে সময়ে দেওয়ান মাণিকচাঁদ ছাড় দেন, তাহারও বহু পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুর এই দেবস্থান ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। দেওয়ান মাণিকচাঁদ হইতেই 'দেওয়ানগঞ্জ' নাম হইয়াছে।

দাঁইহাটের পূর্ব্ব গৌরবের শেষ চিহ্ন ভাস্করবংশ এখনও বিদ্যমান। ভাস্কর শিল্পনৈপুণ্যে এখানকার ভাস্করবংশ বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ। দাঁইহাটের পার্শ্বে জগদানন্দপুরে উত্তররাঢ়ীয়

* তীর্থমঙ্গল ১০১১ শ্লোক (সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ)

৪। ইন্দ্রেশ্বরের দ্বারের মাথার অংশ

৫। দাঁইহাটের নিকটবর্ত্তী সিদ্ধেশ্বরীর ভগ্ন মন্দির ও রামানন্দের সিদ্ধিস্থান

ঘোষচৌধুরীবংশের প্রতিষ্ঠিত একটী বৃহৎ রাধাগোবিন্দের মন্দির আছে। কাশী, মৃজাপুর প্রভৃতি স্থান হইতে নানা বর্ণের পাথর আনাইয়া তদ্দ্বারা এই সুন্দর মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এরূপ ভাস্কর্য্য ও শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত চমৎকার বৈষ্ণব-মন্দির রাঢ়দেশে বিরল। (৬ চিত্র দ্রষ্টব্য) কএকটী প্রাচীন নিদর্শন ব্যতীত দাঁইহাটের পাইকপাড়ার পার্শ্বে জঙ্গল শাহের গড়ের চিহ্ন এবং প্রাচীন গঙ্গা-গর্ভের অদূরে বর্দ্ধমানরাজের সমাজবাড়ী বিদ্যমান। (৭ চিত্র দ্রষ্টব্য) বর্ত্তমান বর্দ্ধমান-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আবুরায় হইতে মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানাধিপগণের ঐ সমাজ-বাড়ী মধ্যে অস্থিসমাধি আছে।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, গঙ্গা দাঁইহাট হইতে সরিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু গত বর্ষ হইতে গঙ্গা-প্রবাহ ধীর মন্থর গতিতে আবার যেন পূর্ব্ব গর্ভে ফিরিয়া আসিতেছেন।

বিল্বেশ্বর ও কুলাই

কাঁটোয়া সহর হইতে ৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অজয়ের তীরে প্রাচীন কুলাই গ্রাম। কাঁটোয়া হইতে ২॥০ ক্রোশ দূরে কুলাই যাইবার পথে বিল্বেশ্বর। তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিতে দেখা যায়—অট্টহাসে যে ফুল্লরা শক্তি আছেন, বিল্বেশ্বর বা বিল্বনাথ তাঁহারই ভৈরব। বিল্বেশ্বরের প্রাচীন মন্দির নষ্ট হওয়ায় বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে শিবরাত্র ও চড়ক-সংক্রান্তির সময় বহু জনতা হয়। এই বিল্বেশ্বর হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে কুলাই। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা মহাপ্রভুর পার্ষদ বাসুদেবঘোষ ঠাকুরের জন্মস্থান বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে এই স্থান প্রসিদ্ধ। ঘোষঠাকুরের পিতামহ গোপাল ঘোষ ফতেসিংহ পরগণাস্থ রসোড়া হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র বল্লভ ঘোষ বাইশটী করণ করিয়া উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

"রসোড়া ছাড়িয়া গোপাল কুলায়ে বসতি।
বাইশ বল্লভঘোষ নাম হইল খ্যাতি॥" (কুলপঞ্জী)

এই বল্লভঘোষের ৯ পুত্র—১ম পক্ষে বাসুদেব, গোবিন্দ ও মাধব, ২য় পক্ষে দনুজারি, কংসারি ও মীনকেতন এবং ৩য় পক্ষে জগন্নাথ, দামোদর ও মুকুন্দ। ইঁহারা সকলেই মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত ছিলেন। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ চৈতন্যদেবের অনুবর্ত্তী হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। এই গোবিন্দ ঘোষই অগ্রদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ গোপীনাথ-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। অগ্রদ্বীপ-প্রসঙ্গে তাঁহার কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কংসারি ঘোষের সন্তানেরা অদ্যাপি কুলাই গ্রামে বাস করিতেছেন। এই ঘোষবংশেই দিনাজপুরের মহারাজ সর্ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর এবং রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর জন্মলাভ করিয়াছেন।

কুলাই গ্রামে অজয়ের তীরে গৌরাঙ্গের বিশ্রামস্থান ও উহার এক পোয়া উত্তরে গ্রামের মধ্যে বাসুদেব ঘোষঠাকুরের সাধনার স্থান এবং বাসুদেব, গোবিন্দ, মাধব প্রভৃতির বাসচিহ্ন

আছে। এখানে বাসুদেবঘোষ যে নিম্ববৃক্ষতলে বসিয়া সাধনা করিতেন, সেই নিম্ববৃক্ষ লইয়া গিয়াই মহাপ্রভুর বিগ্রহ মূর্ত্তি প্রস্তুত হয়। কাহারও মতে সেই বিগ্রহ কাঁটোয়ায়, কাহারও মতে শ্রীখণ্ডে বর্ত্তমান।

কেতুগ্রাম

(বহুলাপুর)

কুলাই হইতে দেড় ক্রোশ দূরে কেতুগ্রাম। কেতুগ্রামের পটী বহুলাপুরে বহুলাদেবী একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে এই মূর্ত্তি এই স্থান হইতে এক মাইল দূরে মরাঘাটে ছিলেন, পরে তাঁহাকে সেখান হইতে আনিয়া গ্রাম মধ্যে রাখা হয়, অল্প দিন হইল বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, বহুলা এই গ্রাম মধ্যেই বরাবর ছিলেন, তাঁহারই দেবসেবার জন্য বহুলাপুর নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাঁহার নাম হইতেই কেতুগ্রামের পটী বহুলাপুরের নামকরণ হইয়াছে। তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিতের মতেও এই স্থানের নাম 'বহুলা' এবং এখানে ভগবতীর বামবাহু পতিত হওয়ায় এই স্থান মহাপীঠ মধ্যে ধরা হইয়াছে। বাস্তবিক বহুলাদেবী এবং তাঁহার বর্ত্তমান মন্দিরের পার্শ্বস্থ পুষ্করিণীর ঘাটে যে সকল পুরাতন কাটা-পাথর পড়িয়া আছে, তাহা দেখিলেই এই স্থান যে বহুদিনের পুরাতন, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। বহুলার পুরোহিত মহাশয়ের নিকট শুনা গেল, এই গ্রামের পশ্চিমে ভূপাল-রাজার পাথরের দালান ছিল, বহুলার পুষ্করিণীর ঘাটে যে সকল কাটা-পাথর পাওয়া যায়, তাহা উক্ত দালানের ধ্বংসাবশেষ হইতে আনা হইয়াছে।

এখানে প্রবাদ আছে যে, কেতুগ্রামে চন্দ্রকেতু রাজা রাজত্ব করিতেন, এই চন্দ্রকেতু হইতেই কেতুগ্রাম নামের উৎপত্তি। চন্দ্রকেতুর রাজপ্রাসাদের নিকট এক পুষ্করিণীর সহিত অপর এক পুষ্করিণীর মধ্যে যাতায়াতের সুড়ঙ্গ ছিল। রাজবাটী পাথরের ছিল। তাঁহার সময়ে এখানে বিস্তর অট্টালিকা ও পাকা রাস্তা ছিল। এখনও এ অঞ্চলে সর্ব্বত্র মৃত্তিকা মধ্যে পুরাতন ইট পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বর্ত্তমান কেতুগ্রাম থানার নিকট পুরাতন ভাঙ্গা ইটের ঢিবি আছে এবং তাহার চারিদিক খনন করিলেই বহু পুরাতন ইট বাহির হয়।

বহুলাদেবীর (বহুলাক্ষীর) পরিমাণ উচ্চতায় ৩।৷০ হাত, কালপাথরে গড়া, অতি সুন্দর মূর্ত্তি—দেখিলে নয়ন-মন মুগ্ধ হয়। দেবীর ডান পার্শ্বে গণেশ ও বাম পার্শ্বে শক্তিধর। মূল মূর্ত্তি সর্ব্বদাই কাপড়ে ঢাকা থাকেন। বহু অনুরোধের পর মূল মূর্ত্তি দেখিবার সুযোগ ঘটিলেও ছবি তুলিবার সময় পুরোহিত মহাশয় এককালে কাপড় সরাইতে রাজী হইলেন না। (৮ চিত্র দ্রষ্টব্য) এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তির ধ্যান—

"ধ্যায়েচ্ছ্রীবহুলাং নগেন্দ্রতনয়াং পদ্মাসনস্থাং শুভাম্।
দোর্ভিঃ কর্ত্তৃকাং বরাভয়যুতাং (ত্রিনয়নাং) বামে স্বপুত্রান্বিতাম্॥
* * * *
গৌরাঙ্গীং মণিহারকণ্ঠনমিতাং চিন্ত্যাং সুধাং কামদাম্॥"
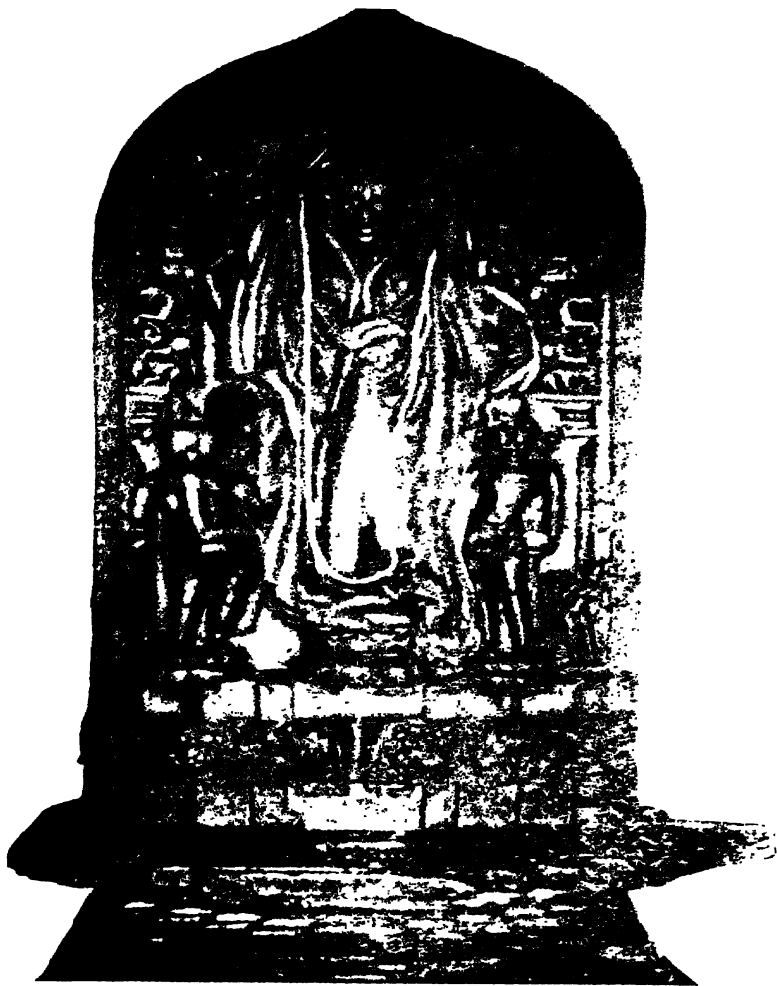
কেতুগ্রামের বহুলাক্ষী

২০। বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের অপর ধার।
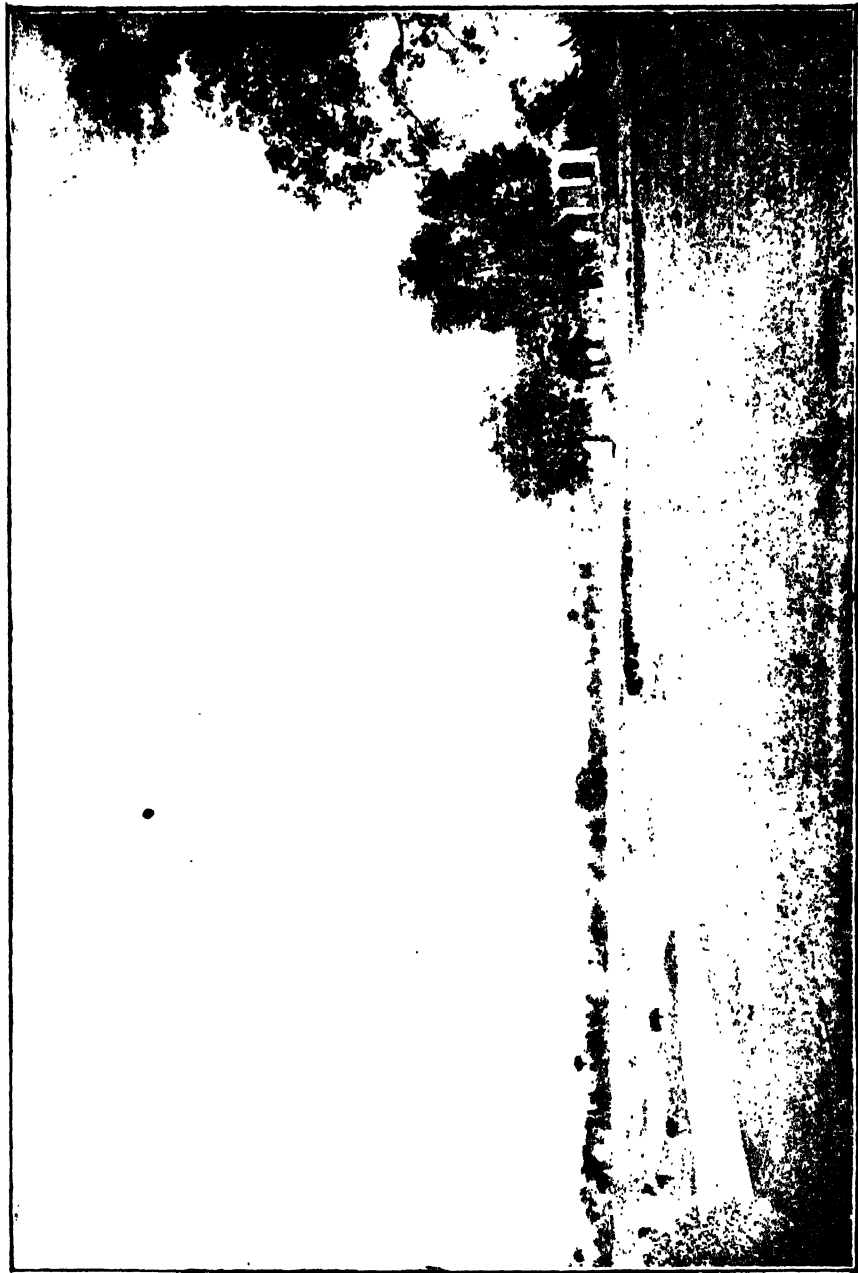
৯। কেতুগ্রামের পার্শ্বস্থ মরাঘাট—বহুলাপীঠস্থান।

অর্থ—হিমালয়সুতা পদ্মাসনস্থিতা মঙ্গলা শ্রীবহুলাকে ধ্যান করিবে। (তাঁহার চারি হাতের মধ্যে এক হাতে) কাঁকুই, (অপর দুই হাতে) বর ও অভয়, বাম পার্শ্বে নিজ পুত্র। গৌরাঙ্গী, মণিহার দ্বারা নমিত কণ্ঠ, আনন্দময়ী, কামদাকে চিন্তা করিবে।

এই ধ্যানের মাত্র তিনটী চরণ পাওয়া যাইতেছে। ধ্যানে তিনটী হস্তের বর্ণনা আছে, বাকি চতুর্থ হস্তের কোন কথা নাই। কিন্তু মূর্ত্তির চতুর্থ হস্তে দর্পণ আছে। ধ্যানে আছে, 'বামে স্বপুত্রান্বিতাম্'। কিন্তু পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, মূর্ত্তির এক পার্শ্বে কার্ত্তিকেয় ও এক পার্শ্বে গণেশ আছেন। ধ্যানের অপ্রাপ্ত চরণটী পাওয়া গেলে এই সকল গোল মিটিয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়।

পুরোহিত মহাশয় উক্ত অসম্পূর্ণ-ধ্যানেই দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। স্থানীয় লোকেরা শ্রীখণ্ডের ভূতনাথকে বহুলাক্ষীর ভৈরব বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবরচিত উভয় গ্রন্থের মতেই বহুলাক্ষীর ভৈরবের নাম ভীরুক।

(মরাঘাট)

স্থানীয় আধুনিক লোকের বিশ্বাস, এখানকার বহুলাক্ষী ও অট্টহাসের ফুল্লরা এই উভয় লইয়া যুগ্মপীঠ। বাস্তবিক তাহা নহে। যাঁহাকে তাঁহারা এখন বহুলাক্ষী বলিতেছেন, তাঁহার প্রকৃত নাম বহুলা, উদ্ধৃত ধ্যানেই প্রকাশ। বহুলা ও বহুলাক্ষী দুই ভিন্ন দেবীমূর্ত্তি। শিবচরিতে বহুলা ও বহুলাক্ষী দুইটী বিভিন্ন পীঠশক্তি বলিয়া ধরা হইয়াছে। শিবচরিত-মতে যেখানে ভগবতীর ডান কুনুই পড়িয়াছিল, সেই স্থানের নাম রণখণ্ড, সেখানকার শক্তির নাম বহুলাক্ষী ও ভৈরবের নাম মহাকাল। আর যেখানে ভগবতীর বামবাহু পড়িয়াছিল সেই স্থানের নাম বহুলা, শক্তির নামও বহুলা, ভৈরবের নাম ভীরুক। বহুলা ও বহুলাক্ষী উভয় লইয়াই যুগ্মপীঠ। শিবচরিতে যে স্থান 'রণখণ্ড' নামে উক্ত হইয়াছে, সেই স্থানই এখন মরাঘাট নামে পরিচিত। (৯ চিত্র দ্রষ্টব্য) পূর্ব্বোক্ত বহুলা দেবীর মন্দির হইতে এক মাইল মধ্যে এখানে বহুলাক্ষী ছিলেন, এখন সেই মূর্ত্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে শক্তির ভৈরব মহাকাল এখানে নূতন গৃহে বিদ্যমান। এই মরাঘাটে উত্তরবাহিনী 'কাঁদড়' আছে, ব্রহ্মখণ্ডে এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীই 'বকুলা' বা 'বহুলা' নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। অদ্যাপি এই মহাশ্মশানে বহু সাধু-সন্ন্যাসী আগমন করিয়া থাকেন।

অট্টহাস

পূর্ব্বোক্ত মরাঘাট হইতে ১ মাইল দূরে অট্টহাস। এই মহাপীঠ অতি প্রাচীন। কুব্জিকা-তন্ত্রের মতে, এই পীঠে চামুণ্ডা ও মহানন্দা দেবী অবস্থান করিতেছেন। তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিত-মতে এখানে ভগবতীর ওষ্ঠাংশ পতিত হয়, এখানকার শক্তি ফুল্লরা ও ভৈরব বিশ্বেশ বা বিশ্বনাথ। অদ্যাপি অট্টহাস মহাজাগ্রৎ মহাপীঠ বলিয়া পরিচিত। এই স্থানের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির কিছুই নাই। ভগবতীর মূর্ত্তিও নাই। মুসলমান-বিপ্লবে সমস্তই নষ্ট হইয়াছে।

মূলপীঠস্থানে কিছুদিন পূর্ব্বে একটী ক্ষুদ্র কুঠরী ছিল, অল্পদিন হইল তাহারই উপর খেড়ুয়ার জমিদার দেবীদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটী পাকাঘর (১০খ চিত্র দ্রষ্টব্য) ও রান্নাঘর প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। ইহার অদূরে একটী উচ্চ স্তূপ রহিয়াছে, স্থানীয় লোকেরা এখানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু এই স্তূপটী এখানকার পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে হয়। ইহার উপর ও চারিপাশে বহু পাতলা ও ভাঙ্গা পুরাতন ইট পাওয়া যায়। এই স্তূপের নিকট শিবানন্দের সিদ্ধিস্থান ও রটন্তীর ভগ্ন মন্দির আছে।

এই পীঠে প্রত্যহই শিবাবলি হয়। দেবীর পূজার পর ভোগ লইয়া ডাকিলেই দলে দলে শিবা আসে। শনি ও মঙ্গলবারে এখানে বহু লোকে পূজা দিতে আসেন। দেবীর কৃপায় অনেকেরই অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে, শুনা যায়। পীঠের পশ্চিম ধারে উত্তরবাহিনী 'কাঁদড়' বা স্রোতস্বতী আছে।

এখানকার পীঠদেবী ফুল্লরার জয়দুর্গার ধ্যানে পূজা হয়। যথা—

"কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥"

কিন্তু কুব্জিকাতন্ত্র-বর্ণিত চামুণ্ডা বা মহানন্দার সহিত এই ধ্যানের কোন সম্বন্ধ নাই।

দেবালয়ের বামপার্শ্বে একটী অতি পুরাতন পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণী হইতে একটী ভগ্ন দেবী-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। (১০ক চিত্র দ্রষ্টব্য) মূর্ত্তিটী ভাঙ্গা হইলেও এমন সুন্দর ও অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত দেবীমূর্ত্তি আমরা বড় একটা দেখি নাই। রাঢ়ে—বর্দ্ধমান-জেলায় ভাস্করশিল্পের কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটী তাহার অতীত সাক্ষীর সামান্ত নিদর্শন। ইহা কোন্ দেবীর মূর্ত্তি তাহা এখনও তন্ত্রশাস্ত্র খুঁজিয়া বাহির করিবার সুযোগ ঘটে নাই। দেবীর পাদদেশে একটী গর্দ্দভের আকৃতি থাকায় কেহ কেহ ইঁহাকে রাসভস্থা শীতলা মূর্ত্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শীতলার ধ্যানের সহিত অপর কোন অংশে এই দেবীর মূর্ত্তির মিল নাই। দেবীর পাদদেশে যে অস্পষ্ট মূর্ত্তি আছে, তাহা শিবারও রূপ হইতে পারে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে ভগবতীর যে জরতীবেশের উল্লেখ আছে, ঐ মূর্ত্তি যেন সেই ভাবের চণ্ডীদেবী বলিয়া মনে হয়। কুব্জিকাতন্ত্রে যে চামুণ্ডা বা মহানন্দার উল্লেখ আছে—এই সুপ্রাচীন মূর্ত্তিটী তাহার অন্যতর হইতে পারে।

অট্টহাসের সেবার জন্ত বর্দ্ধমানরাজ হইতে ১০ বিঘা বাগান ও ২০ বিঘা চাষের জমি দেওয়া আছে।

অগ্রদ্বীপ

অগ্রদ্বীপ কাঁটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ভাগীরথীতীরস্থ একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম ও বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে একটী প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। পূর্ব্বতন অগ্রদ্বীপ বর্ত্তমান অগ্রদ্বীপের

১০ক। অট্টহাসের চামুণ্ডা বা মহানন্দা।

১২। দেবগ্রাম—কুলাই-চণ্ডী (প্রাচীন মঞ্জুশ্রী)
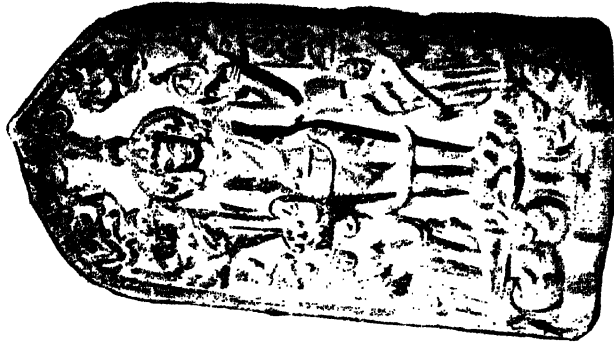
১৪। দেবগ্রাম—দেবকুণ্ড হইতে প্রাপ্ত বাসুদেব
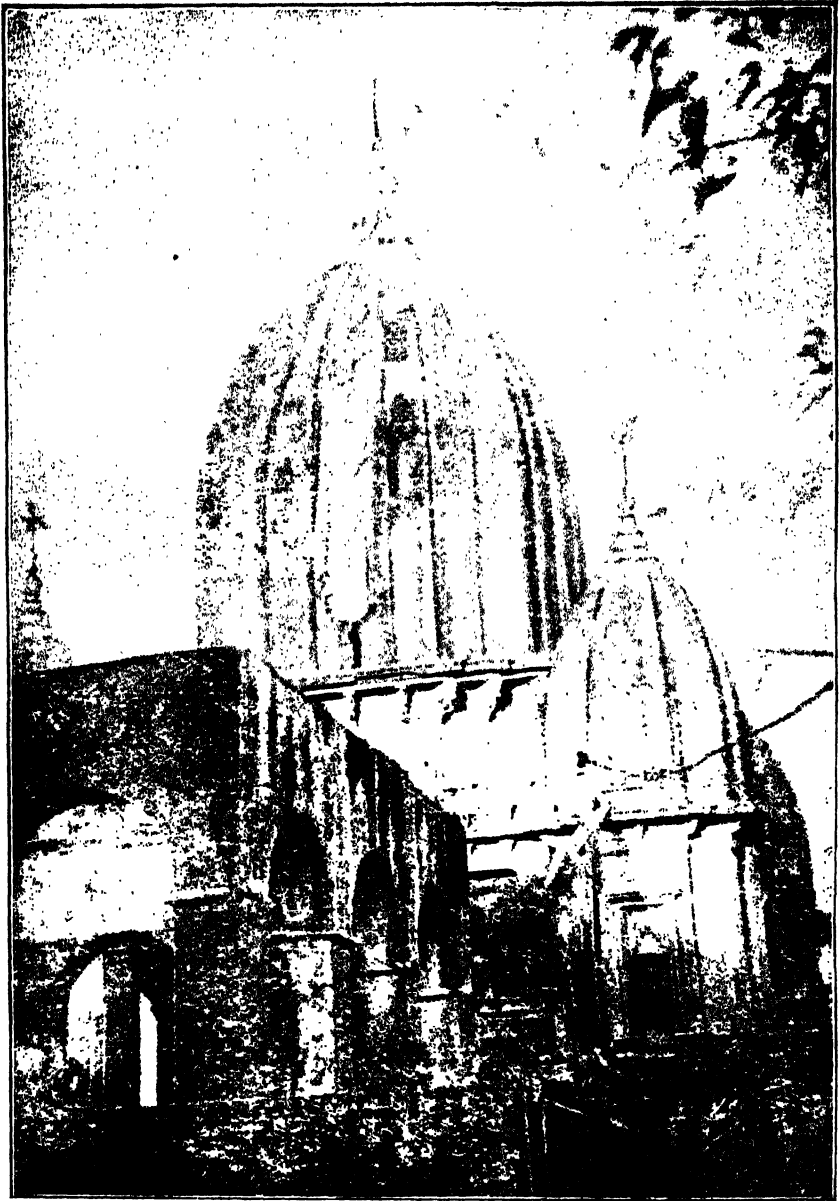
৬। জগদানন্দপুর—রাধাগোবিন্দের প্রস্তর-মন্দির।

প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে ছিল, গঙ্গার গতি-পরিবর্ত্তনের সহিত গ্রামও ক্রমে সরিয়া আসিয়াছে। মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই অগ্রদ্বীপ সুপ্রাচীন তীর্থ বলিয়া গণ্য। দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে, বারাণসীতে গঙ্গাস্নান করিলে যেরূপ ফল হয়, বারুণীর দিন অগ্রদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিলে সেইরূপ ফল হয়। এখানকার ফল মাহাত্ম্যের জন্য রাজা বিক্রমাদিত্য এখানে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। আজও বারুণী উপলক্ষে এখানে ১৫ দিনব্যাপী বড় মেলা হয়, তাহাতে প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

অধুনা গোপীনাথ-বিগ্রহের জন্যই এই স্থান প্রসিদ্ধ। কুলাই গ্রামের বিবরণ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-ঘোষবংশে বাসুদেব, গোবিন্দ ও মাধব প্রভৃতি নয় ভাই জন্মগ্রহণ করেন। কাশীপুর বিষ্ণুতলায় সিংহ-বংশে গোবিন্দঘোষের বিবাহ হয়। পত্নীর মৃত্যুর পর সন্তানাদি না থাকায় তাঁহার সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি অগ্রদ্বীপের নিকট গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন। এক দিবস মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তমণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া ভাগীরথী-সলিলে অবগাহন করিতেছেন, এমন সময়ে গোবিন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি নবীন সন্ন্যাসীর তেজোময় অপূর্ব্ব মুখশ্রী দেখিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হইলেন, মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "প্রভো! আমি সংসার চাই না, ধন মান ঐশ্বর্য্য চাই না, আত্মীয় স্বজন চাই না, কেবল তোমার ঐ চরণকমল সেবা করিতে চাই।"

এই কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গদেব গোবিন্দকে সংসারের নানা প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে সংসারে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গোবিন্দ কিছুতেই বিচলিত হইবার লোক নহেন। তিনি বলিলেন, "ধন মান ঐশ্বর্য্য সমস্ত দূর হউক, উহারা আমাকে আর জ্বালাইতে পারিবে না। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া শ্রীচরণে স্থান দিন্।" এই বলিয়া তিনি চৈতন্যের পা জড়াইয়া ধরিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যও গোবিন্দকে প্রকৃত ভক্ত জানিতে পারিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, "যদি নিষ্কাম ব্রত পালন করিতে পার, তাহা হইলে আমার সহিত থাকিতে পাইবে।" গোবিন্দ ইহা শুনিয়া মহানন্দে চৈতন্যের পদরেণু গ্রহণ করিলেন এবং নিষ্কাম ব্রত পালনে সম্মত হইলেন। পরে কিছুদিন তিনি মহাপ্রভুর সহিত মহানন্দে কাটাইলেন।

একদিন মহাপ্রভু আহারান্তে মুখশুদ্ধি না পাইয়া ভক্তগণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ আর মুখশুদ্ধি হইল না।" শিষ্যগণ নীরব রহিলেন। গোবিন্দ অমনি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রভুর সম্মুখে যাইয়া কহিলেন, "প্রভো! আমার নিকট একটী হরীতকী আছে; যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আপনার সেবার জন্য অর্পণ করি।" এই কথায় শ্রীচৈতন্য হাসিয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন, "গোবিন্দ! তোমার ভক্তির সামগ্রী আমি আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আজ হইতে তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর।" গোবিন্দের মস্তকে যেন অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দেব! দাস এমন কি অপরাধ করিয়াছে, যাহার জন্য এ কঠোর আদেশ করিলেন?"

চৈতন্যদেব কহিলেন, "গোবিন্দ! তুমি যথার্থ ভক্ত ও হরিপূজার অধিকারী। কিন্তু নিষ্কাম ব্রত পালনে উপযুক্ত নও, এখনও তোমার বিষয়-বাসনা দূর হয় নাই, এখনও তোমার সঞ্চয়-স্পৃহা আছে। তাই বলিতেছি, গৃহে ফিরিয়া যাও, হরির আরাধনা করিও, তাহাতেই মুক্তি হইবে।" "আমি কিছু চাই না, সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াছি, আর সংসারে ফিরিব না"—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সজল নয়নে গোবিন্দ এই কএকটী কথা বলিলেন।

চৈতন্যদেব ভক্তশ্রেষ্ঠ গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "গোবিন্দ! তুমি যথার্থই সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছ, কিন্তু এখনও তোমার সম্মুখে বিষম কণ্টক রহিয়াছে। আজ একটী হরীতকী সঞ্চয় করিয়াছ, কাল আবার আর একটী সঞ্চয়ের ইচ্ছা হইবে, পরশ্ব আর একটী। এইরূপ কামনাই নিষ্কাম ব্রত-পালনের ঘোর অন্তরায় জানিবে। সেই জন্য বলিতেছি, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। যেদিন তোমার জীবনে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটিবে, সেই দিন আবার আমার দর্শন পাইবে। যদি কোন অলৌকিক দ্রব্য পাও, যত্নসহকারে রাখিয়া দিও। তোমার আশা পূর্ণ হইবে।" মহাপ্রভু এই প্রকারে গোবিন্দকে পরিত্যাগ করিলেন। গোবিন্দ অগ্রদ্বীপে আসিয়া "আবার কবে প্রভুর দর্শন পাইব"—এই আশায় নির্ভর করিয়া রহিলেন।

এইরূপে বহুদিন গত হইল। শুভ মধুমাস আসিল। এক দিন ভক্তপ্রবর গোবিন্দ জাহ্নবীসলিলে আবক্ষ নিমগ্ন হইয়া ধ্যানে নিরত রহিয়াছেন, এমন সময়ে কি একটা জিনিস আসিয়া তিনবার তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। তিনি চাহিয়া দেখেন, শবদাহের এক খণ্ড ক্ষুদ্র কাষ্ঠ। তিনি সেই কাঠখানি তীরে তুলিয়া রাখিলেন। কিন্তু তুলিবার সময় বুঝিলেন যে, ঐ কাঠখানি স্বাভাবিক গুরুত্ব অপেক্ষা শতগুণ ভারী। একি হইল! বিস্ময়ে গোবিন্দের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু মনের সেই অপার্থিব ভাব কিছুতেই দূর হইল না—এই চিন্তায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন, শঙ্খচক্রগদাধর যেন তাঁহাকে বলিতেছেন, "গোবিন্দ! ভুল না, ভুল না, সেই কাঠখানি তুলিয়া আনিয়া গৃহে রাখ। মহাপ্রভু আসিতেছেন, আসিলে তাঁহাকে দিও।"

গোবিন্দের নিদ্রা ভাঙ্গিল, দেখিলেন চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার। তিনি সেই নিবিড় অন্ধকারে যেন কোন কুহকের বলে আকৃষ্ট হইয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন, এখানে আসিয়া দেখিলেন, সেই কাঠখানি যথাস্থানে পড়িয়া আছে। গোবিন্দ অতি যত্নে কাঠখানি স্কন্ধে লইয়া ধীরে ধীরে কুটীরে আনিয়া রাখিলেন। সে রাত্রি আর তাঁহার চক্ষে নিদ্রা আসিল না। ক্রমে প্রভাত হইল। গোবিন্দ অরুণের আলোকে দেখিতে পাইলেন, সেখানি শবদাহের কাষ্ঠ নয়—এক খানি সমুজ্জ্বল কৃষ্ণ-প্রস্তর। গোবিন্দ চমকিয়া উঠিলেন। চৈতন্যদেবের কথাগুলি তাঁহার স্মরণ হইল।

বেলা দ্বিপ্রহর সময়ে গোবিন্দ গ্রাম-মধ্যে ভিক্ষা করিতে বহির্গত হইলেন। ভিক্ষান্তে কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, কুটীর-দ্বারে চৈতন্যদেব। ভক্তপ্রধান গোবিন্দ চৈতন্যদেবকে

১১। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ

দেখিয়া পুলকে পুরিত হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। গোবিন্দের ভক্তিদর্শনে চৈতন্যেরও প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার কিছু হইয়াছে?" গোবিন্দ সকল কথাই ব্যক্ত করিলেন। তখন চৈতন্যদেব বলিলেন, "গোবিন্দ! তোমার আর কোন চিন্তা নাই। ভগবান্ তোমার মঙ্গলের জন্য ঐ শিলা পাঠাইয়াছেন। কল্য এক ভাস্কর আসিয়া ঐ শিলা হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিবে। সেই বিগ্রহ আমি প্রতিষ্ঠা করিব ও তুমি তাঁহার সেবাইত হইবে।"

পর দিন যথাকালে এক অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিত ভাস্কর আসিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সকলের অসাক্ষাতে চলিয়া গেল। সকলেই দেখিলেন—নবদূর্ব্বাদলশ্যাম বঙ্কিম কৃষ্ণবিগ্রহ প্রস্তুত হইয়াছে। চৈতন্যদেব তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং গোবিন্দ ঘোষ তাঁহার পূজক নিযুক্ত হইলেন। ঐ কৃষ্ণবিগ্রহের নামই গোপীনাথ। (১১ চিত্র দ্রষ্টব্য) গোবিন্দ ঘোষই পরে 'ঘোষ-ঠাকুর' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

গোপীনাথ বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার পর ঘোষ-ঠাকুর বহু দিন জীবিত ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি বহুসংখ্যক শিষ্য ও বিস্তর দেবোত্তর সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক দণ্ড পূর্ব্বে তিনি শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমি চলিলাম, আজ আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। তোমরা যথারীতি প্রভুর সেবা করিও। মহাপ্রভুর আজ্ঞা—আমার প্রাণ বাহির হইলে যথাসময়ে গোপীনাথদেব যেন আমার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করেন। আমার দেহ দাহ করিও না, গ্রামের এক পার্শ্বে সমাধি দিও।" এই বলিয়া ভক্তবর গোবিন্দ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। প্রবাদ এইরূপ, সেই দিন গোপীনাথের চক্ষেও বিন্দু বিন্দু জল দেখা দিয়াছিল। চৈত্রমাসে কৃষ্ণা একাদশীতে গোপীনাথ শ্রাদ্ধীয় বাস ও কুশাঙ্গুরী পরিয়া সেবকের পুত্ররূপে শ্রাদ্ধ করিলেন। এখনও প্রতি বৎসর ঐ দিনে গোপীনাথ কর্ত্তৃক ঘোষ-ঠাকুরের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

গোপীনাথ দর্শন করিবার জন্য বহু দূরদেশ হইতে ভক্ত বৈষ্ণবগণ এখানে আগমন করিতেন। তাহাতে যথেষ্ট আয় হইত। ঘোষ-ঠাকুরের ভ্রাতৃবংশধরগণ আসিয়া সেবা চালাইতেন। ক্রমে তাঁহাদের প্রভাব রাঢ় ছাড়িয়া পূর্ব্ববঙ্গে পঁহুছিল। পূর্ব্ববঙ্গের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাদের কাহারও কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, তাঁহারাও শিষ্যসম্পত্তি রক্ষার জন্য অনেকে পূর্ব্ববঙ্গ আশ্রয় করিলেন। এই সঙ্গে তাঁহাদের হৃদয়ে গোপীনাথ-বিগ্রহ লইয়া যাইবার আশা বলবতী হইল। কিন্তু তাঁহাদের যে সকল সরিক রাঢ়ে ছিলেন, তাঁহারা গোপীনাথকে ছাড়িতে সম্মত হইলেন না। পূর্ব্ববঙ্গগামী ঘোষবংশীয়গণ একদিন গোপনে গোপীনাথকে লইয়া চলিলেন, জ্ঞাতিগণ সংবাদ পাইয়া পথ আটকাইলেন, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে বেশী লোকজন থাকায় জ্ঞাতিগণ ফিরিয়া আসিলেন এবং তৎকালের পাটুলীর উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থরাজের নিকট বিগ্রহ উদ্ধার করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পাটুলীর রাজারা তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্য পাঠাইয়া কুষ্টিয়ার নিকট

হইতে গোপীনাথকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন এবং পাটুলীর রাজবাটীতেই কিছুকাল রাখিয়া দিলেন। এইরূপে গোপীনাথ ঘোষবংশের হাতছাড়া হইলেন। পাটুলীর রাজা অগ্রদ্বীপ ও নিকটবর্ত্তী জমিদারী গোপীনাথের সেবার জন্য অর্পণ করেন এবং চৈত্র-একাদশীর দিন অগ্রদ্বীপে গোপীনাথকে পাঠাইয়া পূর্ব্ববৎ শ্রাদ্ধাদি উৎসব নির্ব্বাহ করিতেন। একবার মেলায় বহু লোকের জনতায় কতকগুলি লোক মারা যায়। এ সংবাদ পাইয়া মুর্শিদাবাদের নবাব স্থানীয় জমিদারকে কারণ দর্শাইতে হুকুম দেন। মুর্শিদাবাদসরকারে পাটুলীর পক্ষে যিনি উকীল ছিলেন, তিনি নিজ প্রভুর সমূহ বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া ভয়ে কিছুই বলিলেন না। মোকদ্দমার ডাক হইলে নদীয়া-রাজের উকীল উঠিয়া বলিলেন, 'হুজুর! সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড় হয়। এত ভিড়ের মধ্যে দুই চারি জন মরিবে, তাহা কিছু অসম্ভব নহে। তবে আমার প্রভু নবদ্বীপরাজ ভবিষ্যতে বিশেষ সাবধান হইবেন।' উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া নবাব সন্তুষ্ট হইলেন। নবদ্বীপের উকীলের কৌশলে সেই দিন হইতে গোপীনাথসহ অগ্রদ্বীপ-জমিদারী নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভুক্ত হইল। যেখানে গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুরের সমাধি ছিল, তাহারই পার্শ্বে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গোপীনাথের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন।

ভূকৈলাসের মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের পিতা মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্র ১১৭১ সালে ত্রিস্থলী করিয়া ফিরিবার সময় অগ্রদ্বীপে নামিয়াছিলেন। সহযাত্রী কবি বিজয়রাম তীর্থমঙ্গলে লিখিয়াছেন—

"অগ্রদ্বীপ আসি নৌকা হৈল উপস্থিত ॥ ১০১২
সেই স্থানে গোপীনাথ ঠাকুরের ঘর।
অপূর্ব্ব-নির্ম্মাণ বাটী দেখিতে সুন্দর ॥ ১০১৩
রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ী আছেন গোপীনাথ।
দর্শন না পায়্যা যাত্রী মাথে মারে ঘাত ॥" ১০১৪

কলিকাতার শোভাবাজার-রাজবাটীতে প্রবাদ আছে যে, মহারাজ নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধে অথবা তাঁহার গোবিন্দজী প্রতিষ্ঠাকালে রাঢ়বঙ্গে যত বিষ্ণুবিগ্রহ ছিলেন, রাজা নবকৃষ্ণ সে সকলকেই নিজ প্রাসাদে আনাইয়া ছিলেন। কার্য্যান্তে সকল দেবই ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু গোপীনাথের মোহন মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি আর তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন না। এই বিগ্রহ লইয়া নবদ্বীপাধিপতির সহিত মহারাজ নবকৃষ্ণের বিবাদ উপস্থিত হয়। কিন্তু অগ্রদ্বীপে প্রবাদ আছে যে, মহারাজ নবকৃষ্ণ গোপনে গোপীনাথ বিগ্রহ কলিকাতায় লইয়া যান। সমসাময়িক ইংরাজলেখক ওয়ার্ডসাহেব কিন্তু লিখিয়াছেন—

"গোপীনাথের অধিকারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজা নবকৃষ্ণের নিকট তিন লক্ষ টাকা ধারিতেন। সেই জন্য রাজা নবকৃষ্ণ অগ্রদ্বীপের গোপীনাথকে লইয়া যান। অবশেষে কৃষ্ণনগরপতি মোকদ্দমা করিয়া সেই মূর্ত্তি উদ্ধার করেন।"*

* Ward's History of the Hindoos, Vol. I. p. 205-206.

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে গোপীনাথের সেবার জন্য প্রত্যহ ৫০৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, তৎপরে ২৫৲ টাকা হয়, ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিয়া এখন দৈনিক ॥০ আনা ব্যবস্থা হইয়াছে।

তীর্থমঙ্গলে গোপীনাথের যে "অপূর্ব্ব-নির্ম্মাণ বাটী"র উল্লেখ আছে, ভীষণ ভূমিকম্পে তাহার অধিকাংশই ভগ্ন হইয়াছে। সংস্কারাভাবে মূল-মন্দিরের উভয় পার্শ্বে নাটমন্দির ও ভোগগৃহ ধ্বংসপ্রায়। মূল-মন্দির সামান্য সংস্কারের ফলে এখনও দাঁড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু উপযুক্ত সংস্কার না হইলে শীঘ্রই ধ্বংসমুখে পতিত হইবে।

অগ্রদ্বীপ গ্রামে বাগানের মধ্যে মেলা হয়। গ্রামের মধ্যে ও মেলাস্থানের নিকট বর্দ্ধমানরাজদত্ত মহাপ্রভুর সেবা আছে। তাহারই নিকট রাধাকান্তজী আছেন, নাটোর-রাজদত্ত বৃত্তিতে তাঁহার সেবা চলে। এখানে সকল জাতির বাস আছে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক।

ঘোড়াইক্ষেত্র

অগ্রদ্বীপ হইতে ৩ মাইল উত্তরে ঘোড়াইক্ষেত্র নামক প্রাচীন স্থান। বিজয়রামের তীর্থমঙ্গল-পাঠে জানিতে পারি যে, দেড় শত বর্ষ পূর্ব্বে এই ঘোড়াইক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিলেন—

"কাশীপুর ঘোড়াইক্ষেত্র কন্যা গাজীপুর।
ডাহিনে রাখিয়া চলে ঘোষাল ঠাকুর॥
সন্ধ্যার সময় সবে আইলা গোটপাড়া।
গুড় গুড় গুড় গুড় দামায় পড়ে সাড়া॥
সেই স্থানে কালুরায় মহাশয়ের ঘর।
সোয়ারীতে কৃষ্ণচন্দ্র গেলা শীঘ্রতর॥"

(তীর্থমঙ্গল ১০১৭—১০১৯ শ্লোক)

বর্ত্তমান ঘোড়াইক্ষেত্র হইতে গঙ্গা প্রায় ১ ক্রোশ দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছেন। ঘোড়াই-ক্ষেত্রের বর্ত্তমান কালীতলার পার্শ্ব দিয়াই গঙ্গা বহিতেন। গঙ্গার গতি-পরিবর্ত্তনের সহিত এই স্থান নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হয়, অল্প দিন হইল জঙ্গল কাটা হইয়াছে। ইহার অপর পারে নোহাসায় কালুর ঘাট। এখানকার নোহাসার বিল প্রাচীন গঙ্গাগর্ভের পরিচয় দিতেছে। এই বিল বরাবর গোটপাড়ায় গিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে।

বহু পূর্ব্ব হইতে ঘোড়াইক্ষেত্র তান্ত্রিকপ্রধান স্থান ছিল। কুব্জিকাতন্ত্রে যে অশ্বতীর্থ বা অশ্বপদ পীঠের উল্লেখ আছে, কালীতলার নিকট সেই প্রাচীন পীঠ ছিল, বহু কাল হইল গঙ্গা সেই স্থান আপনার কুক্ষিগত করিয়াছেন। তৎপরেও এখানে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইত। কিন্তু গঙ্গার গতি-পরিবর্ত্তনের সহিত ইহার মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে এখনও পীঠস্থান ভাবিয়া মধ্যে মধ্যে কালীতলায় সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে।

দেবগ্রাম*

বর্ত্তমান নদীয়া জেলার উত্তরাংশে রাণাঘাট-মুর্শিদাবাদ-রেলপথের দেবগ্রাম ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে এবং অগ্রদ্বীপ হইতে তিন ক্রোশ উত্তরে দেবগ্রাম অবস্থিত।

দেবগ্রামের অবস্থান

বর্ত্তমান দেবগ্রাম বাগড়ীবিভাগের মধ্যে পড়িয়াছে, ইহার আয়তন প্রায় সাড়ে চৌদ্দ হাজার বিঘা। এই ভূভাগের উত্তরসীমা পাণিঘাটা ও গোবিন্দপুর, দক্ষিণে সাতবেগে, ভাগা, চাঁদপুর ও বনপলাসী, পূর্ব্বে বরেয়া ও দিক্‌বরেয়া, পূর্ব্ব-দক্ষিণে জয়নগর এবং পশ্চিমে সেওড়াতলা ও হাটগাছা। উত্তর-সীমার মধ্যে লুপ্ত গঙ্গার খাত পাগলাই-চণ্ডীর দহ বা পাণিঘাটার দহ, পাণিঘাটার দক্ষিণে ও দেবগ্রামের উত্তরপশ্চিমসীমায় দেবগ্রামের পাড়া পাথরজলা বা নূতনগ্রামের গড়। গ্রামবাসী বৃদ্ধ ভদ্রমহোদয়গণের বিশ্বাস যে, গোবিন্দপুর ও গড়ের পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বকালে গঙ্গা প্রবাহিত হইতেন, গঙ্গার খাদের উপরই বর্ত্তমান মীরেগ্রাম। এখানে শুকুইআরা, ডোখলঘাট, ধোবাঘাট প্রভৃতি স্থান আছে। দেবগ্রামের উত্তর ও পূর্ব্বে যেখানে গঙ্গার গর্ভে জল থাকে, সেই স্থান অদ্যাপি দহ বা বিল নামে পরিচিত। শুষ্ক গঙ্গাগর্ভ বর্ষাকালে ডুবিয়া যায়। দেবগ্রামের পূর্ব্বে (বর্ত্তমান দেবগ্রাম ষ্টেশনের পার্শ্বে) দুর্গাপুর, তাহার পার্শ্বে গহড়াপোতা; ইহার মধ্যে নৌকাঘাটা বা 'নাঘাটার মাঠ'—এখানে বর্ষাকালে ৮।১০ হাতের উপর জল চলে।

দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব

দেবগ্রাম অতি পূর্ব্বকাল হইতে একটী মহাসমৃদ্ধিশালী লোকালয় বলিয়া পরিচিত ছিল। পূর্ব্বকালে যখন ইহার পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া গঙ্গার স্রোত প্রবাহিত ছিল, তৎকালে বর্ত্তমান সাঁওতার পূর্ব্বোত্তরে নাঘাটা বা নৌকাঘাটা নামক স্থানে বড় বড় বাণিজ্যপোত আসিয়া লাগিত। সাঁওতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানেই তৎকালে বহু লোকের বাস ছিল, দক্ষিণে বিক্রমপুর ও উত্তরে মীরে বা মীরগ্রাম † এবং পশ্চিমে কালীগঞ্জ হইতে ঘোড়াইক্ষেত্র পর্য্যন্ত ইহার অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমান সাতবেগে ‡ এই বিস্তীর্ণ

* এই প্রাচীন স্থানের পরিচয় পূর্ব্বে বড় প্রকাশ ছিল না। ইহার প্রাচীনত্বের সন্ধান পাইয়া আমি ক্রমান্বয়ে চারিবার ঐ স্থানে গিয়াছিলাম। প্রথম দুইবারে ঐ স্থানের প্রাচীন অধিবাসী কৃষকদিগের নিকট এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বারে গ্রামবাসী ভদ্র মহোদয়গণের নিকট স্থানীয় কিংবদন্তী শুনিয়া প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও পুরাকীর্ত্তিগুলি দর্শন করি। ৪র্থ বারে (গত ১৩ই চৈত্র ১৩২১) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও পুরাতত্ত্বানুরাগী শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার সঙ্গে এই দেবগ্রাম ও বিক্রমপুর পরিদর্শন করিবার জন্য গিয়াছিলেন। এই কএক বারের অনুসন্ধানের ফলে এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মজুমদার প্রভৃতি গ্রামবাসী ভদ্র মহোদয়গণের নিকট হইতে যেরূপ কিংবদন্তী সংগৃহীত হইয়াছে এবং আমরা স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিত হইল।

† ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডে দেবগ্রামের উল্লেখ না থাকিলেও এই মীরগ্রামের উল্লেখ আছে।

‡ পূর্ব্বকালে একটী বেগেই ছিল, কিছু দিন হইল উহার সাতভাগ হইয়াছে। এই সাতবেগের নাম পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যথাক্রমে ১ চিনিমিনি বেগে, ২ স্থাপন বেগে, ৩ চক বেগে, ৪ গড়ের বেগে, ৫ আড়ার বেগে, ৬ খোরদ বেগে ও ৭ পালিত বেগে।

১৩। দেবগ্রাম—বিভক্ত দেবকুণ্ড

। দেবগ্রাম হইতে প্রাপ্ত মাহেশ্বরী (?) মূর্তিযুক্ত প্রস্তর।
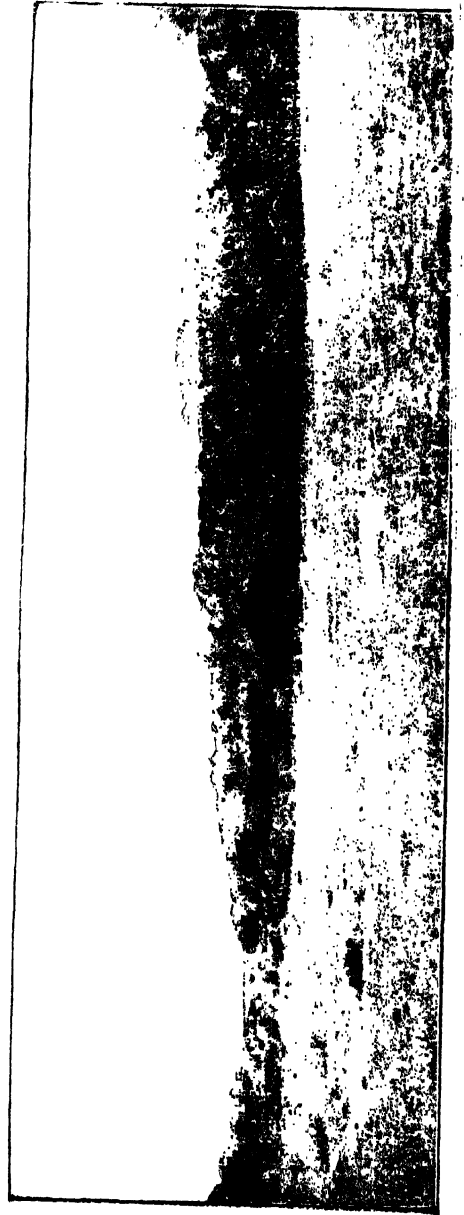
নগরীর মধ্যেই ছিল। এই ভূভাগের মধ্যে এখনও স্থানে স্থানে বহু প্রাচীন ইষ্টকাদির নিদর্শন ও বহু সংখ্যক সুপ্রাচীন মজা পুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। দেবগ্রামের সর্ব্বপ্রাচীন স্মৃতি সম্ভবতঃ মঞ্জুশ্রী।* এখন ইনি কুলুইচণ্ডী নামে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীরূপে সকলের পূজা পাইতেছেন। এখানে যে এক সময় বৌদ্ধপ্রভাব ছিল, এই মঞ্জুশ্রীই তাহার নিদর্শন। (১২ চিত্র দ্রষ্টব্য)

দেবকুণ্ড

দেবগ্রামে যত পুষ্করিণী আছে, তন্মধ্যে দেবকুণ্ড সর্ব্বপ্রাচীন ও সর্ব্ববৃহৎ—পূর্ব্বে প্রায় দেড়শত বিঘায় জল থাকিত। তাহার পশ্চিমে ফুলবাগান এবং অপর তিন দিকে লোকের বাস ও মধ্যে মধ্যে দেবালয় ছিল। এখন দেবকুণ্ডের অধিকাংশই ভরাট হইয়াছে, যেটুকু জল আছে, তাহা তিনটী পুষ্করিণী, ৪টী জোল এবং দক্ষিণে একটী লম্বা জোলে বিভক্ত রহিয়াছে। (১৩ চিত্র দ্রষ্টব্য) উত্তরাংশ অধিকাংশই ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্যে এখন অনেক অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন ফুলবাগান এখন নামমাত্র—একটী পাড়া হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান দেবকুণ্ড-সংস্কারকালে ইহার মধ্য হইতে নানা লোকে নানা দেবমূর্ত্তি পাইয়াছে, তাহার কতকগুলি দেবকুণ্ডের পার্শ্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণ-গৃহে আছে, কতক কতক স্থানান্তরে গিয়াছে। কিছুদিন হইল, এই দেবকুণ্ড হইতে কষ্টিপাথরের একটী অতি সুন্দর বাসুদেব মূর্ত্তি পাওয়া যায়। সেই মূর্ত্তিটী দেবগ্রামভব স্বনামধন্য ডাক্তার উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপনার কলিকাতার বাসায় আনিয়া রাখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সাহিত্যসম্মেলনে প্রদর্শন ও তৎপরে সাহিত্য-পরিষদে রক্ষা করিবার জন্য অর্পণ করিয়াছেন। ঐ মূর্ত্তি এক্ষণে সাহিত্য-পরিষদে আছে। (১৪ চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই মূর্ত্তির শিল্পনৈপুণ্য ও গঠন দেখিলে ৬।৭ শত বর্ষের প্রাচীন মূর্ত্তি বলিয়া মনে হইবে।

পচা-দীঘী

গ্রামের উত্তরাংশে 'লালদীঘী' নামে একটী প্রাচীন পুষ্করিণী আছে, পূর্ব্বে ইহার 'পচাদীঘী' নাম ছিল। ১২৮০ সালে এই দীঘীর সংস্কার-কালে ব্রহ্মাণী বা মাহেশ্বরী মূর্ত্তিযুক্ত একখণ্ড পাথর† (১৫ চিত্র দ্রষ্টব্য), হাতীর মাথা এবং ইষ্টকস্তূপ বাহির হয়। এই স্তূপ হইতে এত পুরাতন ইট উঠিয়াছিল যে, তাহাতে ইহার নিকট একটী পাকা কোটা প্রস্তুত হইয়াছে। ওরূপ দেবীমূর্ত্তিশোভিত প্রস্তরফলক সাধারণতঃ দেবমন্দিরের বহির্গাত্রে সংলগ্ন থাকে এবং তাহা হইতে মূল মন্দির কত বড় ছিল, তাহাও কতকটা বুঝা যায়।

দেবগ্রামের গড়

দেবগ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং উত্তরে এখনও সুপ্রাচীন গড়ের চিহ্ন বিদ্যমান। উত্তরের গড়টী প্রায় দৈর্ঘ্যে ১ মাইল, প্রস্থে প্রায় দুইশত ফুট এবং ইহার বর্ত্তমান উচ্চতা ৬ ফুট হইতে ১৫ ফুট পর্য্যন্ত জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

* শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মূর্ত্তিটীকে "মহারাজলীল মঞ্জুশ্রী" বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধ তন্ত্রে মঞ্জুশ্রীর যেরূপ সাধন লিখিত আছে, তাহার সহিত মিল নাই। তবে মূর্ত্তিটী যে সহস্রাধিক বর্ষের প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

† এই মূর্ত্তির বাহন ও লাঞ্ছন অস্পষ্ট হওয়ায় ইনি ব্রহ্মাণী কি মাহেশ্বরী তাহা এখনও স্থির হয় নাই। এক্ষণে সাহিত্য-পরিষদে এই প্রস্তর-ফলক বিদ্যমান।

ইহার দুই পার্শ্বেই পরিখার চিহ্ন রহিয়াছে। (১৬ চিত্র দ্রষ্টব্য)। দক্ষিণপশ্চিমাংশের গড়টী 'বেগের গড়' বা 'গড়বেগে' নামে পরিচিত। প্রবাদ—এই গড়ে পাতালঘর আছে। তাহাতে এখানকার পূর্ব্বতন নৃপতির গুপ্তধন রক্ষিত আছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

দেবগ্রামের অবস্থান দেখিয়া প্রাচীন লোকেরা মনে করেন যে, ইহার দুই পার্শ্বে গড় ও দুই পার্শ্বে স্রোতস্বতী এই স্থানকে সুদৃঢ় করিয়া রাখিয়াছিল। এখন এই স্থান বাগড়ীর মধ্যে পড়িলেও যে সময়ে ইহার পূর্ব্ব দিয়া গঙ্গা বহিতেন, সেই সময় এই স্থানের কতকাংশ রাঢ় ও কতকাংশ বাগ্‌ড়ীর সামিল ছিল। রামচরিতে পাইয়াছি—

"**দেবগ্রাম**প্রতিবদ্ধ-বসুধাচক্রবাল-**বালবলভী**তরঙ্গবহল-গলহস্তপ্রশস্তহস্তবিক্রমো **বিক্রমরাজঃ**"।

রামচরিতের বিক্রমরাজ যে, বর্ত্তমান দেবগ্রাম অঞ্চলে আধিপত্য করিতেন, তাহার আলোচনা পরে করিব। তবে এখানে বলিয়া রাখি, রামচরিত হইতে আমরা পাইতেছি যে, পালবংশের অধিকারকালে খৃষ্টীয় ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে এই দেবগ্রাম একটী প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল।

বল্লালের ভিটা

পূর্ব্বোক্ত গহড়াপোতার নিকট (বর্ত্তমান দেবগ্রামের পূর্ব্বভাগে) দমদমা। এখানে একটী উচ্চ স্তূপ বা ঢিবি আছে—স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সাবেক অধিবাসিমাত্রই ঐ ঢিবিকে 'বল্লালের ভিটা' বা 'বল্লালসেনের বাড়ী' বলিয়া থাকে। এই স্থানে এবং ইহার উত্তর ও পূর্ব্বে ভীষণ জঙ্গল ছিল, অনেকে এখানে আসিয়া বাঘ শীকার করিত। অল্প দিন হইল জঙ্গল পরিষ্কার হইয়াছে। (১৭ চিত্র দ্রষ্টব্য) ইহারই পার্শ্বে সাঁওতার দীঘী। ইহার উপর দিয়া ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের যত্নে বহরমপুররোড হইবার পূর্ব্বে বল্লালের ভিটা ও সাঁওতার দীঘী পাশাপাশি ছিল, এই জন্য প্রাচীন লোকেরা ঐ দীঘী বল্লালের অন্তঃপুরস্থ দীঘী বলিয়া মনে করেন। দেবগ্রাম ও বিক্রমপুরের অনেক বনিয়াদী লোকের মুখে এই দীঘীর অপর নাম "বল্লাল-দীঘী" শুনা গিয়াছে। এই সাঁওতা হইতে দুইটী

বল্লালসেনের জাঙ্গাল

প্রাচীন জাঙ্গাল বা রাস্তা বাহির হইয়া একটী পশ্চিমদিক্ দিয়া বরাবর ভাগা, চাঁদপুর, বরগাছী হইয়া বিক্রমপুরের 'জিতের মাঠ' দিয়া যথাক্রমে ভবানীপুর, সুখপুকুর, রাজাপুর হইয়া বিল্বগ্রামের দক্ষিণ দিকে নবদ্বীপ অভিমুখে গিয়াছে। অপর জাঙ্গাল বা প্রাচীন রাস্তা পূর্ব্বদিক্ দিয়া চাঁদপুর, কালীনগর, ধুবী ও সেনপুর হইয়া বুনীর দক্ষিণ ও মালুমগাছার পার্শ্ব দিয়া গবীপুর পর্য্যন্ত গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। গবীপুরের প্রাচীন লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ জাঙ্গাল পূর্ব্বে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ক্রমে কৃষকগণের কৃপায় সে সমস্তই লুপ্ত হইয়াছে। উক্ত উভয় জাঙ্গালই 'রাজার জাঙ্গাল' বা 'বল্লাল-সেনের জাঙ্গাল' নামে স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট পরিচিত। ঐ জাঙ্গালের ধারে ধারে ৩।৪ ক্রোশ অন্তর বড় বড় পুরাতন পুষ্করিণী দেখা যায়, তন্মধ্যে সাঁওতা, ভাগা, বরগাছী, বিক্রমপুর, ভবানীপুর, রাজাপুর, বিল্বগ্রাম ও নবদ্বীপের অপর পারস্থ পুষ্করিণী প্রসিদ্ধ। ভবানীপুর ও নব-

১৭। বল্লালসেনের ভিটা বা দমদমার স্তূপ।

২১। বক্সাদেবের ভিটা হইতে প্রাপ্ত স্তম্ভাংশ।
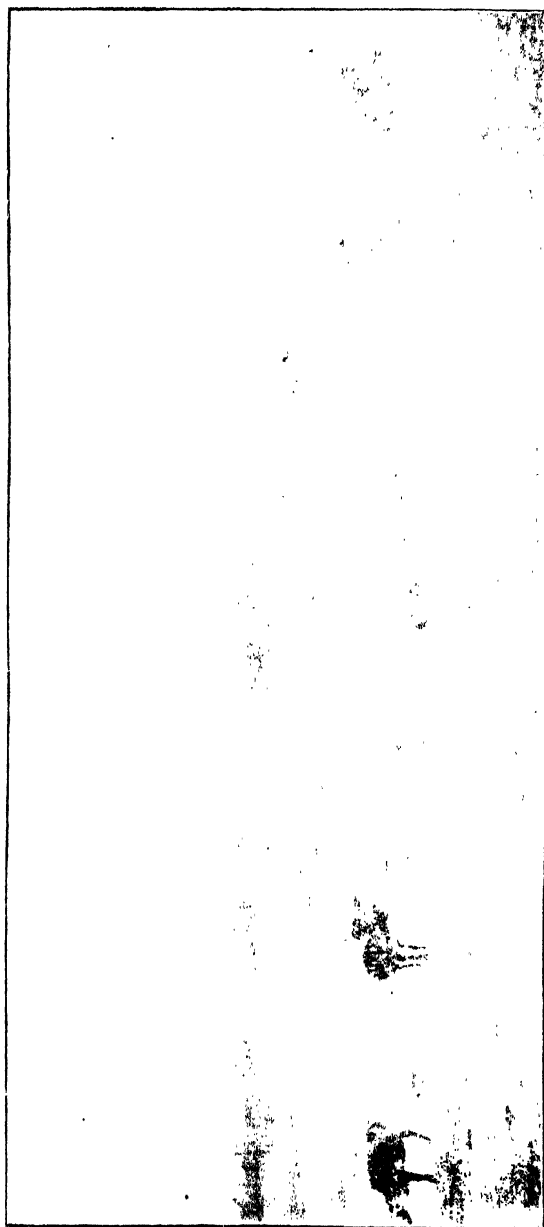
দ্বীপের পুষ্করিণী আজও "বল্লালের দীঘী" নামেই পরিচিত। আজও কেহ কেহ অপর স্থানের মজা পুকুরগুলিকে বল্লালসেনের নামের অপভ্রংশে 'বল্লামসেনের কীর্ত্তি' বলিয়া মনে করেন।

পূর্ব্বে এই স্থান বর্দ্ধমান জেলার কাঁটোয়া মহকুমার অধীন ছিল। প্রায় ৫০ বর্ষ হইল, কাঁটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ৺ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় কার্য্যগতিকে দেবগ্রামে আসিয়া কিছু দিন অবস্থান করেন। সেই সময় তিনি স্থানীয় জমিদার ৺বামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সাহায্যে "বল্লালের ভিটা" খনন করাইয়াছিলেন। দেবগ্রামের প্রাচীন লোকেরা বলিয়া থাকেন—খননকালে ঐ স্তূপ হইতে বহুতর কাটা-পাথর, ভগ্ন পাথরের মূর্ত্তি (১৮ চিত্র দ্রষ্টব্য), ভাস্কর-কার্য্যযুক্ত পাথরের চৌকাট, পদ্ম ও নরনারী মূর্ত্তিযুক্ত পাথর (১৯।২০ চিত্র দ্রষ্টব্য), ৪।৫ হাত লম্বা পাথরের থাম (২১ চিত্র দ্রষ্টব্য), পাথরের মকরমুখ' নর্দ্দামা, দৈর্ঘ্যে তিন হাত ও প্রস্থে দুই হাত লিপিযুক্ত একখণ্ড প্রস্তরফলক এবং কটি হইতে জানু পর্য্যন্ত মালকোচা করিয়া কাপড়পরা মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। ৺ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিপিযুক্ত প্রস্তরফলক ও কতকগুলি ভাঙ্গা মূর্ত্তি মিউজিয়মে পাঠাইবার জন্য কাঁটোয়ায় লইয়া যান। বামনদাস বাবু অনেক পাথর তাঁহার একডালার কাছারীতে পাঠাইয়া দেন। সে সময়ে এখানকার মডেল-স্কুলের শিক্ষক ৺দীননাথ ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় তাঁহার স্বগ্রাম সালুগাঁ দোগাছিয়া গ্রামে এখান হইতে মকরমুখ' নর্দ্দামা ও কএকটী মূর্ত্তি লইয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গ্রামস্থ নানা লোকে সেই সকল কাটা-পাথর স্ব স্ব গৃহে আনিয়া নানা কাজে ব্যবহার করিতেছেন। মালকোচা করিয়া কাপড়পরা ভগ্ন মূর্ত্তিটী বহু দিন কুলাইচণ্ডীতলায় পড়িয়াছিল। উহা ওজনে প্রায় ২ মণ হইবে, অনেক বলবান্ ব্যক্তি সেই ভগ্ন মূর্ত্তিটী তুলিয়া স্ব স্ব বলপরীক্ষা করিত। স্থানীয় লোকের নিকট তাহা "বল্লালসেনের বুক" বা "বল্লালসেনের ধড়" বলিয়া পরিচিত ছিল। কিছুদিন হইল বৈরামপুর গ্রামে সেই ধড়টী লইয়া গিয়াছে। এই ধড়টীর অনুসন্ধান আবশ্যক। এখনও "বল্লালের ভিটা" রীতিমত খনন করিলে অনেক পুরাকীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে। যখন 'বহরমপুর-রোড' প্রস্তুত হয় নাই, তখন এই ভিটার ধ্বংসাবশেষ সাঁওতার দীঘীর উত্তর পাড় হইতে আরম্ভ হইয়া বরাবর প্রায় অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত ছিল। এখনও ঐ অংশ খনন করিলেই মধ্যে মধ্যে পুরাতন ইট বাহির হয়। পূর্ব্বে এই সাঁওতার দীঘী প্রায় ৪০ বিঘা ছিল, ইহার উপর দিয়াই 'বহরমপুর-রোড' গিয়াছে, কিন্তু এখন ইহার অধিকাংশই শুষ্ক গোচারণ মাঠ হইয়া পড়িয়াছে। (২২ চিত্র দ্রষ্টব্য)।

বল্লালভিটার সংলগ্ন ডাঙ্গাপাড়ার পশ্চিমাংশে যে পুরাতন পুষ্করিণী আছে*, তাহার উত্তর পার্শ্বে দেবগ্রামের বয়োবৃদ্ধগণ ৪০ বর্ষ পূর্ব্বেও চারি হাত মোটা চৌকা থামের গোড়া দেখিয়া-ছিলেন, এখন তাহা চাপা পড়িয়াছে।

দেবগ্রামের প্রাচীন লোকের বিশ্বাস, সাঁওতার উচ্চ জমিতে পূর্ব্বকালে বহু লোকের বাস

---

* অল্প দিন হইল গ্রামের কলুরা এই পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করায় ইহার নাম 'কলুপুকুর' হইয়াছে।

ছিল—নানা নৈসর্গিক কারণে ও মুসলমানবিপ্লবে তাঁহারা পূর্ব্ব স্থান ছাড়িয়া উত্তরে দেবকুণ্ড-তীরে আসিয়া বাস করেন।†

বিক্রমপুর

বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রাম দেবগ্রামের ৪ মাইল দক্ষিণে ও সোণাডাঙ্গা হইতে ১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। রেনেল সাহেবের প্রাচীন মানচিত্রে এই বিক্রমপুরের উল্লেখ আছে। এই বিক্রমপুর প্রাচীন বিক্রমপুরের অংশমাত্র। এখানকার জমিদারের কাগজ হইতে জানা যায় যে, পার্শ্ববর্ত্তী বরগাছী, কালীনগর, বিক্রমপুরহাট‡, বিক্রমপুরকুঠী প্রভৃতি স্থান বিক্রমপুর মৌজারই সামিল। দেবগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী ডিঙ্গেলগ্রামের দক্ষিণে যে জোল বা নিম্নভূমি আছে, বিক্রমপুরের উত্তরপূর্ব্ব-সীমা ততদুর বিস্তৃত।

---

† কেহ কেহ দেবগ্রামকে দেবলরাজার রাজধানী ও উহার প্রাচীন কীর্ত্তিগুলিকে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বিশেষ অনুসন্ধানে জানিলাম যে, দেবল রাজার সহিত এই দেবগ্রামের কোন সম্বন্ধ নাই। নদীয়া জেলার মধ্যে বর্ত্তমান রাণাঘাট-বনগ্রাম-লাইনে গাংনাপুর ষ্টেসন হইতে ১ ক্রোশ দূরে আর একটী প্রাচীন দেবগ্রাম বা দেবগ্রামের গড় রহিয়াছে। ঐ গড় আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। এই গড়ের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি এই স্থানের ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের স্ত্রীপুরুষ সকলেই 'দেবলরাজার গড়' বা 'দেপাল রাজার রাজধানী' বলিয়া জানেন। সম্ভবতঃ নদীয়া জেলার এই দক্ষিণাংশস্থিত দেবগ্রামের সর্ব্বজনবিদিত প্রবাদ অধুনাতন কালে নদীয়া জেলার উত্তরাংশস্থিত আমাদের আলোচ্য দেবগ্রামের উপর চাপান হইয়াছে। বাস্তবিক নদীয়া জেলার এই দক্ষিণাংশস্থিত দেবগ্রামের গড়টী আমাদের আলোচ্য দেবগ্রাম অপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। রাঢ়ীয় ও বঙ্গসমাজের দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থে এই স্থান একটী প্রধান সমাজ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এখন এই দেগাঁ বা দেবগ্রামে ৩।৪ ঘর মাত্র ভদ্রলোকের বাস বটে, কিন্তু নিকটবর্ত্তী গ্রাম-বৃদ্ধগণের মুখে শুনিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্ব্বেও এখানে ৫০।৬০ ঘর আচার্য্য ব্রাহ্মণের বাস ছিল।

খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে গুরবমিশ্রের গরুড়স্তম্ভলিপিতে বর্ণিত হইয়াছে—

"দেবগ্রামভবা ধন্যা দেবীসু তুল্যবলয়ালোকসন্দীপিতরূপা।
দেবকীব তস্মাদ্‌গোপালপ্রিয়কারকমসূত পুরুষোত্তমম্‌॥"

এই শিলালিপির প্রমাণেও আমরা বলিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই দেবগ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থানে গৌড়েশ্বর নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী গুরবমিশ্রের মাতুলালয় ছিল বলিয়া তাঁহার প্রশস্তিকার সগৌরবে এই দেবগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন।

এই দেবগ্রামের প্রাচীনতা ও প্রসিদ্ধি অবগত হইয়া এই স্থানই রামচরিতোক্ত দেবগ্রাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা ৪ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।) কিন্তু এখন দেখিতেছি, এই দেবগ্রাম বালবলভী বা বাগড়ী ভূভাগের অন্তর্গত নহে, এ অবস্থায় এই দেবগ্রাম রামচরিতোক্ত দেবগ্রাম নহে। এখন স্থির হইল, রামচরিতোক্ত দেবগ্রামই পলাশীর দক্ষিণে অবস্থিত বাগড়ীর অন্তর্গত আমাদের আলোচ্য দেবগ্রাম এবং এই স্থানের সহিত দেবল রাজার কোন সম্বন্ধ নাই।

‡ বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রাম হইতে ১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

বিক্রমপুরের মধ্যে যে 'জাঙ্গীর খাল' আছে, সেই খাল দিয়া পূর্ব্বে ভাগীরথীর স্রোত বহিত। বর্ত্তমান বিক্রমপুরের পশ্চিমে একটী প্রকাণ্ড মাঠ আছে, উহার নাম 'জিতের মাঠ'। এখানে 'জিতের পুষ্করিণী' নামে একটী সুপ্রাচীন ও বৃহৎ পুষ্করিণী রহিয়াছে। প্রবাদ—উক্ত জিতের মাঠে বহু পূর্ব্বে সহর ছিল। পুষ্করিণীর নিকটবর্ত্তী স্থানে মৃত্তিকা মধ্যে এখনও লোকাবাসের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে অল্প মাটী খুঁড়িলেই বহু পুরাতন লৌহমল এবং ভগ্ন মৃৎপাত্রাদি 'কুমারের সাজ' পাওয়া যায়। এই স্থান দেখিলেই মনে হইবে যে, বিলুপ্ত সহরের কতকটা পূর্ব্ব দিয়া এক সময়ে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন। সম্ভবতঃ এই স্থানের প্রাচীন কীর্ত্তিরাজির অধিকাংশই ভাগীরথীর তরঙ্গে বিলুপ্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান বিক্রমপুরের ষষ্ঠীতলায় কএক খণ্ড পাথর পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে একখানিতে সামান্য খোদাই কাজ আছে। সাঁওতার বল্লালের ভিটা হইতে যেরূপ কাটা-পাথর বাহির হইয়াছে, এখানকার পাথর সেই ধরণের। নিকটবর্ত্তী গবীপুরে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। প্রবাদ—পুরাকালে এখানে এক রাজার বাড়ী ছিল।

বিক্রমপুরের পার্শ্ববর্ত্তী সেনপুর ও ঘুনীর মধ্যে অতিপ্রাচীন 'ট্যাংড়ার পুষ্করিণী' আছে। প্রবাদ—উহা বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত।

'বল্লালসেনের জাঙ্গালের' কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, তাহাও সাঁওতা হইতে আরম্ভ হইয়া এই বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বেই রামচরিতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, গৌড়াধিপ রামপালের সময় বিক্রম নামে একজন পরাক্রান্ত রাজা দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-তরঙ্গবহল-বালবলভী প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। বর্ত্তমান বিক্রমপুরের তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত অগ্রদ্বীপে শুনিয়া আসিয়াছি

বিক্রমপুরের প্রাচীনত্ব

যে, বিক্রম নামে এক রাজা প্রত্যহ অগ্রদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। বর্দ্ধমানের নূতন গেজেটিয়ারেও লিখিত হইয়াছে যে, উজানী হইতে রাজা বিক্রমাদিত্য প্রত্যহ অগ্রদ্বীপে আসিয়া গঙ্গা-স্নান করিতেন।* পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, দেবগ্রাম ও বিক্রমপুর কাঁটোয়া মহকুমার মধ্যেই ছিল। বিক্রমপুর ও দেবগ্রামের প্রাচীন ভূসংস্থান ও ভাগীরথীর গতি হইতে বেশ মনে হইবে যে, বর্ত্তমান অগ্রদ্বীপের মত দেবগ্রাম এবং বিক্রমপুরের কতকটা এক সময়ে ভাগীরথীর পশ্চিমে অর্থাৎ রাঢ়দেশের মধ্যে ও কতকটা বাগড়ীর মধ্যে ছিল। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর হইতে মঙ্গলকোট পর্য্যন্ত প্রায় ১২ ক্রোশ ভূভাগ বিক্রম নামক নৃপতির শাসনাধীন থাকা কিছু বিচিত্র নহে। দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভীপতি বিক্রমরাজই সম্ভবতঃ উজানী-মঙ্গলকোট, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের প্রবাদে

---

* Burdwan District Gazetteer by J. C. Peterson, 1913, p. 185. এখানে সাহেব ভ্রমক্রমে উজানীকে রাজপুতানায় লইয়া ফেলিয়াছেন। বর্দ্ধমান জেলার কাঁটোয়া মহকুমার অধীন উজানী-মঙ্গলকোটের বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎই উক্ত প্রবাদের নায়ক বলিয়া বোধ হয়।

বিক্রমকেশরী, বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎ নামে পরিচিত হইয়া থাকিবেন। বর্ত্তমান বিক্রমপুরের পার্শ্বে যে সুবিস্তীর্ণ 'জিতের মাঠ' বা 'জিতের পুষ্করিণী' বিদ্যমান, তাহা 'বিক্রমজিতের মাঠ' বা 'বিক্রমজিতের পুষ্করিণী' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ হওয়া অসম্ভব নহে। ইহার নিকট যে সুপ্রাচীন বিক্রমপুর সহর ছিল, তাহা যে রাজা বিক্রমজিতের প্রতিষ্ঠিত বা তাঁহার নামানুসারেই বিক্রমপুর নামে অভিহিত হইত, তাহাও অসম্ভব নহে।

বিজয়সেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, তিনি বিক্রমপুরের প্রাসাদ হইতে 'শাসন' প্রদান করিতেছেন। এদিকে বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসনে তৎপিতা বিজয়সেনের পরিচয়-প্রসঙ্গে নিবদ্ধ হইয়াছে—

"তস্মাদভূদখিলপার্থিবচক্রবর্ত্তী নির্ব্যাজবিক্রমতিরস্কৃত-**সাহসাঙ্কঃ**।
দিক্‌পালচক্রপুটভেদনগীতকীর্ত্তিঃ পৃথ্বীপতির্বিজয়সেনপদপ্রকাশঃ॥"

'তাঁহা (হেমন্তসেন) হইতে অখিল পার্থিব-চক্রবর্ত্তী পৃথ্বীপতি বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন। অকপট বিক্রমে **সাহসাঙ্ক** অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যও যাঁহার নিকট লজ্জিত সেই (দিক্)পালচক্রের নগরেও তাঁহার কীর্ত্তি গীত হইত।'

অন্যত্র দেখাইয়াছি যে, একে একে পালরাজগণের সামন্তচক্র নষ্ট করিয়াই মহারাজ বিজয়সেনের অভ্যুদয় হইয়াছিল।* রামচরিতে দেবগ্রাম-বালবলভীপতি বিক্রমরাজও রামপালের সামন্তচক্র মধ্যেই কথিত হইয়াছেন। এই বিক্রমরাজও এক জন অতিবিক্রমশালী নৃপতি ছিলেন বলিয়াই সম্ভবতঃ প্রশস্তিকার ভারতপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের সহিত তুল্যজ্ঞান করিয়া 'সাহসাঙ্ক'† নামেই পরিচিত করিয়া থাকিবেন। তাঁহাকে যিনি পরাজিত করিয়াছিলেন, এখন বিক্রমশালী নৃপতিকেও বিজয়সেন পরে পরাজয় করিয়াছিলেন। বিজয়সেনের প্রশস্তি-সম্বলিত তাম্রশাসন বিক্রমপুরের রাজবাটী হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। বল্লালসেনের তাম্রশাসনে 'দিক্‌পালচক্রপুটভেদনগীতকীর্ত্তিঃ'-প্রসঙ্গে যেন তাহারই আভাস দেওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রাম হইতে প্রায় ৫॥০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত সীতাহাটী গ্রামে ভূমি-খননকালে বল্লালসেনের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। বল্লালসেন এই তাম্রশাসন লিখিয়া যে ভূভাগ দান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ভূভাগ সীতাহাটী হইতে বেশী দূর নয়।‡ এই তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

"প্রৌঢ়াং রাঢ়ামকলিতচরৈর্ভূষয়ন্তোঽনুভাবৈঃ"

অর্থাৎ যে সেনবংশ প্রৌঢ় রাঢ়দেশকে অতুল প্রভাব দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন। সুতরাং

---

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা।

† জটাধরের সুপ্রাচীন সংস্কৃত কোষ অভিধানতন্ত্রে 'সাহসাঙ্ক' বিক্রমাদিত্যের নামান্তর বা পর্য্যায় বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

‡ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩১৭, ৪র্থ সংখ্যা, ২৩২ পৃষ্ঠা।
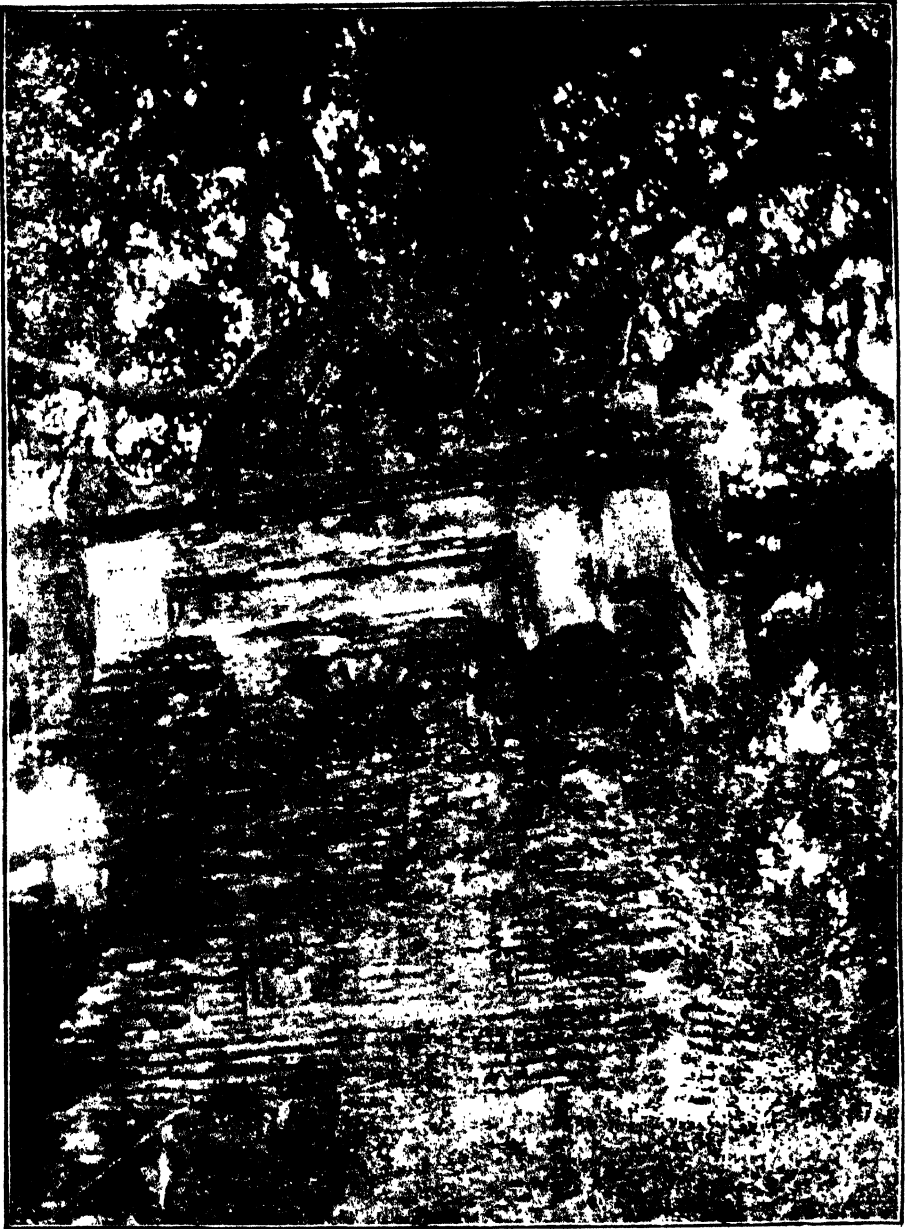
২৩। বিক্রমপুরের প্রাচীন ভগ্ন দরগা।

বল্লালসেনের তাম্রশাসন হইতেই মনে হয় যে, রাঢ়দেশই সেনবংশের পূর্ব্বলীলাস্থল। এই তাম্রশাসনখানি "শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার" হইতেই প্রদত্ত হইয়াছে।

পূর্ব্ববর্ণিত বল্লালের ভিটা, বল্লালের দীঘী ও বল্লালের জাঙ্গাল সম্বন্ধীয় প্রবাদ এবং দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের অবস্থান হইতে মনে হয় যে, বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসনবর্ণিত "বিক্রমপুরজয়স্কন্ধাবার" বর্ত্তমান দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের মধ্যেই ছিল।

চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে রচিত আনন্দভট্টের বল্লালচরিতেও লিখিত আছে—বল্লালসেন কখন গৌড়ে, কখন বিক্রমপুরে এবং কখন স্বর্ণগ্রাম বা সুবর্ণগ্রামে অবস্থান করিতেন।* চারি শত বর্ষের এই প্রবাদ-বাক্য হইতেও মনে হয় যে, বরেন্দ্রের মধ্যে গৌড় নগরে, রাঢ় দেশে বা তন্নিকটে অবস্থিত বিক্রমপুরে এবং বঙ্গদেশে সুবর্ণগ্রামে বল্লালসেন রাজকার্য্যোপলক্ষে সময় সময় অবস্থান করিতেন। বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই পূর্ব্বে যে যে স্থানে হিন্দুরাজের রাজধানী ছিল, আজ কাল সেই সেই স্থানেই অধিকাংশ মুসলমানের বাস দেখা যায়। বর্ত্তমান বিক্রম-পুর গ্রামে বা মৌজায় হিন্দুর বাস বেশী নাই, শতকরা ৯০ জন মুসলমান। কেবল ভাগীরথীর তরঙ্গাঘাত নহে—মুসলমান-হস্তেও যে এখানকার সমুদয় হিন্দু-কীর্ত্তি বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রাম ও বিক্রমপুর হাটের কতকগুলি পুরাতন ও ভগ্ন দরগাই (২৩ চিত্র দ্রষ্টব্য) পূর্ব্বতন মুসলমান-প্রভাবের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

দেবগ্রাম-বিক্রমপুর সম্বন্ধে স্থানীয় বয়োবৃদ্ধগণ যেরূপ প্রবাদ বরাবর শুনিয়া আসিতেছেন, প্রয়োজনবোধে তাঁহাদের পত্রখানি পর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল। †

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

---

* "বসতিস্ম নৃপঃ শ্রীমান্ পুরা গৌড়ে পুরোত্তমে।
কদাচিদ্বা যথাকামং নগরে বিক্রমে পুরে॥
স্বর্ণগ্রামে কদাচিদ্বা প্রাসাদে সুমনোহরে।
রমমাণঃ সহ স্ত্রীভির্দিবীব ত্রিদিবেশ্বরঃ॥"—বল্লালচরিত, ১ম অধ্যায়।

† দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের পুরাতত্ত্ব উদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, সেই জন্য এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এখানে করিলাম না। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এই বিক্রমপুর সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিব।

দেবগ্রাম-বিক্রমপুরসম্বন্ধে দেবগ্রামবাসীর পত্র

আমরা—নিম্নস্বাক্ষরকারী দেবগ্রামের অধিবাসিগণ—বংশপরম্পরাক্রমে এই প্রবাদই শুনিয়া আসিতেছি, যে দেবগ্রামস্থ দম্‌দমা নামক স্থানে যে প্রাচীন স্তূপ অদ্যাপি বিদ্যমান, উহা সেনবংশীয় প্রসিদ্ধ বঙ্গাধিপ বল্লালসেনের রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। উক্ত স্তূপসন্নিহিত বিশাল দীর্ঘিকাটি (যাহা 'সাঁওতা দীঘী' বলিয়া পরিচিত এবং এক্ষণে যাহা প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছে) বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই জানি। দেবগ্রাম-সাঁওতা হইতে যে "জোড়া জাঙ্গাল" বাহির হইয়াছে এবং যাহার একটি বরাবর নবদ্বীপ পর্য্যন্ত গিয়াছে, উহাও বল্লাল-সেনের সময়ে নির্ম্মিত রাস্তা বলিয়া এতদঞ্চলে খ্যাত। বিক্রমপুরের পার্শ্ববর্ত্তী "ভবানীপুর" গ্রামে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা আছে, উহা 'বল্লালদীঘী' বলিয়াই পরিচিত।

দেবগ্রাম হইতে ২ মাইল দূরবর্ত্তী "গড়ের বেগে" গ্রামে যে গড়ের নিদর্শন রহিয়াছে, শুনিয়াছি, উহা বল্লালসেনের গড়ের ধ্বংসাবশেষ। এতদঞ্চলে বল্লালসেন সম্বন্ধে বহু প্রাচীন কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।

ইতঃপূর্ব্বে সাময়িক পত্রিকায় পূর্ব্ববঙ্গবাসী শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় যে সুদীর্ঘ প্রতিবাদ-পত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন*, আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহাতে তিনি দেবগ্রাম-দম্‌দমার ভিটাকে "দেবলরাজার ভিটা" এবং সাঁওতার দীঘীকে "দেবলরাজার দীঘী" বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু, বলিতে কি, আমরা এ সম্বন্ধে "দেবলরাজার" নামও কখন শুনি নাই। 'দেবলরাজার' নামটি অলীক কল্পনা মাত্র, সত্যের সহিত উহার কোন সংশ্রব নাই। রায় মহাশয় ইহাও লিখিয়াছিলেন* যে, আমাদের কেহ কেহ তাঁহাকে "দেবলরাজার" কথা বলিয়াছিলাম; কিন্তু উহা আদৌ সত্য নহে। আমরা তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিতেছি। ইতি।

স্বাক্ষর—

শ্রীজানকীনাথ চক্রবর্ত্তী (বয়স ৮১ বৎসর)

শ্রীযদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৭২ বৎসর)

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৬৭ বৎসর)

শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৬২ বৎসর)

শ্রীকেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

দেবগ্রাম (নদীয়া)
১৩ বৈশাখ, ১৩২২।

---

* গত ১৩২১ সালের ১২ই চৈত্রের হিতবাদী এবং বিক্রমপুর নামক মাসিক পত্র ২য় বর্ষ, ৬৭৭-৬৮৪ পৃষ্ঠা।

আচার্য্য দিঙ্‌নাগ।

ভ্রম-সংশোধন।

২১শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা পত্রিকায় "বৌদ্ধ-ন্যায়" প্রবন্ধে "আচার্য্য দিঙ্‌নাগ" নামে যে ছবিখানি ছাপা হইয়াছিল, উহা আচার্য্য দিঙ্‌নাগের প্রতিমূর্ত্তি নহে, ভ্রমবশতঃ অন্য একখানি ছবি ছাপা হইয়াছিল। এই বার আচার্য্য দিঙ্‌নাগের ছবি দেওয়া হইল।

বৌদ্ধ ন্যায়

(২১শ ভাগ, ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

৭। এই ব্যক্তি রাগী,
যেহেতু ইনি বক্তা,
যেমন কোন একটি পুরুষ।

এ স্থলে "কোন একটি পুরুষ" উদাহরণাভাস ; যে হেতু ইহা দ্বারা রাগিত্ব ও বক্তৃত্ব এতদুভয়ের পরস্পর অন্বয় বোধিত হইতেছে না। অতএব ইহা অনন্বয় উদাহরণ।

৮। শব্দ অনিত্য,
যেহেতু উহা উৎপাদশীল,
যেমন ঘট।

এ স্থলে "ঘট" উদাহরণাভাস ; যে হেতু উৎপাদশীলত্ব ও অনিত্যত্বের মধ্যে পরস্পর অন্বয় প্রদর্শিত হয় নাই। অন্বয় দেখাইতে হইলে অনুমানটি এইরূপে প্রকাশ করা উচিত,—

শব্দ অনিত্য,
যেহেতু উহা উৎপাদশীল,
যে সকল বস্তু উৎপাদশীল, তাহারা সকলেই অনিত্য, যেমন ঘট।

এইরূপভাবে অন্বয় প্রদর্শন না করায় উদাহরণটি অপ্রদর্শিতান্বয় হইয়াছে।

৯। শব্দ উৎপাদশীল,
যেহেতু উহা অনিত্য,
অনিত্য বস্তু মাত্রই উৎপাদশীল, যেমন ঘট।

এ স্থলে "ঘট" উদাহরণাভাস। কারণ, হেতু ও সাধ্য এতদুভয়ের বিপরীতান্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। যথার্থান্বয় এইরূপে প্রকাশ করা উচিত ;—

উৎপাদশীল বস্তু মাত্রই অনিত্য, যেমন ঘট।

বিপরীত ভাবে অন্বয় প্রদর্শিত হওয়ায় উদাহরণটি বিপরীতান্বয় হইয়াছে।

বৈধর্ম্ম্য উদাহরণাভাসও নয় প্রকার।

দূষণ

উপরে পক্ষাভাস, হেত্বাভাস ও উদাহরণাভাস—এই ত্রিবিধ দোষের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রতিপক্ষের অনুমানে ইহার কোন একটি দোষ প্রদর্শন করিতে পারিলেই উহাকে দূষণ বলে। যে স্থলে দোষ নাই, তাহাতে যদি দোষের আরোপ করা হয়, তাহা হইলে উহাকে দূষণাভাস বলে। জাতি (বা জাত্যুত্তর) সকল দূষণাভাস।

তিব্বতীয় ভাষায় যে ন্যায়বিন্দু গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তাহার শেষভাগে ধর্ম্মকীর্ত্তির সম্বন্ধে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায় ;—

যেমন শাক্যমুনি মারের সেনাসমূহকে পরাভূত করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধর্ম্মকীর্ত্তি সমস্ত তীর্থিককে পরাজিত করেন ; সূর্য্য যেমন অন্ধকারসমূহকে দূরীভূত করেন, ন্যায়বিন্দুও তেমনি আত্মক-দর্শনকে নিরস্ত করিয়াছে।

ধর্ম্মকীর্ত্তির হেতুবিন্দুবিবরণ

"হেতুবিন্দুবিবরণ" নামে ধর্ম্মকীর্ত্তি-প্রণীত অপর একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। এই গ্রন্থ তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত ; যথা—(১) স্বভাবহেতু, (২) কার্য্যহেতু ও (৩) অনুপলব্ধি হেতু। এই তিন পরিচ্ছেদে হেতু ও সাধ্যের পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে।

ধর্ম্মকীর্ত্তির বাদন্যায়

"বাদন্যায়" বা "তর্কন্যায়" নামে ধর্ম্মকীর্ত্তির রচিত অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। এই গ্রন্থ উদ্যোতকরাচার্য্য স্বীয় ন্যায়বার্ত্তিক গ্রন্থে বাদবিধি নামে উল্লিখিত করিয়াছেন। বাদবিধির মত খণ্ডন করিতে যাইয়া উদ্যোতকর লিখিয়াছেন ;—

যদপি বাদবিধৌ সাধ্যাভিধানং প্রতিজ্ঞেতি প্রতিজ্ঞালক্ষণমুক্তম্।

—(ন্যায়বার্ত্তিক, ১ম অধ্যায়, ৩৩ সূত্র)।

এই বাদন্যায় বা বাদবিধি গ্রন্থ জ্ঞানশ্রীভদ্র নামে একজন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতীয় লামার সাহায্যে তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। তদনন্তর বঙ্গদেশীয় বিক্রমণী-পুরের বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বত দেশে গমন করিয়া অনুমান ১০৩৮ খৃঃ অব্দে বাদন্যায় বা বাদবিধি গ্রন্থের অনুবাদে যে সকল ভ্রম ছিল, তাহা সংশোধন করেন।

ধর্ম্মকীর্ত্তির সন্তানান্তরসিদ্ধি

সন্তানান্তরসিদ্ধি নামে ধর্ম্মকীর্ত্তি-প্রণীত অপর একখানি দার্শনিক গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে।

ধর্ম্মকীর্ত্তির সম্বন্ধপরীক্ষা

ধর্ম্মকীর্ত্তি-প্রণীত অপর একখানি দার্শনিক গ্রন্থের নাম সম্বন্ধপরীক্ষা। ইহা তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। জ্ঞানগর্ভ নামক কোন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতীয় লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

ধর্ম্মকীর্ত্তির সম্বন্ধপরীক্ষাবৃত্তি

সম্বন্ধপরীক্ষাবৃত্তি নামে ধর্ম্মকীর্ত্তি-প্রণীত অপর একখানি গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ইহা পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধপরীক্ষার টীকা মাত্র।

দেবেন্দ্রবোধি (৬৫০ খৃঃ অব্দ)

দেবেন্দ্রবোধি ধর্ম্মকীর্ত্তির সমসাময়িক। প্রমাণবার্ত্তিকপঞ্জিকা নামে দেবেন্দ্রবোধি-প্রণীত একখানি উপাদেয় ন্যায়গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। এই গ্রন্থ ধর্ম্মকীর্ত্তিকৃত প্রমাণ-বার্ত্তিক গ্রন্থের টীকা। সুভূতিশ্রী নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। প্রমাণবার্ত্তিকপঞ্জিকার রচনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায় ;—

ধর্ম্মকীর্ত্তি স্বীয় প্রমাণবার্ত্তিকের টীকা প্রণয়ন করিবার জন্য দেবেন্দ্রবোধিকে অনুরোধ করেন। দেবেন্দ্রবোধি প্রমাণবার্ত্তিকের টীকা লিখিয়া ধর্ম্মকীর্ত্তির সমক্ষে উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মকীর্ত্তি ঐ টীকা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া লিখিত পত্রগুলি জলসেকপূর্ব্বক মুছিয়া ফেলিলেন। দেবেন্দ্রবোধি দ্বিতীয় বার টীকা রচনা করিয়া ধর্ম্মকীর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি উক্ত টীকা পাঠ করিয়া উহা অগ্নিতে দগ্ধ করিলেন। দেবেন্দ্রবোধি তৃতীয় বার টীকা প্রণয়ন করিয়া ধর্ম্মকীর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বিনীতভাবে বলিলেন,—"পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই অযোগ্য এবং জীবনও ক্ষণিক। আমি যে টীকা প্রণয়ন করিয়াছি, উহা দ্বারা অল্প-বুদ্ধি লোকসমূহের উপকার হইতে পারে।" দেবেন্দ্রবোধির কাতর বচনে সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্ম-কীর্ত্তি এইবার টীকা-গ্রন্থখানি রাখিয়া দিলেন।

শাক্যবোধি (৬৭৫ খৃঃ অব্দ)

শাক্যবোধি দেবেন্দ্রবোধির শিষ্য। ইনি অনুমান খৃষ্টীয় ৬৭৫ অব্দে জীবিত ছিলেন। ইঁহার প্রণীত প্রমাণবার্ত্তিকটীকা তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। ইহা প্রমাণ-বার্ত্তিক-পঞ্জিকার টীকা মাত্র। তিব্বতীয় নৃপের লামা কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল।

বিনীতদেব (খৃষ্টীয় ৭০০ অব্দ)

বিনীতদেব নালন্দায় গোবিচন্দ্রের পুত্র ললিতচন্দ্রের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। ধর্ম্ম-কীর্ত্তি গোবিচন্দ্রের রাজত্বকালে দেহত্যাগ করেন। গোবিচন্দ্রের পিতা বিমলচন্দ্র মালবের প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ভর্ত্তৃহরির ভগিনীকে বিবাহ করেন। ই-চিঙ্‌ নামক চীন পরিব্রাজকের মতে ভর্ত্তৃহরি ৬৫২ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। অতএব গোবিচন্দ্র খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক। গোবিচন্দ্রের পুত্র ললিতচন্দ্র খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগের লোক। সুতরাং ললিতচন্দ্রের সমসাময়িক বিনীতদেব অনুমান খৃষ্টীয় ৭০০ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। উদ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিক গ্রন্থে বিনীতদেবের বাদন্যায়ব্যাখ্যা বা বাদবিধান টীকার উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, বিনীতদেবের অভ্যুদয়কালে উদ্যোতকর জীবিত ছিলেন। বিনীতদেব সময়ভেদোপরচনচক্র নামে একখানি মহাযান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক ন্যায়গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কয়েকখানির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিনীতদেবের ন্যায়বিন্দুটীকা

বিনীতদেব ধর্ম্মকীর্ত্তি-প্রণীত ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের এক টীকা বিরচন করেন ; উহার নাম ন্যায়-বিন্দুটীকা। জিনমিত্র নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় নৃপের লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। অনুবাদ-গ্রন্থ কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

বিনীতদেবের হেতুবিন্দুটীকা

বিনীতদেব হেতুবিন্দুটীকা নামে ধর্ম্মকীর্ত্তির হেতুবিন্দুগ্রন্থের উপর একখানি টীকা বিরচন করেন। ইহার তিব্বতীয় অনুবাদ এখনও বিদ্যমান আছে। প্রজ্ঞাবর্ম্ম নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় রাজার অনুবাদক লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

বিনীতদেবের বাদন্যায়-ব্যাখ্যা

ধর্ম্মকীর্ত্তির বাদন্যায় বা তর্কন্যায় গ্রন্থের উপর বিনীতদেব বাদন্যায়ব্যাখ্যা নামে একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। তিব্বতীয় ভাষায় এই গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে বিনীতদেব লিখিয়াছেন ;—

"যিনি বাদবিধিতে স্বয়ংসিদ্ধ এবং ক্ষান্তি, দয়া, দান এবং সংযমে যিনি পরম মহান্, সেই নৈয়ায়িকচূড়ামণি বুদ্ধদেবের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক এই বাদন্যায়ব্যাখ্যা বিরচন করিতেছি।"

বাদন্যায়ব্যাখ্যা গ্রন্থ উদ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিক গ্রন্থে বাদবিধানটীকা নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা ;—যদপি বাদবিধানটীকায়াং সাধয়তীতি শব্দস্য স্বয়ং পরেণ চ তুল্যত্বাৎ স্বয়মিতি বিশেষণম্।—(ন্যায়বার্ত্তিক, ১।৩৩)।

বিনীতদেবের সম্বন্ধপরীক্ষাটীকা

ধর্ম্মকীর্ত্তির সম্বন্ধপরীক্ষা গ্রন্থের উপর বিনীতদেব সম্বন্ধপরীক্ষাটীকা নামে এক টীকা বিরচন করেন। এই টীকা তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। জ্ঞানগর্ভ নামক কোন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় রাজার অনুবাদক লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে বিনীতদেব লিখিয়াছেন ;—

"যিনি সংসারে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত হইয়াও সংসারের পরমগুরু-পদবাচ্য, সেই ভগবান্ বুদ্ধদেবের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক এই সম্বন্ধপরীক্ষাটীকা বিরচন করিতেছি।"

বিনীতদেবের আলম্বনপরীক্ষাটীকা

বিনীতদেব আলম্বনপরীক্ষাটীকা নামে দিঙ্‌নাগ-প্রণীত আলম্বনপরীক্ষা গ্রন্থের উপর একখানি উপাদেয় টীকা বিরচন করেন। এই টীকা-গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। শাক্যসিংহ নামক কোন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতের রাজার অনুবাদক লামার সহ-

যোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে বিনীতদেব লিখিয়াছেন ;—

"করুণাময় সর্ব্বজ্ঞদেবকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া এবং অবনতমস্তকে তাঁহার চরণে প্রণিপাত-পূর্ব্বক আমি এই আলম্বনপরীক্ষাটীকা বিরচন করিতেছি।" গ্রন্থের শেষে এইরূপ লিখিত আছে ; —

আলম্বনপরীক্ষাটীকা সমাপ্ত হইল। আচার্য্য বিনীতদেব সর্ব্ববিধ আলম্বন (চিন্তার বিষয়) পরীক্ষা করিয়া এই বিমল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বাদিগজকেশরী বিনীতদেব তীর্থিকগণের মস্তক বিচূর্ণ করিয়াছেন।

বিনীতদেবের সন্তানান্তরসিদ্ধিটীকা

ধর্ম্মকীর্ত্তির সন্তানান্তরসিদ্ধি গ্রন্থের উপর বিনীতদেব এক টীকা প্রণয়ন করেন। উহার নাম সন্তানান্তরসিদ্ধিটীকা। এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। বিশুদ্ধসিংহ নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় রাজার লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

চন্দ্রগোমি (৭০০ খৃষ্টাব্দ)

জীবন-চরিত

চন্দ্রগোমি বারেন্দ্র-ভূমিতে ক্ষত্রিয়-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান রাজসাহী জেলায় পদ্মা নদীর তীরে উঁহার বাসভূমি ছিল। ইনি একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, জ্যোতিষ, সঙ্গীত, কলাবিদ্যা এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রে ইঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ও খ্যাতি ছিল। ইনি আচার্য্য স্থিরমতির নিকট সূত্র ও অভিধর্ম্মপিটক অধ্যয়ন করেন এবং বিদ্যাধর আচার্য্য অশোক কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। আচার্য্য অশোক 'সামান্যদূষণদিক্‌প্রকাশিকা' নামে একখানি ন্যায়গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আর্য্য অবলোকিতেশ্বর ও আর্য্য তারার প্রতি চন্দ্রগোমির সবিশেষ ভক্তি ছিল। যখন চন্দ্রগোমি জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময় বারেন্দ্রভূমির রাজার সহিত নালন্দার রাজার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। নালন্দার রাজা স্বীয় কন্যা চন্দ্রগোমিকে সম্প্রদান করিবেন স্থির করিয়া বারেন্দ্রের রাজার নিকট প্রস্তাব করেন। বারেন্দ্রের রাজার অনুরোধে চন্দ্রগোমি বিবাহ করিতে সম্মত হন। কিন্তু যখন শুনিতে পাইলেন যে, যে কন্যাকে বিবাহ করিতে যাইতেছেন, উহার নাম তারা, তখন তিনি ভয়ে কম্পিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, তারা তাঁহার উপাস্য দেবতা, তাঁহার ভবিষ্যৎ পত্নীকে সেই নামে তিনি কি করিয়া সম্বোধন করিবেন ? অতএব তিনি রাজকন্যার পরিণয়ে অস্বীকৃত হইলেন। বারেন্দ্রের রাজা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া চন্দ্রগোমিকে একটি সিন্দুকে পুরিয়া গঙ্গায় (পদ্মায়) নিক্ষেপ করিলেন। সিন্দুক ভাসিতে ভাসিতে গঙ্গা (পদ্মা) ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে আসিয়া প্রতিরুদ্ধ হইল।

চন্দ্রগোমি ভক্তিভরে ভগবতী আর্য্য-তারার স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে তিনি সিন্ধুক হইতে বহির্গত হইয়া সন্নিহিত দ্বীপে উপস্থিত হইলেন ও তথায় বাস করিতে লাগিলেন। চন্দ্রগোমির নামানুসারে ঐ দ্বীপ চন্দ্রদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ হইল। চন্দ্রগোমি চন্দ্রদ্বীপে অবলোকিতেশ্বর ও তারার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। চন্দ্রদ্বীপে প্রথমতঃ কেবল কৈবর্ত্ত জাতির বসতি ছিল; ক্রমে অন্যান্য জাতিরও সমাগম হয়। চন্দ্রদ্বীপ ক্রমশঃ একটি বৃহৎ নগরে পরিণত হয়। চন্দ্রদ্বীপ কোথায়, নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, উহা কাশ্মীরে অবস্থিত। কিন্তু আমার বোধ হয়, উহা বঙ্গদেশের বাখরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত।

আবির্ভাব-কাল

চন্দ্রগোমির আবির্ভাব-কাল অনুমান ৭০০ খৃষ্টাব্দ। চন্দ্রগোমি যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, তখন সিংহ নামক একজন লিচ্ছবিবংশীয় রাজা বারেন্দ্রভূমিতে রাজত্ব করিতেন। মহারাজ শ্রীহর্ষের পুত্র শীলও ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন। শ্রীহর্ষ সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙ্‌এর সমসাময়িক; অতএব খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক। সুতরাং তাঁহার পুত্র শীল ও তৎসমসাময়িক চন্দ্রগোমি সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে জৈন হেমচন্দ্র 'শব্দানুশাসন' নামক স্বীয় সংস্কৃত ব্যাকরণে চন্দ্রগোমির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ৬৬১ খৃষ্টাব্দে জয়াদিত্য পাণিনির যে কাশিকাবৃত্তি প্রণয়ন করেন, উহাতে চন্দ্র-ব্যাকরণের মত উদ্ধৃত হয় নাই। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, চন্দ্রগোমি জয়াদিত্যের পরে ও হেমচন্দ্রের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রগোমির চন্দ্রব্যাকরণ

চন্দ্রদ্বীপে কিছু কাল অবস্থিতি করিয়া চন্দ্রা-গোমি সিংহলে গমন করেন। তথায় তাঁহার যত্নে একটি সুবৃহৎ বিহার ও একটি পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সিংহলের রাজা চন্দ্রগোমিকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। তাঁহার শিষ্যবর্গের অবস্থানের জন্য তিনি বিস্তর ভূমি দান করেন। সিংহল হইতে প্রত্যাগমনকালে চন্দ্রগোমি দাক্ষিণাত্যে বররুচি নামক একজন ব্রাহ্মণের গৃহে পাণিনি ব্যাকরণের পাতঞ্জল ভাষ্য দেখিতে পান। উহা পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতীতি হয় যে, উহাতে বহু শব্দ আছে, কিন্তু অর্থ অতি অল্প। এই হেতু তিনি স্বয়ং পাণিনি ব্যাকরণের ভাষ্য-স্বরূপে একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন, উহার নাম চন্দ্রব্যাকরণ। উহার মঙ্গলাচরণ-শ্লোক এই ;—

সিদ্ধং প্রণম্য সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বীয়ং জগতো গুরুম্।
লঘুবিস্পষ্টসম্পূর্ণমুচ্যতে শব্দলক্ষণম্॥

চন্দ্রব্যাকরণ ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে তিব্বতের শাসনকর্ত্তা, জেতকর্ণ নামক একজন নেপালী ব্রাহ্মণ ও তিব্বতের একজন লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয়

ভাষায় অনুবাদিত করেন। তিব্বতের থরপালিঙ্ নামক স্থানে এই অনুবাদ-কার্য্য সম্পন্ন হয়। অনুবাদ-গ্রন্থের শেষে এইরূপ লিখিত আছে;—

"যত দিন চন্দ্র ও সূর্য্য থাকিবে, তত দিন এই গ্রন্থের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাকুক।"

চন্দ্রগোমি ও চন্দ্রকীর্ত্তি

দাক্ষিণাত্য হইতে চন্দ্রগোমি বিহারের অন্তর্গত নালন্দা নামক স্থানে আগমন করেন। ঐ সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় জগদ্বিখ্যাত ছিল। নালন্দায় আসিয়া তাঁহার চন্দ্রকীর্ত্তির সহিত সাক্ষাৎ হয়। চন্দ্রকীর্ত্তি একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও বৈয়াকরণ ছিলেন। তাঁহার প্রণীত মাধ্যমিকা বৃত্তি ও সংস্কৃত ব্যাকরণ বৌদ্ধ-জগতে সুপরিচিত। চন্দ্রকীর্ত্তি মাধ্যমিক দর্শনের মত অনুবর্ত্তন করিতেন, কিন্তু চন্দ্রগোমি যোগাচারমতাবলম্বী ছিলেন। যখন চন্দ্রগোমির সহিত চন্দ্র-কীর্ত্তির শাস্ত্রীয় বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন সন্নিহিত লোক-সকল বলিয়া উঠিয়াছিল,—"অহো! মাধ্যমিক দর্শনের মত কাহারও পক্ষে ঔষধ এবং কাহারও পক্ষে বিষ; কিন্তু যোগাচার-দর্শনের মত সকলের পক্ষেই অমৃতময়।" চন্দ্রগোমি বৌদ্ধ গৃহস্থ ছিলেন, তিনি ভিক্ষু হন নাই। তিনি নালন্দায় আগমন করিলে তত্রত্য বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ তাঁহাকে গৃহস্থ মনে করিয়া ভিক্ষু-জনোচিত সমাদর প্রদর্শন ও অভ্যর্থনা করিতে অনিচ্ছুক হন। চন্দ্রকীর্ত্তি চন্দ্রগোমির প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। চন্দ্রকীর্ত্তি তিনখানি সুবৃহৎ রথ আনাইয়া নগরের প্রান্তভাগে স্থাপন করিলেন। মধ্যস্থিত রথে বিদ্যার অধিষ্ঠাতা দেব মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তি স্থাপিত হইল। পার্শ্ববর্ত্তী রথদ্বয়ে চন্দ্রকীর্ত্তি ও চন্দ্রগোমি অধিরোহণ করিয়া মঞ্জুশ্রীর প্রহরিরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রথ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে টানিয়া আনা হইল। পথের দুই ধারে সহস্র সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু পুষ্প, ধূপ, দীপ প্রভৃতি দ্বারা মঞ্জুশ্রীর স্তব ও পূজা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রগোমি মনে করিলেন, তাঁহারই অভ্যর্থনার জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সমাগত হইয়াছেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবার পর চন্দ্রগোমি চন্দ্রকীর্ত্তির সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হন। চন্দ্রকীর্ত্তির প্রতিভা দর্শন করিয়া চন্দ্রগোমির আত্ম-ধিক্কার উপস্থিত হয়। চন্দ্রকীর্ত্তির সংস্কৃত ব্যাকরণ অবলোকন করিয়া চন্দ্রগোমির মনে হয়, তাঁহার চন্দ্রব্যাকরণ অকিঞ্চিৎকর বস্তু। তিনি ঐ গ্রন্থ বিলুপ্ত করিবার জন্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে কোন কূপমধ্যে উহা নিক্ষেপ করেন। তখন মঞ্জুশ্রী তথায় উপস্থিত হইয়া চন্দ্রগোমিকে বলেন,—"হে বৎস, তুমি এরূপ করিও না; তোমার প্রণীত চন্দ্রব্যাকরণ অমূল্য গ্রন্থ। যখন চন্দ্রকীর্ত্তির ব্যাকরণ জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইবে, তখনও তোমার ব্যাকরণের সমাদর অক্ষুণ্ণ রহিবে।" অনন্তর মঞ্জুশ্রী স্বয়ং কূপ হইতে ব্যাকরণখানি তুলিয়া উপরে আনিলেন। প্রবাদ আছে যে, ঐ কূপের জল পান করিয়া বা স্পর্শ করিয়া অনেকে মহাপাণ্ডিত্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নালন্দার এই কূপ চন্দ্রকূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

চন্দ্রগোমির ন্যায়ালোক-সিদ্ধি

চন্দ্রগোমি 'আর্য্যতারা-অন্তর্বলিবিধি' নামে একখানি তন্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত চন্দ্রগোমি-প্রণীত ন্যায়ালোক-সিদ্ধি নামে একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। শ্রীসিতপ্রভ নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতের রাজার অনুবাদকের সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।*

রবিগুপ্ত (৭২৫ খৃষ্টাব্দ)

রবিগুপ্ত কাশ্মীরদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন অসাধারণ কবি, তার্কিক এবং তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি স্বদেশে ও মগধে দ্বাদশটি ধর্ম্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। রবিগুপ্ত বারেন্দ্রের রাজা ভর্ষের সমসাময়িক ; অতএব চন্দ্রগোমির কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী। ৭০০ খৃষ্টাব্দে ভর্ষের পিতা সিংহ বারেন্দ্রভূমিতে রাজত্ব করিতেন। সুতরাং রবিগুপ্ত অনুমান ৭২৫ খৃষ্টাব্দের লোক। রবিগুপ্তের প্রধান শিষ্যের নাম সর্ব্বজ্ঞমিত্র। ইনি একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। অনুমান ৭৫০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বজ্ঞমিত্র স্রগ্ধরাস্তোত্র নামে একখানি তন্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রবিগুপ্ত প্রমাণবার্ত্তিকবৃত্তি নামে একখানি উপাদেয় ন্যায়গ্রন্থ বিরচন করেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রমাণবার্ত্তিক-কারিকা নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই টীকা মাত্র। প্রমাণবার্ত্তিকবৃত্তির তিব্বতীয় অনুবাদ এখনও বিদ্যমান আছে।

জিনেন্দ্রবোধি (৭২৫ খৃষ্টাব্দ)

জিনেন্দ্রবোধি বোধিসত্ত্বের স্বদেশীয় লোক। তিনি বিশালামলবতী-নাম-প্রমাণসমুচ্চয়-টীকা প্রণয়ন করেন। এই টীকার তিব্বতীয় অনুবাদ বিদ্যমান আছে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে জিনেন্দ্রবোধি নামে এক বৈয়াকরণ পাণিনি ব্যাকরণের "ন্যাস" টীকা প্রণয়ন করেন। বোধ হয়, এই ন্যাস-প্রণেতা ও বিশালামলবতীনামপ্রমাণসমুচ্চয়-টীকা-প্রণেতা একই ব্যক্তি।

শান্তরক্ষিত (৭৪৯ খৃষ্টাব্দ)

শান্তরক্ষিত জহোরের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, তিনি গোপালের রাজত্ব-কালে খৃষ্টীয় ৭০৫ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে ৭৬২ খৃষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ করেন। তিনি স্বতন্ত্রমাধ্যমিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিব্বতের রাজা খৃ-স্রোঙ্-দেউ-চনের আহ্বানে তিনি তিব্বতদেশে গমন করেন। তাঁহার সাহায্যে তিব্বত-রাজ ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্ম্মাণ করেন।

---

* চন্দ্রগোমির সম্বন্ধে এ স্থলে যে বিবরণ প্রদত্ত হইল, উহা তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। ইহার কতক অংশ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি "কায়স্থ-সংহিতা"য় প্রকাশ করিয়াছিলাম। চন্দ্রব্যাকরণ-প্রণেতা চন্দ্রগোমি ও ন্যায়ালোক-সিদ্ধি-প্রণেতা চন্দ্রগোমি একই ব্যক্তি, ইহা তিব্বতীয় ঐতিহাসিকগণের মত। কিন্তু কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত, বৈয়াকরণ চন্দ্রগোমিকে খৃষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করেন। এ বিষয়ের সম্পূর্ণ আলোচনা অন্যত্র প্রকাশিত হইবে।

ইহার নাম সাম্-য়ে অর্থাৎ অচিন্ত্য বিহার। ইহা মগধের ওদন্তপুর বিহারের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বিহার তিব্বতের সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধবিহার এবং শান্তরক্ষিত ইহার সর্ব্বপ্রথম অধিনায়ক ছিলেন। শান্তরক্ষিত ত্রয়োদশ বর্ষ অর্থাৎ ৬৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিব্বতে বাস করেন। তিব্বতে তিনি আচার্য্য বোধিসত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

শান্তরক্ষিতের বাদন্যায়-বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ

শান্তরক্ষিত বাদন্যায়বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ নামে ধর্ম্মকীর্ত্তির বাদন্যায় গ্রন্থের উপর এক টীকা বিরচন করেন। কুমার শ্রীভদ্র নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতদেশে গমন করিয়া তদ্দেশের দো জেলার দুই জন লামার সাহায্যে সাম্-য়ে বিহারে বসিয়া এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। বাদন্যায়-বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"যিনি বহু বিশুদ্ধ সদ্গুণরাশির প্রভায় নিয়ত অন্ধকার বিদূরিত করিয়া অনন্ত জীবের অভিলাষ সফল করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন এবং যিনি পরমানন্দে সমগ্র জগতের উপকার সাধন করিয়াছিলেন, সেই মঞ্জুশ্রীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া আমি এই সংক্ষিপ্ত এবং নির্দ্দোষ বাদন্যায়বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ প্রণয়ন করিতেছি।"

শান্তরক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহকারিকা

তত্ত্বসংগ্রহকারিকা নামে শান্তরক্ষিত-প্রণীত অপর একখানি উপাদেয় ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। গুণাকর শ্রীভদ্র নামক কাশ্মীরীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতদেশে গমন করিয়া, তিব্বতীয় রাজার লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। ইহাতে সাংখ্য, জৈন প্রভৃতি বহু দর্শনের মত সমালোচিত হইয়াছে।

তত্ত্বসংগ্রহকারিকার অপর নাম তর্কসংগ্রহ। কমলশীল নামক শান্তরক্ষিতের এক শিষ্য ইহার এক টীকা প্রণয়ন করেন। সটীক তত্ত্বসংগ্রহকারিকার অপর নাম কমলশীলতর্ক। জসল্মির প্রদেশের পার্শ্বনাথ-মন্দিরে কমলশীলতর্কের একখানি প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে। উহার সহিত তিব্বতীয় অনুবাদ-গ্রন্থের কোনই প্রভেদ নাই।

তত্ত্বসংগ্রহকারিকা একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। যথা ;—(১) স্বভাবপরীক্ষা। (২) ইন্দ্রিয়-পরীক্ষা। (৩) উভয়পরীক্ষা। (৪) জগৎস্বভাববাদপরীক্ষা। (৫) শব্দব্রহ্মবাদপরীক্ষা। (৬) পুরুষপরীক্ষা। (৭) ন্যায়-বৈশেষিক-পরিকল্পিত-পুরুষপরীক্ষা। (৮) মীমাংসক-কল্পিত আত্মপরীক্ষা। (৯) কপিলপরিকল্পিত আত্মপরীক্ষা। (১০) দিগম্বর-পরিকল্পিত আত্মপরীক্ষা। (১১) উপনিষৎকল্পিত আত্মপরীক্ষা। (১২) বাৎসীপুত্রকল্পিত আত্মপরীক্ষা। (১৩) স্থিরপদার্থ-পরীক্ষা। (১৪) কর্ম্মফলসম্বন্ধপরীক্ষা। (১৫) দ্রব্যপদার্থপরীক্ষা। (১৬) গুণশব্দার্থপরীক্ষা। (১৭) কর্ম্মশব্দার্থপরীক্ষা। (১৮) সামান্যশব্দার্থপরীক্ষা। (১৯) বিশেষশব্দার্থপরীক্ষা। (২০) সমবায়শব্দার্থপরীক্ষা। (২১) শব্দার্থপরীক্ষা। (২২) প্রত্যক্ষলক্ষণপরীক্ষা। (২৩) অনুমান-

পরীক্ষা। (২৪) প্রমাণান্তরপরীক্ষা। (২৫) বিবর্ত্তবাদপরীক্ষা। (২৬) কালত্রয়পরীক্ষা। (২৭) সংসারসন্ততিপরীক্ষা। (২৮) বাহ্যার্থপরীক্ষা। (২৯) শ্রুতিপরীক্ষা। (৩০) স্বতঃপ্রামাণ্য-পরীক্ষা। (৩১) অন্তেন্দ্রিয়াতীতার্থদর্শনপুরুষপরীক্ষা।

গ্রন্থের প্রারম্ভে শান্তরক্ষিত বুদ্ধকে প্রণামপূর্ব্বক লিখিয়াছেন ;—

প্রকৃতীশোভয়াত্মাদি-ক্রিয়য়া রহিতং চলম্।
কর্ম্ম তৎফলসম্বন্ধ-ব্যবস্থাদিসমাশ্রয়ম্॥
গুণ-দ্রব্যক্রিয়াজাতি-সমবায়াদ্যুপাধিভিঃ।
শূন্যমারোপিতাকারশব্দপ্রত্যয়গোচরম্॥
স্পষ্টলক্ষণসংযুক্তপ্রমাদ্বিতয়নিশ্চিতম্।
অণীয়সাপি নাংশেন মিশ্রীভূতাপরাত্মকম্॥
অসংক্রান্তিমনাদ্যন্তং প্রতিবিম্বাদিসংনিভম্।
সর্ব্বপ্রপঞ্চসন্দোহনির্ম্মুক্তমগতং পরৈঃ॥
স্বতন্ত্রশ্রুতিনিঃসঙ্গো জগদ্ধিতবিধিৎসয়া।
অনল্পকল্পাসংখ্যেয়-সাত্মীভূতমহোদয়ঃ॥
যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদং জগাদ বদতাং বরঃ।
তং সর্ব্বজ্ঞং প্রণম্যায়ং ক্রিয়তে তর্কসংগ্রহঃ॥

কমলশীল (৭৫০ খৃষ্টাব্দ)

কমলশীল শান্তরক্ষিতের শিষ্য। ইনি কমলশ্রীল নামে প্রসিদ্ধ। কমলশীল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের তন্ত্র-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিব্বতের রাজা খ্রি-স্রোঙ্-দেউ-চন কর্ত্তৃক আহূত হইয়া কমলশীল তিব্বতে গমন করেন। তথায় গুরু পদ্মসম্ভব ও শান্তরক্ষিতের ধর্ম্মমতের সমর্থনপূর্ব্বক তিনি চীনদেশীয় মহাযান হোসাঙ্ নামক যতিকে পরাভূত করেন। তাঁহার খ্যাতি বহুবিস্তৃত ছিল এবং তৎপ্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকদ্বয় বৌদ্ধ-জগতে সুপরিচিত।

ন্যায়বিন্দুপূর্ব্বপক্ষে সংক্ষিপ্ত

কমলশীল-প্রণীত ন্যায়বিন্দুপূর্ব্বপক্ষে সংক্ষিপ্ত নামক একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। এই গ্রন্থ ধর্ম্মকীর্ত্তির ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের সমালোচনা মাত্র। বিশুদ্ধসিংহ নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

তত্ত্বসংগ্রহ-পঞ্জিকা

কমলশীল-প্রণীত তত্ত্বসংগ্রহ-পঞ্জিকা বা তর্কসংগ্রহ-পঞ্জিকা একখানি উপাদেয় ন্যায়গ্রন্থ। শান্তরক্ষিত-প্রণীত তত্ত্বসংগ্রহকারিকা গ্রন্থের ইহা একখানি প্রধান টীকা। ভারতীয় বৌদ্ধ

পণ্ডিত দেবেন্দ্রভদ্র তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

কল্যাণরক্ষিত (৮২৯ খৃষ্টাব্দ)

কল্যাণরক্ষিত একজন অসাধারণ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। ইনি ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যের গুরু। মহারাজ ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে অনুমান খৃষ্টীয় ৮২৯ অব্দে কল্যাণরক্ষিতের অভ্যুদয় হয়। তাঁহার প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রসিদ্ধ।

বাহ্যার্থসিদ্ধিকারিকা

বাহ্যার্থসিদ্ধিকারিকা নামে কল্যাণরক্ষিত-প্রণীত একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। এই গ্রন্থে বৈভাষিক মত অবলম্বন করিয়া বাহ্য জগতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। মূল গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। কিন্তু তিব্বতীয় অনুবাদ বিদ্যমান আছে। কাশ্মীরের জিনমিত্র নামক বৈভাষিক গুরু তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

শ্রুতিপরীক্ষা

শ্রুতিপরীক্ষা নামে কল্যাণরক্ষিত-প্রণীত অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ইহাতে শ্রুতির প্রামাণ্য নিরাকৃত হইয়াছে। ইহা অনষ্টুপ্‌ ছন্দে লিখিত। মূল গ্রন্থ বিদ্যমান নাই, কিন্তু ইহার অনুবাদ এখনও তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে।

অন্যাপোহবিচারকারিকা

অন্যাপোহবিচারকারিকা কল্যাণরক্ষিতের অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ। ইহাও অনুষ্টুপ্‌ ছন্দে লিখিত। ইহাতে অপোহবাদের সূক্ষ্ম পরীক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। মূল গ্রন্থ বিদ্যমান নাই, কিন্তু তিব্বতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ঈশ্বরভঙ্গকারিকা

কল্যাণরক্ষিত-প্রণীত ঈশ্বরভঙ্গকারিকা নামে অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ইহা অনুষ্টুপ্‌ ছন্দে লিখিত। ইহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্মণ দার্শনিক উদয়নাচার্য্য এই গ্রন্থের মত নিরাকরণ করিবার জন্যই বোধ হয়, কুসুমাঞ্জলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য (৮৪৭ খৃষ্টাব্দ)

ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য কাশ্মীরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কল্যাণরক্ষিত ও ধর্ম্মাকর দত্তের শিষ্য। যখন বনপাল বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন, সেই সময়ে অনুমান খৃষ্টীয় ৮৪৭ অব্দে ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হন। জৈন দার্শনিক মল্লবাদী ৮৮৪ শকে অর্থাৎ ৯৬২ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যের ন্যায়বিন্দু টীকার উপর এক টিপ্পনী বিরচন করেন। ইহার নাম ধর্ম্মোত্তর-টিপ্পনক। ১১৮১

খৃষ্টাব্দে রত্নপ্রভ সূরি নামক সুপ্রসিদ্ধ জৈন দার্শনিক স্বীয় স্যাদ্বাদরত্নাবতারিকা গ্রন্থে ধর্ম্মোত্তরের মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন ;—

অত্র ধর্ম্মোত্তরানুসারী প্রাহ। প্রয়োজনমাদিবাক্যেন সাক্ষাদাখ্যায়তে ইতি ন ক্ষমে। —(স্যাদ্বাদরত্নাবতারিকা, পৃঃ ১০)।

ন্যায়বিন্দুটীকা

ধর্ম্মকীর্ত্তির ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের উপর ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য যে টীকা বিরচন করেন, উহার নাম ন্যায়বিন্দুটীকা। কাম্বের শান্তিনাথ জৈন-মন্দিরে ন্যায়বিন্দুটীকার একখানি প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহা কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটী দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছে। জ্ঞানগর্ভ নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় ন্যায়বিন্দুটীকা গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। পরে সুমতিকীর্ত্তি নামক একজন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে এই অনুবাদ সংশোধিত করেন। ন্যায়বিন্দুটীকার প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে ;—

জয়ন্তি জাতিব্যসনপ্রবন্ধপ্রসূতিহেতোর্জ্জগতো বিজেতুঃ।
রাগাদ্যরাতেঃ সুগতস্য বাচো মনস্তমস্তানবমাদধানাঃ॥
—(ন্যায়বিন্দুটীকা, প্রথম পরিচ্ছেদ)।

"যিনি জন্ম, জরা প্রভৃতি বিপৎসমূহের উৎপাদক সংসারকে জয় করিয়াছেন এবং যিনি রাগাদির শত্রু, সেই বুদ্ধের বাক্য আমাদের মানসিক অন্ধকারকে বিদূরিত করিয়া জয় লাভ করুক।"

প্রমাণপরীক্ষা

প্রমাণপরীক্ষা নামে ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য-প্রণীত অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ইহার মূল সংস্কৃত প্রতিলিপি পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহার অনুবাদ তিব্বতীয় ভাষায় রহিয়াছে। লো-দেন্-শে-রাব্ নামক একজন তিব্বতীয় লামা এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন।

অপোহ-নাম-প্রমাণপ্রকরণ

অপোহ-নাম-প্রমাণ ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যের অপর একখানি গ্রন্থ। কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিত ভাগ্যরাজ তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে কাশ্মীরে বসিয়া এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন।

পারলোকসিদ্ধি

ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য-প্রণীত অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, ইহার নাম পারলোকসিদ্ধি। কাশ্মীরীয় পণ্ডিত ভাগ্যরাজ তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেবের রাজত্বকালে (১০৮৯-১১০১ খৃষ্টাব্দে) কাশ্মীরে এই অনুবাদ-কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়। গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"জন্মের পূর্ব্ব হইতে মৃত্যুর পর পর্য্যন্ত আমাদের যে চিৎসন্ততি থাকে, পারলোকে ঐ সন্ততির বিচ্ছেদ হয়, ইহা কোন কোন দার্শনিকের মত।" ইত্যাদি।

ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি

ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য-প্রণীত অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ। ইহাতে বস্তুর ক্ষণিকত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভাগ্যরাজ নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। অনুবাদ-গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে।

প্রমাণবিনিশ্চয়টীকা

ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য-প্রণীত অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, উহার নাম প্রমাণবিনিশ্চয়-টীকা। ইহা ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবিনিশ্চয় গ্রন্থের ব্যাখ্যা মাত্র। পরহিতভদ্র নামক কাশ্মীরীয় পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। গ্রন্থের পরিশেষে লিখিত আছে;—

"সকল বিতণ্ডাবাদিগণের পরাভবকর্ত্তা ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।"

মুক্তাকুম্ভ (৮৪৭ খৃষ্টাব্দের পর)

মুক্তাকুম্ভ নামক একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যের ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি গ্রন্থের এক টীকা বিরচন করেন। উহার নাম ক্ষণভঙ্গসিদ্ধিব্যাখ্যা। বিনায়ক নামক কোন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। মুক্তাকুম্ভ ধর্ম্মোত্তরের পরবর্ত্তী কালের লোক। অতএব তিনি ৮৪৭ খৃষ্টাব্দের পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

অর্চ্চট (৮৪৭ খৃষ্টাব্দের পর)

অর্চ্চট কাশ্মীরদেশীয় একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরিশেষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। জৈন দার্শনিক গুণরত্ন সূরি ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে স্বীয় ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়বৃত্তি গ্রন্থের বৌদ্ধদর্শন পরিচ্ছেদে অর্চ্চট-প্রণীত তর্কটীকার উল্লেখ করিয়াছেন। ১১৮১ খৃষ্টাব্দে রত্নপ্রভ সূরি নামক অপর একজন জৈন দার্শনিক স্যাদ্বাদরত্নাবতারিকা গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে অর্চ্চটের নাম উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন;—

"অর্চ্চটচর্চ্চচতুরঃ পুনরাহ। ইহ প্রেক্ষাবতাং প্রবৃত্তিঃ প্রয়োজনবত্তয়া ব্যাপ্তা।"

—(স্যাদ্বাদরত্নাবতারিকা, ১ম পরিচ্ছেদ)।

ন্যায়াবতারবিবৃতি গ্রন্থে ধর্ম্মোত্তর ও অর্চ্চট উভয়ের নামই উল্লিখিত আছে; যথা,—
"অভিধেয়াদিসূচনদ্বারোৎপন্নার্থসংশয়মুখেন শ্রোতারঃ শ্রবণং প্রতি প্রোৎসাহ্যন্তে ইতি

ধর্ম্মোত্তরো মন্যতে। অর্চ্চটস্তু আহ। ন শ্রাবকোৎসাহকমেতৎ প্রামাণ্যাভাবাৎ তেষাং চাপ্রমাণাদপবৃত্তেঃ।—(ন্যায়াবতারবিবৃতি, ১ম পরিচ্ছেদ)

উদ্ধৃত স্থল দেখিয়া বোধ হয়, অর্চ্চট ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যের পরে অর্থাৎ ৮৪৭ খৃষ্টাব্দের পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

অর্চ্চটের হেতুবিন্দুবিবরণ

ধর্ম্মকীর্ত্তির হেতুবিন্দু গ্রন্থের উপর অর্চ্চট যে টীকা প্রণয়ন করেন, উহার নাম হেতুবিন্দু-বিবরণ। এই গ্রন্থ চারি পরিচ্ছেদে বিভক্ত; যথা,—(১) স্বভাব, (২) কার্য্য, (৩) অনুপলব্ধি এবং (৪) ষড়্‌লক্ষণব্যাখ্যা।

গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিত আছে যে, অর্চ্চট ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে যে, কাশ্মীর নগর জম্বু দ্বীপের সার। এখানে অর্চ্চট ধর্ম্মকীর্ত্তির গ্রন্থ রোপণ করিয়া যে ফল উৎপন্ন করিলেন, মূর্খেরাও উহার রসাস্বাদ করিতে সমর্থ হইবে।

দানশীল (৮৯৯ খৃষ্টাব্দ)

যখন মহীপাল বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ অনুমান ৮৯৯ খৃষ্টাব্দে দানশীল বা দানশ্রীল কাশ্মীর দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরহিতভদ্র, জিনমিত্র, সর্ব্বজ্ঞদেব এবং তিলোপার সমসাময়িক ছিলেন। তিনি তিব্বতদেশে গমন করিয়া তদানীন্তন নরপতিকে সংস্কৃত পুস্তক তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিবার বহু সহায়তা করেন।

তাঁহার প্রণীত "পুস্তকপাঠোপায়" একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এই গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ এখনও বিদ্যমান আছে। দানশীল স্বয়ং এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।

জিনমিত্র (৮৯৯ খৃষ্টাব্দ)

জিনমিত্র কাশ্মীর দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞদেব, দানশীল ও অন্যান্য বৌদ্ধ পণ্ডিতের সহ তিব্বত দেশে গমন করিয়া বহু সংস্কৃত পুস্তক তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। তিনি যে সময়ে তিব্বত দেশে গমন করেন, সেই সময়ে খ্রী-রল্ তিব্বতদেশে ও মহীপাল বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে, জিনমিত্র অনুমান ৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

তিনি ধর্ম্মকীর্ত্তির ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক ন্যায়বিন্দুপিণ্ডার্থ নামে একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সুরেন্দ্রবোধি নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

প্রজ্ঞাকরগুপ্ত (৯৪০ খৃষ্টাব্দ)

যখন মহীপাল বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে ৯৪০ খৃষ্টাব্দে প্রজ্ঞাকরগুপ্ত প্রাদুর্ভূত হন। প্রজ্ঞাকরগুপ্ত উপাসক ছিলেন। তিনি ও প্রজ্ঞাকরমতি এক ব্যক্তি নহেন।

প্রজ্ঞাকরমতি ভিক্ষু ছিলেন। তিনি মহারাজ চণকের রাজত্বকালে ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণদ্বারের রক্ষক ছিলেন। প্রজ্ঞাকরগুপ্ত-প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রসিদ্ধ।

প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কার

ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবার্ত্তিক গ্রন্থের প্রজ্ঞাকরগুপ্ত যে টীকা বিরচন করেন, উহার নাম প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কার। ভাগ্যরাজ নামক কাশ্মীরদেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। তদনন্তর সুমতি নামক কোন বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই অনুবাদ সংশোধন করেন। বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু পণ্ডিত এই অনুবাদ-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। মহাপণ্ডিত সুনয়শ্রী মিত্র এবং কাশ্মীরের মহাপণ্ডিত কুমারশ্রী এই অনুবাদ-কার্য্যে তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন।

সহাবলম্ভনিশ্চয়

সহাবলম্ভনিশ্চয় প্রজ্ঞাকরগুপ্ত-প্রণীত অপর একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। নেপালদেশীয় পণ্ডিত শান্তিভদ্র তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় তিব্বতের "দো" জেলার অন্তর্গত সেঙ্কর গ্রামে বসিয়া এই গ্রন্থ অনুবাদিত করিয়াছিলেন।

তর্কভাষা

প্রজ্ঞাকরগুপ্ত-প্রণীত তর্কভাষা একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। তিব্বতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ এখনও বিদ্যমান আছে। তর্কভাষা তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত; যথা—(১) প্রত্যক্ষ, (২) স্বার্থানুমান এবং (৩) পরার্থানুমান। গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে;—

"ধর্ম্মকীর্ত্তির তর্কশাস্ত্র সুকুমারমতি বালকগণের বোধগম্য করিবার জন্য ভগবান্ লোকনাথ বুদ্ধকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আমি এই তর্কভাষা প্রণয়ন করিতেছি।"

আচার্য্য জেতারি (৯৪০-৯৮০ খৃষ্টাব্দ)

আচার্য্য জেতারি ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর পিতার নাম গর্ভপাদ। তিনি বারেন্দ্রভূমির রাজা সনাতনের রাজধানীতে বাস করিতেন। সনাতন মগধের পালবংশীয় রাজগণের অধীনে সামন্ত-রাজা ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া জেতারি বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং মঞ্জুশ্রীর আরাধনা করিতে থাকেন। তাঁহার প্রসাদে অল্পকালমধ্যেই তিনি মহাবিদ্বান্ হইয়া পড়েন। তিনি বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের "পণ্ডিত" এই উপাধিসূচক পত্র স্বয়ং রাজা মহাপালের হস্ত হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতীশ জেতারির নিকট পঞ্চবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। মহাপাল ৯৪০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং দীপঙ্কর ৯৮০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। অতএব

আচার্য্য জেতারি অনুমান খৃষ্টীয় ৯৪০—৯৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। জেতারি-প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি অতি প্রসিদ্ধ।

হেতুতত্ত্ব উপদেশ

আচার্য্য জেতারি-প্রণীত হেতুতত্ত্ব-উপদেশ একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। কুমার-কলস নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। অনুবাদ-গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে।

ধর্ম্মধর্ম্মিবিনিশ্চয়

আচার্য্য জেতারি-প্রণীত ধর্ম্মধর্ম্মিবিনিশ্চয় একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। এই গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। কিন্তু তিব্বতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ এখনও বিদ্যমান আছে।

বালাবতার-তর্ক

বালাবতার-তর্ক নামে জেতারি-প্রণীত অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। এই গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহার অনুবাদ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। নাগরক্ষিত নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতের কোন লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। এই গ্রন্থ তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত; যথা,—(১) প্রত্যক্ষ, (২) স্বার্থানুমান এবং (৩) পরার্থানুমান। বালাবতার-তর্ক গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে,—"যিনি স্বীয় উপদেশের প্রভায় অজ্ঞানান্ধকার সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করিয়াছেন এবং যিনি ত্রিলোকের একমাত্র প্রদীপ, সেই ভগবান্ বুদ্ধদেব চিরকাল বিজয়ী থাকুন।"

জিন (৯৮৩ খৃষ্টাব্দ)

জিন একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ইহার নাম প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কারটীকা। বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত দীপঙ্কর তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে অনুমান ১০৪০ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

কোঙ্কণ প্রদেশে জিনভদ্র নামক এক বৌদ্ধ পণ্ডিত বাস করিতেন। বোধ হয়, তিনি ও প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কারটীকা-প্রণেতা একই ব্যক্তি। ইনি বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত বাগীশ্বরকীর্ত্তির সমসাময়িক, অতএব অনুমান ৯৮৩ খৃষ্টাব্দের লোক।

জ্ঞানশ্রী (৯৮৩ খৃষ্টাব্দ)

জ্ঞানশ্রী মিত্র গৌড়দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক। জ্ঞানশ্রীভদ্র নামক একজন নৈয়ায়িক কাশ্মীরে বিদ্যমান ছিলেন। গৌড়ের জ্ঞানশ্রীমিত্র ও কাশ্মীরের জ্ঞানশ্রীভদ্র এক ব্যক্তি কি না, বলা যায় না। জ্ঞানশ্রীমিত্র প্রথমতঃ শ্রাবক যানের অনুবর্ত্তন করিতেন, পরে তিনি মহাযানমতে শ্রদ্ধাবান্ হন। দীপঙ্কর বা শ্রীজ্ঞান

অতীশ জ্ঞানশ্রীমিত্রের নিকট অনেক বিষয়ে সবিশেষ ঋণী ছিলেন। মগধের রাজা চণকের রাজত্বকালে অনুমান ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানশ্রীমিত্র বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বাররক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে হিন্দু দার্শনিক মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের বৌদ্ধ-দর্শন-প্রস্তাবে জ্ঞানশ্রীর মত উদ্ধৃত করিয়াছেন ; যথা,—

তদুক্তং জ্ঞানশ্রিয়া—

যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা জলধরঃ সন্তশ্চ ভাবা অমী
সত্তাশক্তিরিহার্থকর্ম্মণি মিতেঃ সিদ্ধেষু সিদ্ধা ন সা।
নাপ্যেকৈব বিধান্যথা পরকৃতেনাপি ক্রিয়াদির্ভবেৎ
দ্বেধাপি ক্ষণভঙ্গসন্ততিরতঃ সাধ্যে চ বিশ্রাম্যতি ॥

—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ।

জ্ঞানশ্রী-প্রণীত নিম্নলিখিত ন্যায়গ্রন্থ প্রসিদ্ধ ;—

প্রমাণবিনিশ্চয়টীকা

প্রমাণবিনিশ্চয়টীকা একখানি প্রামাণিক ন্যায়গ্রন্থ। ইহা জ্ঞানশ্রীভদ্র-প্রণীত। ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবিনিশ্চয় গ্রন্থের ইহা টীকা মাত্র। এই গ্রন্থ জ্ঞানশ্রীভদ্র স্বয়ং তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

কার্য্যকারণভাবসিদ্ধি

কার্য্যকারণভাবসিদ্ধি একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। জ্ঞানশ্রীমিত্র এই গ্রন্থের প্রণেতা। কুমার কলস নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। তদনন্তর নেপালদেশীয় পণ্ডিত অনন্তশ্রী পূর্ব্বোক্ত লামার সহযোগিতায় অনুবাদগ্রন্থ সংশোধিত করেন।

রত্নবজ্র (৯৮৩ খৃষ্টাব্দ)

কাশ্মীরদেশে ব্রাহ্মণকুলে রত্নবজ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ তীর্থিক শাস্ত্রে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। তাঁহার পিতা হরিভদ্র বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। রত্নবজ্র উপাসক ছিলেন। তিনি ৩৬ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বৌদ্ধসূত্র, মন্ত্র প্রভৃতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন। তদনন্তর তিনি মগধ ও বজ্রাসনে আগমন করিয়া চক্রসংবর, বজ্রবরাহী প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবতার মুখাম্বুজ অবলোকন করিতে সমর্থ হন এবং ঐ সকল দেবতার সাহায্যে সমগ্র বৌদ্ধ-শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া পড়েন। তিনি বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়া ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার-রক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তদনন্তর তিনি কাশ্মীরে প্রত্যাগমন করিয়া উদ্যানের (কাবুলের) পথে তিব্বতে গমন করেন। তিব্বতে তিনি "আচার্য্য" এই নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। যে সময়ে রাজা চণক মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে রত্নবজ্র প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থ প্রসিদ্ধ।—

যুক্তিপ্রয়োগ

রত্নবজ্রকৃত যুক্তিপ্রয়োগ একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। শ্রীসুভূতিশান্ত নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

রত্নাকরশান্তি (৯৮৩ খৃষ্টাব্দ)

রত্নাকরশান্তি তিব্বত দেশে আচার্য্য শান্তি বা শান্তিপ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ওদন্তপুরের সর্ব্বাস্তিবাদ-সম্প্রদায়ের মধ্যে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে জেতারি, রত্নকীর্ত্তি প্রভৃতি অধ্যাপকের নিকট সূত্র ও তন্ত্র অধ্যয়ন করেন। মগধের রাজা চণক অনুমান ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে রত্নাকরশান্তিকে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার-রক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। তিনি বহু তীর্থিককে তর্ক-যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সিংহলের রাজার আহ্বানে সিংহলদ্বীপে গমন করেন এবং তথায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল প্রচার সাধন করেন।

রত্নাকরশান্তির গুরু রত্নকীর্ত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। রাজা বিমলচন্দ্রের সময়ে এক রত্নকীর্ত্তি জীবিত ছিলেন। তিনি মধ্যমকাবতারটীকা, কল্যাণকাণ্ড এবং ধর্ম্মবিনিশ্চয় গ্রন্থ বিরচন করেন। অপোহসিদ্ধি ও ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি এই দুই গ্রন্থের প্রণেতা রত্নকীর্ত্তি অবশ্য ভিন্ন ব্যক্তি। স্থিরদূষণ এবং বিচিত্রাদ্বৈতসিদ্ধি বোধ হয়, এই শেষোক্ত রত্নকীর্ত্তিই বিরচন করিয়াছেন। তিনিই বোধ হয়, রত্নাকরশান্তির গুরু।

রত্নাকরশান্তি ছন্দোরত্নাকর নামে একখানি ছন্দোগ্রন্থ বিরচন করেন। ইহার তিব্বতীয় অনুবাদ বিদ্যমান আছে।

বিজ্ঞপ্তিমাত্রসিদ্ধি

রত্নাকরশান্তি-প্রণীত বিজ্ঞপ্তিমাত্রসিদ্ধি একখানি উপাদেয় ন্যায়গ্রন্থ। নেপালদেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত শান্তিভদ্র তিব্বতদেশের দো জেলার কোন বিদ্বান্ লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। অনুবাদ-গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে।

অন্তর্ব্যাপ্তি

রত্নাকরশান্তির অন্তর্ব্যাপ্তিও একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। কুমারকলস নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। মূল সংস্কৃত অন্তর্ব্যাপ্তি গ্রন্থের প্রতিলিপি নেপালে বিদ্যমান আছে। এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ নাম অন্তর্ব্যাপ্তিসমর্থন।

বাগ্ভট (৯৮৩ খৃষ্টাব্দ)

বাগ্ভট-প্রণীত সর্ব্বজ্ঞসিদ্ধিকারিকা একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। বাগ্ভট ও বাগীশ্বরকীর্ত্তি একই ব্যক্তি কি না, বলা যায় না। বাগ্ভট সম্ভবতঃ ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

যমারি (১০৫০ খৃষ্টাব্দ)

যমারি ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। তিনি পরিবার ভরণপোষণ করিতে অসমর্থ হইয়া একদা বজ্রাসনে (বুদ্ধগয়ায়) আগমন করেন। তথায় তিনি এক যোগীর নিকট তাঁহার দারিদ্র্যের বিষয় বর্ণন করিলে যোগী উত্তর করেন,—"আপনারা পণ্ডিত, এই অহঙ্কারে যোগীদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করেন না। অতএব আপনাদের দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী।" এই কথা বলিয়া যোগী বসুধর মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র যমারির অতুল ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন হইল। তিনি সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি স্বীয় বিদ্যাবত্তায় বিক্রমশিলা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে প্রশংসাপত্র লাভ করেন। যমারি নয়পাল রাজার সমসাময়িক। অতএব ১০৫০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কারটীকা

প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কারটীকা যমারিপ্রণীত একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। প্রজ্ঞাকরগুপ্ত প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কার নামে যে গ্রন্থ বিরচন করিয়াছিলেন, ইহা তাহার টীকা মাত্র। সুমতি নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় হ্লাসা নগরের সন্নিকটে বসিয়া এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে;—

"আমি এই টীকা বিরচন করিয়া যে অক্ষয় পুণ্য লাভ করিয়াছি, তাহার ফলে সংসারের লোকসমূহ পরম শত্রু মৃত্যুকে পরাভব করিয়া অবিনশ্বর পরিনির্ব্বাণ লাভ করুক।"

শঙ্করানন্দ (১০৫০ খৃষ্টাব্দ)

কাশ্মীরের কোন ব্রাহ্মণ-বংশে শঙ্করানন্দের জন্ম হয়। তিনি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ধর্ম্মকীর্ত্তিকে পরাভূত করিয়া একখানি মৌলিক ন্যায়গ্রন্থ লিখিবার বাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বপ্নে তাঁহার প্রতি আদেশ হইল,—"ধর্ম্মকীর্ত্তি একজন আর্য্য। তাঁহাকে পরাভূত করা কাহারও সাধ্য নহে। ধর্ম্মকীর্ত্তির গ্রন্থে যদি তুমি কোন ভ্রম দেখিয়া থাক, ইহা তোমার বুদ্ধির ভ্রম।" এই উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া শঙ্করানন্দের মনে অনুতাপ উৎপন্ন হইল। তিনি ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবার্ত্তিক গ্রন্থের এক টীকা বিরচন করিলেন। যখন নয়পাল বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ অনুমান ১০৫০ খৃষ্টাব্দে শঙ্করানন্দ কাশ্মীরদেশে জীবিত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থ প্রসিদ্ধ;—

প্রমাণবার্ত্তিকটীকা

শঙ্করানন্দ-প্রণীত প্রমাণবার্ত্তিকটীকা একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবার্ত্তিক গ্রন্থের ইহা একখানি অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা। ইহা সাত পরিচ্ছেদে বিভক্ত। অনুবাদ-গ্রন্থ এখনও তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে।

সম্বন্ধপরীক্ষানুসার

শঙ্করানন্দ-প্রণীত সম্বন্ধপরীক্ষানুসারও একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। ইহা ধর্ম্মকীর্ত্তির সম্বন্ধ-পরীক্ষা গ্রন্থের টীকা মাত্র। পরহিতভদ্র নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। অনুবাদ-গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"যিনি সংসারের সহিত সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহাতে অহঙ্কার ও মমকারের লেশমাত্র নাই এবং যিনি সমস্ত ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র, সেই বুদ্ধদেবকে আমি নমস্কার করি।"

অপোহসিদ্ধি

শঙ্করানন্দ-প্রণীত অপোহসিদ্ধি একখানি অমূল্য ন্যায়গ্রন্থ। মনোরথ নামক কাশ্মীর-দেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় কাশ্মীরে বসিয়া এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"যিনি সকল ভ্রান্তি হইতে পরিমুক্ত এবং যিনি সর্ব্বকালে জীবের হিতসাধনে রত, সেই সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়া ও তাঁহার করুণার উপর নির্ভর করিয়া আত্ম ও পর—এতদুভয়ের সম্বন্ধসূচক অপোহবাদ ব্যাখ্যা করিতেছি।"

প্রতিবন্ধসিদ্ধি

শঙ্করানন্দ-প্রণীত প্রতিবন্ধসিদ্ধিও একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহাতে কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে। ভাগ্যরাজ নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। অনুবাদ-গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

শ্রীবিক্রমপুর

শ্রীবিক্রমপুর কোথায়? হরিবর্ম্মদেব, ভোজবর্ম্মা, শ্রীচন্দ্র, বিজয়সেন, বল্লালসেন এবং লক্ষ্মণসেন প্রমুখ বঙ্গ-রাজগণের তাম্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার কোথায়? জ্যোতিবর্ম্মা, বজ্রবর্ম্মা, জাতবর্ম্মা, শ্যামলবর্ম্মা, বিশ্বরূপসেন, কেশবসেন প্রভৃতি রাজন্যবর্গের স্মৃতি-বিজড়িত বিক্রমপুর কোন্ স্থানে অবস্থিত? এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই মনে করিত এবং সমুদয় ঐতিহাসিকগণই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ঢাকা-বিক্রমপুরেই বঙ্গ-রাজগণের জয়স্কন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ সম্বন্ধে কেহ কখনও অবিশ্বাসের রেখাপাতও করেন নাই। সম্প্রতি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় নদীয়া জেলায় দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের সন্ধান পাইয়া, দেবগ্রামের "দমদমার ভিটাকেই" বল্লালসেনের সীতাহাটী তাম্রশাসন-বর্ণিত বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন(১)। সুতরাং এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে, "বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার" কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল? উহা কি ভীম-প্রবাহা, ভীষণ-তরঙ্গসঙ্কুল পদ্মা-মেঘনাদের সলিল-সিক্ত ঢাকা-বিক্রমপুর প্রদেশের কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল, না পূত-সলিলা জাহ্নবীর প্রাচীন প্রবাহের তীরদেশে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরমধ্যেই সংস্থাপিত ছিল? এত কাল কি আমরা পুরুষপরম্পরাক্রমে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই ঢাকা-বিক্রমপুরকে বঙ্গাধিপতিগণের লীলা-নিকেতন বলিয়া বিনা বিচারেই গ্রহণ করিয়াছি, না উহা সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? যাহা হউক, কথাটা যখন একবার উঠিয়াছে, তখন ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়াই সঙ্গত। "সত্য প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, সাধারণের গৃহীত হউক অথবা প্রচলিত মতের বিরোধীই হউক, তাহার জন্য ভাবিব না"। বিনা প্রমাণে আমরা কিছুই বিশ্বাস করিব না এবং সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব না।

এখানে বলিয়া রাখি যে, "হিতবাদী" ও "অমৃতবাজার" পত্রিকায় নগেন্দ্র বাবুর এই অভিনব আবিষ্কারের কাহিনী পাঠ করিয়াই আমার দেবগ্রাম-বিক্রমপুর সন্দর্শন করিবার স্পৃহা জন্মে। ফলে গত ২৯শে ফাল্গুন তারিখে ঐ স্থানে গমন করিয়া দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শনগুলি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি এবং দেবগ্রামের সপ্ততিবর্ষবয়স্ক কতিপয় সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ বৃদ্ধের নিকট অনুসন্ধান করিয়া, "দমদমার ভিটা" (এই ভিটাকেই নগেন্দ্র বাবু বল্লালের ভিটা বলিয়া প্রমাণ করিতে সমুৎসুক), সাওতার দীঘী, দেবকুণ্ড, কুলইচণ্ডী প্রভৃতির

(১) অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কর্ত্তৃক সম্পাদিত "বর্দ্ধমানের ইতিকথা" নামক পুস্তকে বসুজ মহাশয়ের প্রমাণাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।

যথাসম্ভব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। দেবগ্রামের প্রাচীন অধিবাসিগণ দমদমার ভিটাকে "দেবল রাজার ভিটা" বলিয়াই জানেন, বল্লালের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ থাকার বিষয় তাঁহারা একেবারেই অনবগত। গত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের বাচনিক অবগত হইয়াছি যে, বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির অনুসন্ধানের ফলেও দমদমার ভিটার সহিত বল্লালের কোন সম্বন্ধ নির্ণীত হয় নাই। যাহা হউক, এতৎ-সম্পর্কে হিতবাদী পত্রিকার স্তম্ভে বিস্তর আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এ স্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আমার এই আলোচনায় সম্ভবতঃ কাহারও কাহারও মনোবেদনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই ফলে দেবগ্রামনিবাসী কতিপয় প্রৌঢ় ভদ্রলোক হিতবাদী পত্রিকায় আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া আমার ক্ষীণ বুদ্ধিতে যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে, আমি অকপটে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি, পরন্তু কাহারও মনে ক্লেশ দেওয়া আমার অভিপ্রেত নহে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রথমতঃ বর্দ্ধমানের ইতিকথা নামক পুস্তকের স্থান-পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত—"দেবগ্রাম-বিক্রমপুর" শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া, উপসংহারে শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারের অবস্থান নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

আলোচ্য পুস্তকের ৫৬ পৃষ্ঠায় ১৯শ ও ২০শ সংখ্যক চিত্রের পাদদেশে লিখিত "বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের এক ধার", "বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের অপর ধার" সম্ভবতঃ লিপিকরপ্রমাদ। কারণ, এই প্রস্তরখণ্ড দেবগ্রামের জনৈক ভদ্রলোকের অন্তঃপুরস্থিত একটি ক্ষুদ্র গৃহের দ্বারদেশে রক্ষিত আছে এবং ইহা তাঁহার অন্তঃপুরের একটি কূপ খনন করিবার সময়ে ভূগর্ভমধ্যে পাওয়া গিয়াছিল।

নগেন্দ্র বাবু, গোপালভট্ট এবং আনন্দভট্টের এক্সমালীতে লিখিত এবং পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বল্লাল-চরিতের—

> "বসতিস্ম নৃপঃ শ্রীমান্ পুরা গৌড়ে পুরোত্তমে।
> কদাচিদ্বা যথাকামং নগরে বিক্রমে পুরে ॥
> স্বর্ণগ্রামে কদাচিদ্বা প্রাসাদে সুমনোহরে।
> রমমাণঃ সহ স্ত্রীভির্দিবীব ত্রিদিবেশ্বরঃ ॥"

এই শ্লোকদ্বয় অধ্যাহার করিয়া লিখিয়াছেন,—"চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে রচিত আনন্দভট্টের বল্লাল-চরিতেও লিখিত আছে—বল্লালসেন কখন গৌড়ে, কখন বিক্রমপুরে এবং কখন স্বর্ণগ্রাম বা সুবর্ণগ্রামে অবস্থান করিতেন। চারি শত বর্ষের এই প্রবাদ-বাক্য হইতেও মনে হয় যে, বরেন্দ্রের মধ্যে গৌড় নগরে, রাঢ়দেশে বিক্রমপুরে এবং বঙ্গদেশে সুবর্ণ গ্রামে বল্লালসেন রাজ-

কার্য্যোপলক্ষে সময় সময় অবস্থান করিতেন।" বিক্রমপুর যে রাঢ়দেশে অবস্থিত, তাহা বল্লাল-চরিতের এই শ্লোকটি হইতে পাওয়া যায় না।

সাধারণতঃ দুইখানি বল্লাল-চরিত দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একখানি ৺হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং অপরখানি পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক মুদ্রিত। বলা বাহুল্য যে, উভয় বল্লাল-চরিতই গোপালভট্ট ও আনন্দভট্ট কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া উল্লিখিত হইলেও এই উভয় পুস্তকের ভাষা ও বিষয়গত পার্থক্য যথেষ্ট রহিয়াছে। বিশেষতঃ এই শ্লোক দুইটিও ৺হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন-প্রকাশিত বল্লাল-চরিতে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং কোন্‌খানিকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিব? আচার্য্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় কেবলমাত্র একখানি হস্তলিখিত পুথি অবলম্বন করিয়াই বল্লাল-চরিত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু এই পুথিও কাগজে লেখা, তালপাতায় নহে। সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়ের আদর্শ পুথি যে প্রাচীন নহে, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শুনিতে পাওয়া যায় যে, চুঁচুড়ায় এক সুবর্ণবণিকের বাড়ীতেও একখানি বল্লাল-চরিত আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সুবর্ণবণিক্ জাতির প্রাচীন সামাজিক মর্য্যাদা এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এ ক্ষেত্রে এই বইখানি যে পরবর্ত্তী কালে রচিত হয় নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? চুচুড়ায় প্রাপ্ত বইখানি কিন্তু এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

শাস্ত্রী মহাশয়ই রামচরিত গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। রামচরিতের ঐতিহাসিক তথ্যগুলি যেরূপ সরল, বল্লাল-চরিতের কথাগুলি তদ্রূপ সরল নহে। ইহাতে বৃথা বাগাড়ম্বরেরও বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। রাম-চরিতে শত শত ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে এবং তাহার সমুদয়গুলিই তাম্রশাসন বা শিলালিপির প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু বল্লাল-চরিতে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ নাই বলিলেই হয়। যাহাও দুই একটি আছে, তাহার সমর্থনকারী প্রমাণ অদ্যাবধি কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই। বল্লাল সেনের একখানি মাত্র তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং অপর পক্ষ যদি এ কথা বলেন যে, ভবিষ্যতে আরও খোদিতলিপি আবিষ্কার হইলে বল্লাল-চরিতোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির সমর্থন বাহির হইবে, তবে তাঁহাদের কথার উত্তরে বলিতে হয় যে, সমর্থক প্রমাণ আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত বল্লাল-চরিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত নয়।

রাম-চরিত সমসাময়িক ব্যক্তির লেখনী-প্রসূত। পক্ষান্তরে বল্লাল-চরিত বল্লালের মৃত্যুর প্রায় চারি শত বৎসর পরে রচিত হইয়াছে। অতএব রাম-চরিতের কথা যেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়, বল্লাল-চরিতের কথা তেমন করিয়া বিশ্বাস করা উচিত নয়। অতএব বল্লাল-চরিতের ঐ শ্লোক দুইটির মূল্য অতি অল্প। বিশেষতঃ বল্লাল-চরিতেও এমন কোন কথা উল্লিখিত হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া বিক্রমপুরকে অনায়াসে রাঢ়দেশে স্থাপিত করা চলে।

প্রাচীন বিক্রমপুর নগর যেখানে অবস্থিত ছিল, নগেন্দ্র বাবু সেখানে কখনও যান নাই।

দমদমার ভিটা হইতে বিক্রমপুরের দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। এই দমদমার ভিটাতেই বল্লাল সেনের শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার, রাজধানী বা প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া নগেন্দ্র বাবু প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহা হইলে তাম্রশাসনাদিতে দেবগ্রামের নাম উল্লিখিত না হইয়া বিক্রমপুরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে কেন ? বিক্রমপুর হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী দমদমার ভিটায় জয়স্কন্ধাবার বা রাজধানীই বা কেন প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল ? নগেন্দ্র বাবু বলিতে পারেন যে, বিক্রমপুর সহর দমদমার ভিটা পর্য্যন্তই বিস্তৃত ছিল, কিন্তু তাহা হইলে বিক্রমপুর ও দমদমার মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরমধ্যে কোনও প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন নাই কেন? নগেন্দ্র বাবু হয় ত বলিবেন, রাজধানী ছিল বিক্রমপুরে, কিন্তু রাজবাড়ী ছিল তাহা হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী দমদমায়। কিন্তু পুরাকালে রাজপ্রাসাদ নগরের কেন্দ্রস্থানেই নির্ম্মিত হইত, বড় জোর নগর-প্রাসাদের মধ্যেই অবস্থিত থাকিত। নগরের বাহিরে পাঁচ মাইল দূরে রাজ-প্রাসাদ, ইহা অশ্রুতপূর্ব্ব। সুতরাং যদি দমদমার ভিটা বল্লালের ভিটা বলিয়াই পরিচিত থাকে, তবুও উহা বল্লাল সেনের রাজধানী, রাজপ্রাসাদ বা জয়স্কন্ধাবার হইতে পারে না। দমদমার ভিটা ও সাওতার দীঘী হইতে দুইটি জাঙ্গাল রামপাল ও নবদ্বীপ পর্য্যন্ত যে সম্প্রসারিত ছিল, তাহা সত্য বটে এবং এই জাঙ্গাল হয় ত বল্লালসেনেরই নির্ম্মিত। কিন্তু তাহা দ্বারা কি প্রমাণিত হইবে যে, এই জাঙ্গাল যে স্থানে আসিয়াছে, সেই স্থানেই বল্লালের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল ?

নগেন্দ্র বাবু "বিক্রম-তিরস্কৃত-সাহসাঙ্ক"পদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া দেবগ্রামপতি বিক্রম-রাজকে বিক্রমাদিত্যের সমতুল্য বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। দেবগ্রামের বিক্রমরাজ যে সাহসাঙ্ক নামে পরিচিত হইতেন, তাহার প্রমাণ কি ? এই সাহসাঙ্ক পদ ব্যবহার করিয়া প্রশস্তিকার হয় ত পুরাকালের বিক্রমাদিত্যকে অথবা চালুক্য-বংশের সাহসাঙ্ককে বিজয়সেন অপেক্ষা খাটো করিয়াছেন। দেবগ্রামের বিক্রমরাজ সম্বন্ধীয় এরূপ কোনও প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে তাঁহাকে ভারত-প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য অথবা চালুক্যবংশীয় সাহসাঙ্ক নৃপতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সুতরাং এ স্থলে সাহসাঙ্ক পদ দ্বারা দেবগ্রামাধিপতি বিক্রমরাজের কোনও ইঙ্গিত কল্পনা করা যায় না। সাহসাঙ্ক নামে একজন রাজা ছিলেন ; তিনিও বিজয়সেনের সমসাময়িক ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ভূস্বামীকে কেন ধরিতে যাই ?

দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভিপতি বিক্রমরাজই যে উজানী, মঙ্গলকোট, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের প্রবাদে বিক্রমকেশরী, বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎ, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর যে বিক্রমরাজ বা বিক্রমাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত, তাহারই বা প্রমাণ কোথায় ? বাঙ্গালার বহু স্থানেই ত "জিতের মাঠ" বা "জিতের পুষ্করিণী" রহিয়াছে, সুতরাং নগেন্দ্র বাবুর যুক্তি অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, তৎসমুদয়ের সহিতই বিক্রমজিৎ নামক এক রাজার বা বহু রাজার স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে।

দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতে যাইয়া নগেন্দ্র বাবু লিখিতেছেন,—"খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে গুড়বমিশ্রের গরুড়স্তম্ভলিপিতে বর্ণিত হইয়াছে*—

"দেবগ্রামভবা ধন্যা দেবীস্থ তুল্যবলয়ালোকসন্দীপিতরূপা।
দেবকীব তস্মাদ্গোপালপ্রিয়কারকমসূত পুরুষোত্তমম্" ॥

এই শিলালিপির প্রমাণেও আমরা বলিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই দেবগ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থানে গৌড়েশ্বর নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় ছিল বলিয়া তাঁহার প্রশস্তিকার সগৌরবে এই দেবগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন"।

নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত শ্লোক গরুড়স্তম্ভলিপিতে দৃষ্ট হয় না। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় গরুড়স্তম্ভলিপির একটি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ পাঠ প্রকাশিত হইয়াছিল(১)। অবশেষে অধ্যাপক কিলহর্ণের অধ্যবসায়বলে একটি মূলানুগত পাঠ মুদ্রিত হইয়াছিল বটে(২), কিন্তু তাহাতেও সমুদয় সংশয়ের নিরসন হইয়াছিল না। পরে গৌড়লেখমালায় একটি বিশুদ্ধ পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে(৩)। কিন্তু কি এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ, কি অধ্যাপক কিলহর্ণের পাঠ অথবা কি গৌড়লেখমালা-ধৃত পাঠ, কোথায়ও নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত শ্লোকটির সন্ধান পাইলাম না। গরুড়স্তম্ভলিপির ১৬শ ও ১৭শ শ্লোকে লিখিত আছে;—

"দেবগ্রাম-ভবা তস্য পত্নী বব্বাভিধাঽভবৎ।
অতুল্যাচলয়া লক্ষ্ম্যা সত্যা চাপ্য(নপত্য) য়া ॥
সা দেবকীব তস্মাৎ যশোদয়া স্বীকৃতং পতিং লক্ষ্ম্যাঃ।
গোপাল-প্রিয়কারকমসূত পুরুষোত্তমং তনয়ং ॥"

—গৌড়লেখমালা, ৭৪-৭৫ পৃঃ।

ইহা হইতে জানা যায় যে, গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় এক দেবগ্রামে ছিল। কিন্তু গরুড়স্তম্ভলিপি হইতেও নগেন্দ্র বাবুর দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব প্রমাণ হয় না। বঙ্গদেশে দেবগ্রাম নামে বহু গ্রাম রহিয়াছে। দেবগ্রাম নামক কোনও গ্রামের সন্ধান পাইলেই যে তাহাকে গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় বলিয়া পরিচিত করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। আলোচ্য দেবগ্রামেই যে গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় ছিল, তাহার প্রমাণ কি ?

নগেন্দ্র বাবু রামচরিতের টীকায় রামপালের সামন্তচক্রমধ্যে দেবগ্রামাধিপতি বিক্রম-

---

* বর্দ্ধমানের ইতিকথা—৫৫ পৃষ্ঠা।

(১) J. A. S. B. 1874. Pages 356-358.

(২) Epigraphia Indica Vol. II. Pages 161-164.

(৩) গৌড়লেখমালা—৭১-৭৬ পৃষ্ঠা।

রাজের(১) নাম উল্লিখিত রহিয়াছে দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রামচরিতের দেবগ্রামই নদীয়া জেলায় অবস্থিত বিক্রমপুরের অনতিদূরবর্ত্তী দেবগ্রাম। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসরণ করিয়া তিনি বালবলভীকে বাগড়ি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন(২)। কিন্তু এই উক্তির সমর্থক কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। "রামচরিতে" বালবলভীর বিবরণ দেখিয়া বোধ হয় যে, উক্ত দেশ নদীবহুল ছিল। হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরে আবিষ্কৃত প্রশস্তিতে বালবলভীর উল্লেখ সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি এবং রামচরিত ব্যতীত ভবদেব ভট্ট-বিরচিত "প্রায়শ্চিত্ত-নিরূপণ" ও "তন্ত্রবার্ত্তিকটীকা" নামক গ্রন্থদ্বয়ে তাঁহার বালবলভীভুজঙ্গ উপাধিতে বালবলভীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে বর্ত্তমান সময়ে দেবগ্রাম নামে বহু গ্রাম আছে, সুতরাং দেবগ্রাম বা বালবলভী যে নদীয়া জেলায় অবস্থিত ছিল, এ কথা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে না(৩)। যাহা হউক, বালবলভীকে বাগড়ি এবং দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভী-পতি বিক্রমরাজকে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও সিদ্ধান্ত-বারিধি মহাশয়ের যুক্তিই তাঁহার সিদ্ধান্তের অন্তরায় হইয়া উঠে। কারণ, দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভীপতি বিক্রমরাজ রামপালের সামন্তচক্রমধ্যে অন্যতম ছিলেন। রামপাল ১০৫৫—১০৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে(৪)। সুতরাং ১০৫৫—১০৯৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যেই যে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরে রামপালের সামন্ত বিক্রমরাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ১০৫৫—১০৯৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে যে বিক্রমপুরে রামপালের সামন্ত বিক্রমরাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই বিক্রমপুরে বিজয়সেন, ভোজবর্ম্মা, শ্যামলবর্ম্মা, জাতবর্ম্মা, হরিবর্ম্মা ও শ্রীচন্দ্র প্রভৃতি নরপতির স্থান হইতে পারে না।

বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়ে তাম্রশাসনোক্ত "পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে" এবং কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসনোল্লিখিত "পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগপ্রদেশে" প্রভৃতি উক্তিতে বিক্রমপুরের অবস্থান স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের তাম্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর, বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার, ভোজবর্ম্মা, শ্রীচন্দ্র ও হরিবর্ম্মার শ্রীবিক্রমপুর যে অভিন্ন,

---

(১) "দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধবসুধাচক্রবালবালবলভীতরঙ্গবহলগলহস্তপ্রশস্তহস্তবিক্রমো বিক্রমরাজঃ"।
—রামচরিত, ২য় পরিচ্ছেদ, ৫ম শ্লোক, টীকা।

(২) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III. p. 14. বর্দ্ধমানের ইতিকথা—৫৫ পৃষ্ঠা। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য-কাণ্ড)—১৯৮ পৃষ্ঠা।

(৩) বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত, ২৬০ পৃষ্ঠা।

(৪) নগেন্দ্র বাবুর মতে রামপাল ১০৫৭-১০৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু চণ্ডীমৌয়ের শিলালিপি তদীয় ৪২ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড, ২১৬পৃঃ ও বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত, ২৬৯ পৃঃ।

তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তাম্রশাসনাদিতে এরূপ কোনই কথা পাওয়া যায় না, যাহাতে উপরোক্ত বিভিন্ন রাজবংশের শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারকে পৃথক্ বলিয়া মনে করিতে হইবে। বিশেষতঃ তাম্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত বঙ্গদেশে (পূর্ব্ববঙ্গে) অবস্থিত, পক্ষান্তরে নগেন্দ্র বাবুর আবিষ্কৃত দেবগ্রাম-বিক্রমপুর বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত এবং উহা বাগড়ী বা রাঢ়প্রদেশ-সংস্থ। সুতরাং নগেন্দ্র বাবুর বিক্রমপুরকে তাম্রশাসনবর্ণিত বিক্রমপুর বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব।

ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তিতে গৌড় ও বঙ্গ স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রথম ভবদেব গৌড়াধিপতির নিকট হইতে হস্তিনীভট্ট গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ভবদেব ভট্ট (বালবলভীভুজঙ্গ) বঙ্গরাজ হরিবর্ম্মার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। এই ভবদেবের পিতামহ আদিদেবও বঙ্গরাজের রাজ্যলক্ষ্মীর বিশ্রামসচিব মহাপাত্র ও অব্যর্থ সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন(১)। বঙ্গরাজ হরিবর্ম্মদেবও শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতজয়স্কন্ধাবার হইতেই তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছেন(২)। সুতরাং শ্রীবিক্রমপুরকে বঙ্গ ব্যতীত রাঢ় বা বাগড়ীতে স্থাপন করা যায় না।

রামপালে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র পরে বঙ্গরাজ হইয়াছিলেন বলিয়াই রাজকবি তাঁহার পিতাকে "হরিকেল-রাজ-ককুদ-ছত্র-স্মিতানাং শ্রিয়াং আধারঃ" রূপে বর্ণনা করিয়াছেন(৩)। এই শ্রীচন্দ্রও শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত-জয়স্কন্ধাবার হইতেই ভূমি দান করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীচন্দ্রের বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার যে হরিকেল-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। শ্রীচন্দ্র রামপালের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা। তিনি রামপালের প্রপিতামহ প্রথম মহীপালদেবের সমসাময়িক। সুতরাং তাঁহার তাম্রশাসনে যে বিক্রমপুরের উল্লেখ রহিয়াছে, সেই বিক্রমপুর কখনও রামপালের সমসাময়িক বিক্রমরাজের স্থাপিত বিক্রমপুর হইতে পারে না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীচন্দ্রের বিক্রমপুর হরিকেল-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে কথা হইতেছে, এই হরিকেল-রাজ্য কোথায়? খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র সূরিকৃত "অভিধান-চিন্তামণি"তে হরিকেল বঙ্গের (পূর্ব্ববঙ্গের) প্রাচীন নাম বলিয়া উক্ত হইয়াছে(৪)। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং হরিকেল-রাজ্যে এক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশমতে হরিকেল পূর্ব্বভারতের পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত(৫)।

---

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (ব্রাহ্মণ-কাণ্ড, ১মাংশ) ৩০৪-৩১২ পৃঃ।

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (ব্রাহ্মণ-কাণ্ড, ২য়াংশ) ২১৫ পৃঃ।

(৩) সাহিত্য, ২৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ৪০০-৪১০ পৃঃ।

(৪) "বঙ্গাস্তু হরিকেলীয়া"—ইতি হেমচন্দ্রঃ।

(৫) J Takakusu's I-Tsing P. XLVI & বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত, ২৪৭ পৃঃ।

সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ যে হরিকেলীয়ের অন্তর্গত ছিল, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। নগেন্দ্র-বাবুর বিক্রমপুর গঙ্গার পুরাতন খাড়ির পশ্চিম দিকে অবস্থিত, সুতরাং এই বিক্রমপুর হরিকেলীয় বা বঙ্গে অবস্থিত হইতে পারে না।

সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত রামচরিত গ্রন্থে লিখিত আছে,—"পূর্ব্বদিকের অধিপতি বর্ম্মরাজা নিজের পরিত্রাণের জন্য উৎকৃষ্ট হস্তী ও স্বীয় রথ প্রদান করিয়া রামপালের আরাধনা করিয়াছিলেন"(১)। বেলাব তাম্রশাসনের প্রতিপাদয়িতা ভোজবর্ম্মাকেই এই প্রাগ্দেশীয় বর্ম্মরাজা বলিয়া ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। এই ভোজবর্ম্মাও শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত-জয়স্কন্ধাবার হইতেই ভূমি দান করিয়াছেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, সন্ধ্যাকর নন্দীর বাসভূমি অথবা রামপাল বা মদনপালদেবের রাজধানী রামাবতী নগরী হইতে ভোজবর্ম্মার রাজ্য বা রাজধানী পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল বলিয়াই রাজকবি ভোজবর্ম্মাকে প্রাগ্দেশীয় বর্ম্মরাজা বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। সন্ধ্যাকর নন্দী আত্মপরিচয় প্রদানকালে বলিয়াছেন যে, তাঁহার কুলস্থান পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের সহিত প্রতিবদ্ধ ছিল; তাহা পুণ্যভূ ও বৃহদ্বটু বলিয়া পরিচিত ছিল এবং সমগ্র বসুধামণ্ডলের শীর্ষস্থানে অবস্থিত বরেন্দ্রীমণ্ডলের তাহাই চূড়ামণি ছিল(২)। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ডে করতোয়া-মাহাত্ম্যের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর ও বগুড়া জেলান্তর্গত মহাস্থানগড় অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন(৩)। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের দক্ষিণ দিকে এবং ঢাকা-বিক্রমপুর ইহার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। সুতরাং ঢাকা-বিক্রমপুরকেই প্রাগ্দেশীয় ভূপতি ভোজবর্ম্মার জয়স্কন্ধাবার বলিয়া নির্দ্দেশিত করিতে হয়। রামপাল এবং তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালের রাজ্যকালে রামাবতী যে গৌড়-রাজ্যের রাজধানী ছিল, তাহা রামচরিত এবং মদনপালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়। রামাবতীর অবস্থান লইয়া মতভেদ রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। নগেন্দ্র বাবু বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ের নিকট রামপুরা নামক স্থানে রামাবতীর অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন(৪)। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে রামাবতী সরকার জন্নতাবাদ বা গৌড়ের সীমামধ্যে অবস্থিত(৫)। রামাবতীর অবস্থান গৌড়মণ্ডলেই হউক বা বগুড়া জেলায়ই হউক, দেবগ্রাম-বিক্রমপুর এই উভয় স্থানেরই দক্ষিণ

---

(১) "স্বপরিত্রাণনিমিত্তং পত্যায়ঃ প্রাগ্দিশীয়েন।
বরবারণেন চ নিজস্যন্দনদানেন বর্ম্মণারাধে॥"—রাম-চরিত, ৩।৪৪

(২) "বসুধাশিরোবরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণিঃ কুলস্থানং।
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহদ্বটুঃ॥"—রাম-চরিত, কবি-প্রশস্তি, ১।

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য-কাণ্ড), ২০৫ পৃঃ।

(৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য-কাণ্ড), ২০৯ পৃঃ।

(৫) বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত, ২৭২ পৃঃ।

দিকে এবং ঢাকা-বিক্রমপুর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। সুতরাং শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার যে ঢাকা-বিক্রমপুরেই প্রতিষ্ঠাপিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

তাম্রশাসন ও সমসাময়িক গ্রন্থাদির আলোচনা করিলে শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারকে ঢাকা-বিক্রমপুরেই নিঃসন্দেহে স্থাপিত করিতে হইবে। বঙ্গদেশে বিক্রমপুর নামীয় বহু গ্রাম রহিয়াছে, সুতরাং কোনও স্থানের নাম বিক্রমপুর অথবা তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কোনও স্থানে প্রাচীন কীর্ত্তির কিছু নিদর্শন পাওয়া গেলেই যে, উহাকে বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হইবে, তাহার কোনই অর্থ নাই। মনে করিলে যাহা ইচ্ছা, তাহাই বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু যাহা বলা যায়, তাহার যাথার্থ্য প্রমাণ করিবার উপায় আছে কি না, তাহা পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখিলেই ভাল হয়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়

শ্রীবিক্রমপুর

(প্রতিবাদের উত্তর)

কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল যে, সেনরাজধানী বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার পূর্ব্ববঙ্গেরই কোন স্থানে; আমার নবপ্রকাশিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ডে আমার সেই পূর্ব্ব-বিশ্বাসই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অনন্তর বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসন ও ধোয়ী কবির পবনদূত পাঠ করিয়া আমার সেই বিশ্বাসে আঘাত লাগে, তৎপরে নদীয়া জেলাস্থ দেবগ্রাম-বিক্রমপুর পরিদর্শন করিয়া আমার সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হয়।

আমি চিরদিন সত্যাবিষ্কারের ভিখারী। নূতন নূতন তত্ত্বাবিষ্কারের ফলে আমাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া রাখিলে চলিবে না। বর্দ্ধমানের পুস্তিকার সময়াভাবে বিস্তৃত আলোচনা করিবার সুযোগ হয় নাই। পরিষৎ-পত্রিকায় বর্ত্তমান সংখ্যায় কোন কোন অংশ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইলেও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার অবকাশ পাই নাই। বিষয়টী নিতান্ত গুরুতর মনে করিয়া সকল দিক্ আলোচনা করিয়া একটী বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিতেছি। সুতরাং আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে পর যতীন্দ্র বাবুর প্রতিবাদ শোভনীয় হইত। তিনি যে যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, আমার প্রবন্ধে বিশদভাবে সেই সমুদয়ের আলোচনা করিয়াছি। তবে তিনি যখন আমার প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্ব্বেই প্রতিবাদ করিয়াছেন, তখন কএকজন বন্ধুর অনুরোধে অতি সংক্ষেপে তাঁহার প্রতিবাদের উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি।

১। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় আনন্দভট্টের বল্লালচরিত—একখানি পুথি দেখিয়া সম্পাদন করেন নাই। দুইখানি প্রাচীন পুথির মধ্যে একখানি অরঙ্গজেব বাদশাহের মৃত্যুবর্ষে ও অপরখানি ১১৯৮ বঙ্গাব্দের লিপি। দুইখানি পুথিই বিভিন্ন জেলা হইতে পাওয়া গিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখবন্ধ পাঠ করিলেই জানিতে পারিতেন। বল্লালচরিত-রচয়িতা আনন্দভট্টের পূর্ব্বপুরুষ সুবর্ণগ্রামের নিকটস্থ কাসার গ্রামের অধিবাসী। তাঁহার বল্লালচরিতের শ্লোক হইতে বেশ বুঝা যায় যে, বল্লালসেনের অপর রাজধানী বিক্রমপুর পূর্ব্ববঙ্গে নহে, তাঁহার পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী সুবর্ণগ্রাম।

২। দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের অবস্থান দেখিলে ইহা কতকাংশ বঙ্গের এবং কতকাংশ রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল বলিয়া মনে হয়, প্রাচীন নবদ্বীপ সম্বন্ধেও এইরূপ।

৩। বর্ত্তমান দেবগ্রাম-বিক্রমপুর বাগড়ীর মধ্যে। বলা বাহুল্য, গঙ্গা ও পদ্মার বদ্বীপাংশই বাগড়ী নামে পরিচিত। ইহাপ্রাচীন বঙ্গেরই অন্তর্গত। রাঢ় বা বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত নহে।

৪। দেবগ্রাম-বিক্রমপুরকে আমি কোথাও বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বলি নাই। প্রাচীন তাম্রশাসন আলোচনা করিলে দেখা যায়, গঙ্গার পশ্চিমকূল হইতে বর্দ্ধমান ভুক্তি এবং পূর্ব্বকূল হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি ধরা হইয়াছে। এ অবস্থায় গঙ্গার পূর্ব্বকূলে অবস্থিত দেবগ্রাম-বিক্রমপুর পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত হইতেছে।

৫। দেবগ্রাম সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা পরিষৎ-পত্রিকায় ৩৪-৩৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

৬। দেবগ্রামের দক্ষিণে ও বিক্রমপুরের উত্তরে দম্‌দমা নামক স্থানে, যেখানে সাধারণে বল্লালের ভিটা ও বল্লালের দীঘি দেখাইয়া থাকে, সেই স্থান হইতেই যখন পূর্ব্ব-দক্ষিণমুখে ও পশ্চিম-দক্ষিণমুখে বল্লালসেনের দুইটী জাঙ্গাল বাহির হইয়া গিয়াছে এবং এখানে সকলেই যখন বল্লালের বৃহৎ রাজবাটীর উল্লেখ করিয়া থাকেন, তখন এই স্থানে যে বল্লালসেনের একটী রাজধানী ছিল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এই বল্লালের ভিটার তিন মাইল দক্ষিণে বর্ত্তমান বিক্রমপুরহাট। প্রাচীন গৌড় ও সুবর্ণগ্রাম রাজধানীর আয়তন ৪।৫ ক্রোশ বা ৮।১০ মাইলের অধিক ছিল, প্রাচীন বিক্রমপুরও সেইরূপ ৮।১০ মাইল স্থান ব্যাপিয়া থাকাই সম্ভব। এরূপ স্থলে বল্লালের ভিটা প্রাচীন বিক্রমপুরের মধ্যে ছিল, সন্দেহ নাই।

৭। দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধবালবলভীপতি বিক্রমরাজ রামপালের রাজত্বকালের প্রথমাংশে রাজা ছিলেন। তৎপরে তাঁহার অধিকার যথাক্রমে বর্ম্ম ও সেনবংশের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বর্ম্ম, সেন ও চন্দ্রবংশের তাম্রলেখবর্ণিত বিক্রমপুর অভিন্ন। শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারকারী রাধাগোবিন্দবাবু এই তাম্রশাসনের লিপিকাল আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—"বর্ম্মবংশের পর শ্রীচন্দ্রের অভ্যুদয়।" যেমন কামরূপপতি ভাস্করবর্ম্মা অল্প-কালের জন্য কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিয়া কর্ণসুবর্ণ হইতে তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ চন্দ্রদ্বীপপতি শ্রীচন্দ্র অল্প দিনের জন্য হরিকেল অধিকার করিয়া বিক্রমপুর হইতে শাসন দান করিয়াছিলেন। ই-চিং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে চন্দ্রদ্বীপের রাজসভায় এক বর্ষকাল অবস্থান করেন। তাঁহার বর্ণনায় পাইতেছি যে, হরিকেল চন্দ্রদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত। এ অবস্থায় তৎকালে হরিকেল বা প্রাচীন বঙ্গ পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে গণ্য ছিল না। বরাহমিহির খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গ ও সমতট দুইটী ভিন্ন জনপদ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যতীন্দ্র বাবুও তাঁহার ঢাকার ইতিহাসে লিখিয়াছেন—ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশ ও ফরিদপুর জেলার পূর্ব্বাংশ লইয়াই সমতট (১৭ পৃঃ)। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন অনুসারে ঢাকা জেলার অধিকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ বিক্রমপুর নামে অভিহিত (ঢাকার ইতিহাস, ১৬ পৃঃ)। আবার তিনিই প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঢাকা জেলার উত্তরাংশ বা অধিকাংশ প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপের অন্তর্গত ছিল (৫ পৃঃ)। বঙ্গাধিপ বর্ম্ম ও সেনবংশের অধিকারভুক্ত হইলে পর ঢাকা জেলা বা সমতটপ্রদেশ পূর্ব্ববঙ্গ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। সুতরাং ইচিং, বরাহমিহির ও যতীন্দ্র বাবুর গ্রন্থ হইতেই বুঝিতেছি

যে, এখন যাহাকে পূর্ব্ববঙ্গ বলে, তাহা প্রাচীন সমতট বা প্রাগ্জ্যোতিষের অন্তর্গত ছিল, হরিকেল বা প্রাচীন বঙ্গ উহা হইতে ভিন্ন। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে রাঢ় ও বরেন্দ্র একত্র গৌড় নামে এবং বঙ্গ স্বতন্ত্র উক্ত হইয়াছে। এই তন্ত্র হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, গঙ্গার পূর্ব্বে ও ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাংশেই প্রাচীন বঙ্গদেশ। বর্ত্তমান নদীয়া, যশোহর, খুলনা ও ঢাকার পূর্ব্বদক্ষিণাংশ এবং ফরিদপুরের উত্তরপূর্ব্বাংশ এই বঙ্গের অন্তর্গত। তাই বহু কাল হইতে নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ঢাকা ও ফরিদপুরের অধিবাসী রাঢ়বাসীর নিকট "বাঙ্গাল" বলিয়া পরিচিত। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর বর্ত্তমান নদীয়া জেলার অন্তর্গত, সুতরাং প্রাচীন বঙ্গের মধ্যেই হইতেছে। এ অবস্থায় নদীয়া জেলাস্থ বল্লালসেনের প্রবাদবিজড়িত বিক্রমপুরকে বর্ম্ম ও সেনবংশের বিক্রমপুর বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি কি? এই বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া বল্লালসেনের জাঙ্গাল অদ্যাপি বিদ্যমান।

বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালের প্রথমাংশে যে সকল তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষাংশে প্রদত্ত তাম্রশাসনে ধার্য্যগ্রাম এবং তৎপুত্র কেশব ও বিশ্বরূপের তাম্রশাসনে বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারের পরিবর্ত্তে ফল্গুগ্রাম-জয়স্কন্ধাবারের উল্লেখ আছে। অথচ কেশব ও বিশ্বরূপ উভয়ের তাম্রশাসনেই "বিক্রমপুরভাগ" প্রদেশে ভূমিদানের কথা আছে। সকলেই জানেন, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের নদীয়া-বিজয়ের পর সেনবংশ পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াই আধিপত্য করিতে থাকেন। লক্ষ্মণসেন শেষাংশে এবং কেশব ও বিশ্বরূপ প্রথম হইতেই পূর্ব্ববঙ্গে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার থাকিলে শেষোক্ত সেনরাজগণের তাম্রশাসনে কখনই বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারের পরিবর্ত্তে ফল্গুগ্রাম-জয়স্কন্ধাবারের উল্লেখ থাকিত না। বিশেষতঃ ঢাকার ইতিহাস-লেখক বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে বিক্রমপুর নামে কোন সহর বা গ্রামের অস্তিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

বিজয়সেন ও বল্লালসেনের তাম্রশাসন এবং লক্ষ্মণসেনের সভাস্থ ধোয়ী কবির "পবনদূত" পাঠে মনে হইবে যে, রাঢ়দেশেই সেনবংশের পূর্ব্বলীলাস্থলী; গঙ্গার তীরেই বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল। এ দেশে ব্রাহ্মণ-কুলীনদিগের বিশ্বাস যে, বল্লালসেন তাঁহার বিক্রমপুর রাজধানী হইতেই কুলবিধি প্রচার করেন, তাঁহার কুল-ব্যবস্থায় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র, এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সম্মানিত হইয়াছিলেন। যদি পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বল্লাল কুল-ব্যবস্থা প্রচার করিতেন, তাহা হইলে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রের ন্যায় বঙ্গজ ব্রাহ্মণসমাজেরও একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীর সৃষ্টি হইত। বলা বাহুল্য যে, পাটুলী, বেগে, কাঁটাদীয়া, সাগরদীয়া প্রভৃতি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রধান সমাজস্থানগুলি আলোচ্য বিক্রমপুরের নিকট। ঐ সকল সমাজস্থান কুল-ব্যবস্থার কালে সম্ভবতঃ নদীয়াজেলাস্থ এই বিক্রমপুর-সমাজের অন্তর্গত ছিল। মুসলমান-অধিকারের পর এ অঞ্চল হইতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ববঙ্গের যে অংশে গিয়া বাস করেন, তাহাই পরে 'বিক্রমপুরভাগ' বা বিক্রমপুর পরগণা নামে খ্যাত হইয়া থাকিবে। কেবল ঢাকা

জেলা বলিয়া নহে, এখানকার কতকগুলি লোক সুদূর কাছাড়ে গিয়াও বাস করেন, সেখানেও তাঁহাদের বাস হইতে একটী স্বতন্ত্র 'বিক্রমপুর পরগণার' সৃষ্টি হইয়াছে। যাহা হউক, আজও পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরপরগণার রাঢ়ীয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা পাটুলী প্রভৃতি উক্ত সমাজস্থানের নামেই স্ব স্ব পূর্ব্বপরিচয় দিয়া থাকেন এবং "আদৌ রাঢ়ে ততো বঙ্গে" বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। দেবগ্রামবাসী বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে প্রবাদ শুনিয়াছিলাম যে, বল্লালসেন যখন বিক্রমপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে চলিয়া যান। সেই সময় পুত্রবধূর বিরহব্যঞ্জক শ্লোক পাঠ করিয়া সেই রাত্রিমধ্যে লক্ষ্মণসেনকে আনিবার জন্য রাজা বল্লালসেন কৈবর্ত্তদিগকে আদেশ করেন। কৈবর্ত্তেরা সেই রাত্রিমধ্যে লক্ষ্মণসেনকে বিক্রমপুর রাজধানীতে আনিয়া দিয়াছিল। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বল্লালসেন কৈবর্ত্তদিগের জলচল করিয়া লয়েন। তদবধি গঙ্গাতীরস্থ কৈবর্ত্তগণ জলাচরণীয় হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুর পরগণায় আজও কৈবর্ত্তগণের জল চলে নাই। এ অবস্থায় লক্ষ্মণসেন-ঘটিত প্রবাদের মূলে যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে, তাহা যে এই নদীয়া জেলার বিক্রমপুরেই হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

৮। রামচরিতের প্রাগ্দেশীয় বর্ম্মনৃপতিকে বঙ্গাধিপ ভোজবর্ম্মা বলিয়া কখনই স্বীকার করা যায় না। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা রামাবতীর পূর্ব্বে তৎকালে প্রাগ্জ্যোতিষ রাজ্যই ছিল, সমতট বা বঙ্গ ছিল না। আমার কথার প্রতিবাদসূত্রে যতীন্দ্র বাবু যাহাই বলুন, তিনি তাঁহার ঢাকার ইতিহাসে নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন (ঢা° ই° ৫ পৃঃ)। বলা বাহুল্য, প্রাগ্জ্যোতিষের বর্ম্মনৃপতিই রামচরিতকারের লক্ষ্য। সুতরাং ঢাকা-বিক্রমপুরের মধ্যে বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার ছিল, তাহার উপযুক্ত প্রমাণাভাব। আমি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি, এখানে স্থানাভাবে বিস্তৃত আলোচনায় ক্ষান্ত রহিলাম।*

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

---

* যতীন্দ্র বাবুর যুক্তিগুলির সঙ্গে তুলনা করিয়া আমার যুক্তিগুলি পড়িলে পত্রিকার পাঠকগণের বিষয়টী বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া সংক্ষেপে কেবলমাত্র এই কয়টী কথা প্রকাশ করিলাম।—লেখক।

একখানি সত্যপীরের পুথি*

গ্রন্থারম্ভে আছে—"৺রাধাকৃষ্ণ"। তার পর "সত্যনারায়ণের পুস্তক লিক্ষ্যতে।"

"সত্যনারায়ণ-পদে মজাইয়া চিত।
শ্রীকবিবল্লভ গান মধুর সঙ্গীত ॥"

ইহাতে বুঝা গেল যে, কবি রাধাকৃষ্ণ-ভক্ত ছিলেন। তাঁহার নিজের পরিচয় কিছুই দেন নাই। পিতার নাম, বাড়ী কোথায়, কি জাতি, ইহা গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না।

বার বৎসর পূর্ব্বে ভাগলপুর কলেজের দর্শন-শাস্ত্রাধ্যাপক আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র সিংহ এম্ এ মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থ পাইয়াছিলাম; তিনি মুর্শিদাবাদ জেলায় কোনও গ্রামে উহা পান। আমার পরমবন্ধু সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত মৌলবী আবদুল করিমের সাহায্যে উহার পাঠোদ্ধার করিয়াছি। পুথিখানি পুরাতন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা। ১১৬২ সালের লেখা অর্থাৎ দেড় শত বৎসরের পূর্ব্বে। কিন্তু এখনও এত পরিষ্কার আছে যে, প্রথমে দেখিলে মনে হয় যে, সহজে পড়া যাইবে। কিন্তু যাঁহাদিগের বাঙ্গালা পুরাতন অক্ষর পড়া অভ্যাস নাই, তাঁহাদের উহা পড়া নিতান্ত সুকঠিন।

গ্রন্থখানি পড়িলে বুঝা যায় যে, কবি সংস্কৃত এবং পারসি ভাষা ভাল জানিতেন। গ্রন্থের রচনা-চাতুর্য্য ও কবিত্ব-শক্তিও যথেষ্ট আছে। মানুষের মনের দুর্ব্বলতা, দ্বেষ, হিংসা—আবার উচ্চ ভাব, ভ্রাতৃপ্রেম ইত্যাদি বর্ণনায় কবি কারিকুরি দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, সত্যনারায়ণ নাম দিয়া কবি সত্যপীরের পুথি লিখিয়াছেন।

আখ্যান

ইহার আখ্যানাংশ প্রায় অন্য সত্যপীরের পুথির ন্যায়। প্রায় বলিলাম এই জন্য যে, ইহাতে কিছু বিশেষত্ব আছে। সদানন্দ ও বিনোদ সদাগর রাজাজ্ঞায় বাণিজ্য করিতে গেলেন। যাইবার সময় ছোট ভাই মদনকে তাঁহাদের স্ত্রী সুমতি ও কুমতির হাতে দিয়া গেলেন। যাইবার সময় নদীতে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন। শ্রীমন্ত দেখিয়াছিলেন কমলে কামিনী, ইঁহারা দেখিলেন ;—

সদাগরে বিড়ম্বনা করেন খোদায়।
পাথরের গৌর এক ভাষায় দরিয়ায় ॥
নিত্য করে নিত্যকী কীরে গিত গায়।
দরিয়ার বিচেতে অপূর্ব্ব শোভা পায় ॥

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১শ, ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

মৃগছাল পাণির উপরে ডাল্যা দিয়া।
চারি ফকির নিমাজ করে পশ্চিম মুখ হয়্যা ॥

সদাগরেরা যে দেশে গেলেন, সে দেশের রাজাকে ঐ সংবাদ দিলে, তাঁহার লোক-জনকে ঐ দৃশ্য দেখাইতে না পারায় সনাতন প্রথাক্রমে কারাবদ্ধ হইলেন।

এ দিকে সুমতি কুমতি এক তান্ত্রিকের হাতে পড়িয়া তন্ত্রমতে যোগ শিক্ষা আরম্ভ করিল এবং অল্প দিনের মধ্যে এমন সিদ্ধি লাভ করিল যে, গাছে চড়িয়া যেখানে সেখানে যাইতে পারিত। মদন বালক হইলেও তাহাদের এই কুক্রিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া দেখিত। এক দেশে এক রাজার মেয়ের খুব ধুমধামে বিবাহ হইতেছিল। সে সদাগরদিগের দেশ হইতে অনেক দূরে। সুমতি কুমতি পরামর্শ করিল, গাছে চড়িয়া সেই দেশে যাইয়া রাজকন্যার স্বয়ম্বর দেখিবে। পরামর্শ মদনও শুনিল। যে গাছে চড়িয়া যাইবে, তাহাতে একটি কোটর ছিল। সে তাহাতে লুকাইয়া রহিল। যথাসময়ে সেখানে পৌছিয়া পীরের কৃপায় মদনকে সেই রাজকন্যা বিবাহ করিল। অত দূর-দেশ হইতে মদন হাঁটিয়া আসিতে পারিবে না; সুতরাং রাত্রিশেষে রাজকন্যাকে ত্যাগ করিয়া গাছের কোটরে লুকাইয়া থাকিল। মদন, সুমতি ও কুমতি বাড়ী ফিরিল। কিন্তু যে রাজকন্যার বিবাহ হইল, সে দেশে প্রাতঃকালে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অপর দেশের রাজপুত্রগণ প্রত্যেকে বলিতে লাগিলেন যে, তিনি রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু ধোপে টিকিল না, রাজকন্যার পরীক্ষায় কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। তাঁহারা সকলে আপন আপন দেশে ফিরিয়া গেলেন। রাজকন্যা পিতার সাহায্যে ডিঙ্গা সাজাইয়া আপন পতির অনুসন্ধানে বাহির হইলেন এবং পীরের কৃপায় স্বামী পাইলেন। এখন মুসলমান পীর ও তন্ত্র-মতের ঘোর যুদ্ধ। যখন সুমতি কুমতি দেখিলেন যে, তাঁহাদের কুক্রিয়া সমস্তই মদন অবগত আছে, তখন তাঁহাদের ভয় হইল এবং মদন-কণ্টককে পথ হইতে সরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমে বিষ প্রয়োগের চেষ্টা হইল, তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া তন্ত্রমতে মন্ত্রৌষধির দ্বারা তাঁহাকে পাখী করিয়া উড়াইয়া দিল। ও দিকে পীরের কৃপায় সদানন্দ ও বিনোদ কারামুক্ত হইল এবং রাজা তাহাদিগকে সাত ডিঙ্গা ধন-রত্ন দিলেন। বাড়ী যাইবার সময় সুমতি কুমতি যে অলঙ্কার চাহিয়াছিলেন, তাহা খরিদ করিলেন এবং মনে পড়িল যে, ভাই মদন একটি সাচান পক্ষী চাহিয়াছিল। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া একটি সাচান পক্ষী সংগ্রহ করা হইল। তাঁহারা বাড়ী আসিয়া শুনিলেন, মদন মরিয়া গিয়াছে। তাহার পর মদনের স্ত্রী পীরের কৃপায় পীরের সিন্নি দিলেন। সিন্নির সরঞ্জাম সামান্য।

খোদায় বলেন জদি কিছু নাই ঘরে।
সওয়া মুঠি খুদ আনি দেওনা আমারে ॥
সওয়া মুঠি খুদ দিয়া পুর মনোরথ।
সদা মোর খুদে তুষ্ট গোবিন্দ জেমত ॥

একিদা করিয়া তুমি খুদ দেহ মোরে।
মনের বাঞ্ছিত বর দিব গো তোমারে॥
সওয়া মুঠি খুদ আনি রাজার নন্দিনী।
একিদায় করে সত্যপীরের সিরিনি॥

তার পর সন্ধ্যাকালে হিন্দু-মুসলমান সকলে উপস্থিত হইলেন। নয়া হাঁড়িতে পুরিয়া সিন্নির মিঠাই রাখা হইল। পীরের কলমা পড়িলে সকলে উঠিয়া সেলাম করিলেন। তখন সকলকে সিন্নি বাটিয়া দেওয়া হইল।

"চাটিয়া খাইল হাত মুছিল শিরে"

আবার সিন্নির এত মহিমা যে,—

ভরমে সিরনি যদি জমিনে গিরিবে।
চাটিয়া খাইলে সে নিয়ত হাসিল হবে॥

অপর এক দিন, সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের পূজা এক কি না এবং ইহার সহিত আকবর বাদশার কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, লিখিব। সত্যনারায়ণের পূজা বাঙ্গালা দেশে এক সময় এত প্রচার হইয়াছিল যে, প্রত্যেক গ্রামে সংক্রান্তি ও পূর্ণিমার দিন কাহারও না কাহারও বাড়ীতে এই পূজা হইত। এখন কোনও পূজাই হয় না; সুতরাং সত্যনারায়ণও বাদ পড়িয়াছেন। বেহার, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, মধ্যভারত, এমন কি, বোম্বাই অঞ্চলে এখনও এই পূজার যথেষ্ট আদর আছে।

শ্রীরঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী

———

চণ্ডীদাসের পদাবলী

"বীরভূমবাসি"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয় এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইহাতে বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এত নূতন পদ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত আর কোন সংগ্রহে নাই। বিদ্যাপতি মৈথিল কবি, কিন্তু চণ্ডীদাস খাঁটী বাঙ্গালী কবি। এত দিন পরে সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় নীলরতন বাবুর যত্ন-সঞ্চিত কবি চণ্ডীদাসের আট শতাধিক পদাবলী একত্র প্রকাশিত হইল। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা-মাধুর্য্য-রসলোলুপ ভক্তজন পরিষদের প্রকাশিত সহস্রাধিক পদাবলী-পরিপূর্ণ বিদ্যাপতির পদাবলী পাইয়া যেমন তৃপ্ত ও কৃতার্থ হইয়াছেন, এই নবপ্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও তদ্রূপ পরিতৃপ্ত হইবেন। মূল্য—সদস্য পক্ষে ২৲, শাখা-পরিষদের সদস্য পক্ষে ২॥০, সাধারণ পক্ষে—৩৲।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-প্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব) বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ।৷৵০ দশ আনা মাত্র।

উল্লিখিত তিনখানি গ্রন্থের প্রকাশক—**শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঘোষ**

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—**এস্ কে লাহড়ী এণ্ড কোং**, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (বঙ্গানুবাদ)

টীকা ও পরিশিষ্ট সমেত শারদীয়া পূজা পর্য্যন্ত সাধারণের পক্ষে—৩৲, সদস্য পক্ষে—২৷০, মূল্যের বিশেষ বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

প্রকাশক—**বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ**।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। মূল্য ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—**গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্** ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪১ খানি চিত্র এবং ৫ খানি প্রাচীন ও নবীন ম্যাপ-সম্বলিত

(রেণেলের ৩ খানি ম্যাপ সমেত)

ঢাকার ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়-প্রণীত

৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ

মূল্য—উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ৩৷৷০ টাকা মাত্র।

মাননীয় ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক এই গ্রন্থখানি ঢাকা, রাজসাহী এবং চট্টগ্রাম-বিভাগের কলেজ এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালা স্কুল-সমূহের প্রাইজ ও লাইব্রেরীর পুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। (Vide Calcutta Gazette, dated the 27th August, 1918)

Mahamahopadhyay Hara Prasad Shastri M. A., C. I. E.,— * * * "Is an exceedingly interesting work, * * * deserves encouragement from all Bengalis interested in History." * * *

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ,—* * * "গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, দ্বাবিংশ অধ্যায় * * * বঙ্গবাসী মাত্রেরই পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ,—"এইরূপ গ্রন্থের প্রচার ও আদর দেখিলে আমি কতকটা স্পর্দ্ধিত হইব যে, আমার জীবন-স্বপ্ন অন্ততঃ আংশিক সফলতা লাভ করিয়াছে" * * *।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ,—"এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে * * * ঢাকার ইতিহাসকে অনেক বিষয়ে আদর্শস্থানে স্থাপিত করা যাইতে পারে" * * *।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু—"পূর্ব্ববঙ্গের যতগুলি ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, আপনার গ্রন্থখানি তন্মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে—এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি" * * *।

প্রাপ্তিস্থান:—গুরুদাস লাইব্রেরী, আশুতোষ লাইব্রেরী, মজুমদার লাইব্রেরি, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, অতুল লাইব্রেরী প্রভৃতি কলিকাতা ও ঢাকার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলী

পত্রিকার মলাটে তৃতীয় পৃষ্ঠায় মুদ্রিত পুস্তকাবলীর তালিকা ব্যতীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলিও সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

১। **কবি হেমচন্দ্র (সচিত্র)**—বঙ্গের সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় কৃত কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের সমালোচনা। প্রবীণ ও প্রাচীন সমালোচকের এই নূতন গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে পরম আগ্রহে গৃহীত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ৮৩, কাপড়ের মলাটে বাঁধাই, মূল্য ৷৵০ দশ আনা।

২। **বিদ্যাপতির পদাবলী**—সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। এই গ্রন্থ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের ব্যয়ে ও নগেন্দ্র বাবুর সম্পাদকতায় পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধে কবির জীবনী, কালনির্ণয়, পাঠনির্ণয়, পদনির্ব্বাচন আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ের বহু গবেষণার মীমাংসা আছে। এতদ্ভিন্ন রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ৮৪০টি পদ, হরগৌরী-বিষয়ক ৪৪টি পদ, গঙ্গাবিষয়ক ৩টি পদ, নানাবিষয়ক প্রহেলিকার ২০টি পদ ইহাতে আছে। পত্রাঙ্ক ৫৫২ ; মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা। পরিষদের সদস্যপক্ষে ৪৲ চারি টাকা।

৩। **গৌরপদতরঙ্গিণী**—সম্পাদক পণ্ডিত জগবন্ধু ভদ্র—এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এ সকল পদ বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্ত্তৃগণের রচিত। অনেক পদ নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ১৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী

হৎ ভূমিকায় ঐ সকল পদকর্ত্তাদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ ভূমিকায় বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থসহ নির্ঘণ্ট আছে। পত্রাঙ্ক ৫৬৮, মূল্য ২৲ দুই টাকা, কিছু দিনের জন্য সকলকেই ১৲ টাকা মূল্যে দেওয়া হইবে।

৪। **পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী**—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত। মূল্য ।৶৹ আনা। সদস্যগণের পক্ষে ।৹ (চারি) আনা।

৫। **মায়াপুরী**—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ-প্রণীত। মূল্য ।৹ চারি আনা, সদস্যপক্ষে ৶৹ দুই আনা।

৬। **বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা (৩য় খণ্ড)**—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস রায় বাহাদুর সি আই ই কর্ত্তৃক অনূদিত। মূল্য পরিষদের সদস্যগণের পক্ষে ॥৹ আনা ও সাধারণের পক্ষে ১৲ টাকা।

৭। **সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুম**—স্বর্গীয় কৃষ্ণানন্দ ব্যাস-সংগৃহীত। ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রালোচনা ও নানা প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত নানা সুরের প্রাচীন গান-সংগ্রহ। আকার বৃহৎ, ডিমাই ৪ পেজী, ৭০৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৫৲ টাকা।

৮। **প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ১ম ও ২য় ভাগ**—শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল করিম সঙ্কলিত। মূল্য সদস্যপক্ষে যথাক্রমে ।৴৹ পাঁচ আনা ও ।৹ চারি আনা মাত্র। সাধারণ-পক্ষে ॥৶৹ আনা ও ॥৹ আনা।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির মুদ্রাঙ্কণ প্রায় শেষ হইল, শীঘ্রই বাহির হইবে।

৯। **সত্যনারায়ণের পুঁথি**—(শ্রীকবিবল্লভ-প্রণীত)—শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল-করিম সম্পাদিত।

১০। **বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা, ৪র্থ খণ্ড।**

প্রাচীনপুথি ক্রয়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত ও মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ চণ্ডীর প্রাচীন পুথি ক্রয় করিবেন। যাঁহাদের ঘরে ২৫০ বৎসর বা তদূর্দ্ধকালের প্রাচীন ঐ সকল পুথি আছে, তাঁহারা পুথির সন-তারিখ, পুথি-লেখকের নাম-ঠিকানা এবং পুথির পাতার পরিমাণ জানাইলে, পরিষৎ উহা উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করিবেন। সত্বর নিম্নোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখুন। তবে যাঁহারা পুথি-বিক্রয় পাপবোধে, পুথিদান পুণ্যবোধে, মাতৃভাষার প্রতি কর্ত্তব্যবোধে ঐরূপ পুথি বা অন্যান্য পুথি পরিষৎকে বিনামূল্যে দান করিতে চাহিবেন, তাঁহাদের নাম ও দান পরিষদের মাসিক সভায় এবং সংবাদপত্রে কৃতজ্ঞতাসহকারে বিঘোষিত হইবে।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

৭। যাঁহারা চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি ও সংযম করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের অবশ্যপাঠ্য "মার্গত্রয়" ও "পরলোক" আদির গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীযুক্ত মাখনলাল রায় চৌধুরী প্রণীত—"চিন্তবল, ইহার সংযম ও সংস্কার (Mrs. Besant'sThoughtPower its Control and Culture.)

৮। "পাগলের প্রলাপ," "স্তুতি কুসুমাঞ্জলি" ইত্যাদি পুস্তকের রচয়িতা ভাবুক কবি শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, গভীর উপাদেয় পত্ত-গত্ত—"প্রাণের কথা"।

এতদ্ব্যতিরিক্ত ইহাতে দার্শনিক শ্রীযুক্ত আচার্য্য ডাক্তার পি, কে, রায় ডি এস্ সি, পি এচ্ ডি, শ্রীযুক্ত বাবু খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ, পণ্ডিত প্রবর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, দর্শনাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথ মোহন বসু, এম এ, পণ্ডিত প্রসন্ন কুমার বেদান্ততীর্থ, বিদ্যালঙ্কার, কাব্যতীর্থ, বেদান্তভূষণ বিদ্যাবিনোদ, সাংখ্যরত্ন, শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম এ, বি এল, পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ ইত্যাদি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, ভাবুক ও দার্শনিকগণ ইহাতে লিখিতেছেন।

এহেন নূতন ধরণের উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা তিন বৎসর যাবৎ নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার আকার রয়েল ৮ পেজি সাইজের এন্টিক কাগজে পরিপাটীরূপে মুদ্রিত হইয়া থাকে। ইহার কাগজ, মুদ্রণ প্রভৃতির ব্যয় হিসাব করিলে ইহার অগ্রিক বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ২॥০ আড়াই টাকা অতীব সুলভ বোধ হইবে। কারণ, পত্রিকা প্রতিমাসে পাঠাইবার ডাকমাশুল ৵১০ অর্থাৎ বৎসরে ।৶০ ছয় আনা আমাদিগকে দিতে হয়; সুতরাং মূল্যস্বরূপ মাত্র ২৶০ আমরা বাস্তবিক প্রাপ্ত হইব। ইহার উপর আমরা আরও সুলভে আগামী বৎসরে পত্রিকা প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি।—

যে সকল পুরাতন বা নূতন গ্রাহক আগামী ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন, তাঁহারা ডাকমাসুল সমেত মোট ২৲ দুই টাকা অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ মূল্যেই পাইবেন। অধিকন্তু নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে পাইতে পারিবেন। কিন্তু যাঁহারা আষাঢ় বা তৎপরে যে কোন মাসে মূল্য দিবেন, তাঁহারা আর উক্ত মূল্যে পাইবেন না; তাঁহাদিগকে ২॥০ আড়াই টাকা দিতে হইবে।

যাঁহারা বর্ত্তমান বৎসরের অর্থাৎ তৃতীয় বর্ষের সমস্ত "ব্রহ্মবিদ্যা" লইতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারাও উক্ত আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত ২৲ দুই টাকা মূল্যে পাইবেন। তৎপরে ২॥০ আড়াই টাকা তাঁহাদিগকে দিতে হইবে।

শ্রীবাণীনাথ নন্দী—কার্য্যাধ্যক্ষ।

১৩২২ সালের ব্রহ্মবিদ্যার গ্রাহকগণকে

উপহার! উপহার!! উপহার!!!

এরূপ সুন্দর ও সুলভ এবং চিন্তাশীল প্রবন্ধপূর্ণ মাসিক পত্রিকার প্রত্যেক নূতন গ্রাহককে অর্থাৎ যাঁহারা ১৩২২ সালের বা ব্রহ্মবিদ্যার ৪র্থ বর্ষের গ্রাহক হইবেন, তাঁহাদিগকে এখন হইতে আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি অবধি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অল্প মূল্য প্রদান করা হইবে। যে সমস্ত নূতন গ্রাহক বা ব্রহ্মবিদ্যার ৪র্থ বর্ষের বা ১৩২২ সালের গ্রাহক পত্রিকার ৪র্থ বর্ষের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা এক্ষণ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির মধ্যে আমাদিগকে পাঠাইয়া দিবেন, তাঁহাদিগকে নিম্ন তালিকাভুক্ত পুস্তকগুলি নিম্ন নির্দ্ধারিত অল্প মূল্যে দেওয়া যাইবে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে, ব্রহ্মবিদ্যার ৪র্থ বর্ষের মূল্য ২৲ দুই টাকা অভিপ্রেত পুস্তকগুলির মূল্য এবং সেগুলি পাঠাইবার ডাকমাশুল ও ভি, পি কমিশন সমস্ত যোগ করিয়া ভি, পি পাঠাইতেও আদেশ করিতে পারেন। ব্রহ্মবিদ্যার ৪র্থ বর্ষের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা, পূর্ব্বে না পাঠাইলে কেহই উপহার পুস্তক পাইবেন না।

পত্র লিখিবার ঠিকানা :—দি হোয়াইট লোটাস্ পাব্লিসিং কোং—৪।৩A কলেজ স্কোয়ার, বহুবাজার পোষ্ট, কলিকাতা।

সুলভ মূল্যে উপহার দিবার

পুস্তকের তালিকা—

১। প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র (বৌদ্ধ ধর্ম্মের অদ্বিতীয় গ্রন্থের অন্বয়মুখী টীকা, টীপ্পনী ও প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ)—১৲ স্থলে ৸৹ আনা।

"...So that this book will also help the real seekers of the narrow path, not only in their personal attempt at spiritual growth but far more, by giving them a handy manual which can with cofidence he passed on others who are of religious temperament but who have not yet grasped the true ideals of spiritual life.—Amrita Bazar Patrika.

(২)। "শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বাবু আমাদের দেশের শিক্ষিতবৃন্দের একটি চিন্তাস্রোতঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন"—মহামহোপাধ্যায় প্রমথ নাথ তর্কভূষণ।

(৩)। "......বহু তথ্যের সমাবেশ থাকিলেও, উহা এমন সুপাঠ্য হইয়াছে যে, পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না।......"—উদ্বোধন।

(৪)।..."হিন্দু বৌদ্ধ মহামিলনের সূত্র তিনি প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সূত্রিত করিয়াছেন। এই ধর্ম্ম বিপ্লব কালে এইরূপ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের আবির্ভাব গৌরবের বিষয়।..." ——আর্য্য-দর্পণ।

(৫)। "এতাদৃশ গ্রন্থ প্রচার দ্বারা ঐ পথ (হিন্দুধর্ম্মের ও বৌদ্ধধর্ম্মের মিলনের) পরিষ্কৃত হইতেছে—সুতরাং এ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সুদৃঢ় ভবিষ্যতে শুভদায়ক।...*..."হিন্দুপত্রিকা।

২। মার্গত্রয় বা কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-মার্গ। মূল্য ৷৶৹ স্থলে ।১৹ আনা।

শ্রীমতী আনি বেসান্তের পুস্তক (Mrs. Annie Besant's Three Paths অবলম্বনে লিখিত।

"...জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি সম্বন্ধে "মার্গত্রয়" একখানি উপাদের গ্রন্থ হইয়াছে।"

"...The Language used by the author is dilightfully simple, while his arguments bear the stamp of shastric authority."—The Hindu Patriot.

"...bear unquestionable testimony to the intensity of the writer's religious feelings"—Indian Mirror.

৩। শিক্ষা না সেবা।—(শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল কৃত)—।৶০ স্থলে ।১০

(শ্রীযুক্ত জে কৃষ্ণমূর্ত্তি কৃত বিখ্যাত Education as Service পুস্তকের অনুবাদ)।

"...Babu Hirendranath Dutt has done a distinctive service to the cause of education by bringing out this translation ..."—The Indian Mirror.

"...Babu Hirendranath Dutt...deserves the thanks of all interested in the education of the children of this country"—The Hindu Patriot.

"যাঁহারা বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর সংস্কার বা পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন, আমরা তাঁহাদিগকে এই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।"—হিতবাদী।

৪। সাংখ্যকারিকা।—৪৸০ স্থলে ১৷০।

মূল ভাষ্য, টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ এবং কোলব্রুক সাহেবকৃত ইংরাজী অনুবাদ ও উইলসন্ সাহেবকৃত গৌড়পাদ ভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

৫। উপনিষদ্—

মূল, ব্যাখ্যা, টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ সিদ্ধান্ত বাচস্পতি ৺শ্যামলাল গোস্বামি-সম্পাদিত।

টীকাখানি শাঙ্করভাষ্য, দক্ষিণদেশীয় শ্রীযুক্ত রাঘবেন্দ্র যতি বিরচিত ভাষ্য, উপনিষৎ খণ্ডার্থ ও পূজ্যপাদ শ্রীল জীবগোস্বামী কৃত ষট্‌সন্দর্ভ ও সর্ব্বসম্বাদিনী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। জ্ঞানী—ভক্ত যে ভাবে উপনিষদ দেখেন ইহা সেই ভাবে রচিত। ইহাই ইহার বিশেষত্ব।

ঈশ, কেন, কঠ (॥০); প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য (॥০); ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর(৸০); কৌষিতকী (॥০)—এই দশখানির উপনিষদ্ একত্রে লইলে—২৷০ স্থলে ১৸০।

৬। আধ্যাত্মিক গ্রন্থাবলী—

(ক) সদ্‌গুরু ও শিষ্য ৶০

(খ) প্রকৃত দীক্ষা ৶০

(গ) প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা ।৴০

(শ্রীমতী আনি বেসান্ত (Mrs. Annie Besant) লিখিত "Reality of the Unseen" অবলম্বনে রচিত।)

(ঘ) ধর্ম্মজীবন ও ভক্তি ৵০

(শ্রীমতী আনি বেসান্তের Devotion and Spiritual Life" পুস্তকের অনুবাদ)

(ঙ) শোক কেন ভাই? ৵০

(শ্রীযুক্ত লেড বিটার সাহেব কৃত শোকার্ত্তের শান্তিস্থাপন উদ্দেশে 'To Those Who mourn পুস্তক অবলম্বনে লিখিত।)

এই পাঁচখানি একত্রে লইলে ৸৶০ স্থলে ৷৵০ আনা।

দি হোয়াইট্ লোটাস্ পাবলিসিং কোং,

৪।৩ কলেজ স্কোয়ার, বহুবাজার পোষ্ট, কলিকাতা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

দ্বাবিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি

কলিকাতা

২৪৩।১নং অপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২২

গ্রাহক পক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] [মফস্বলে ৩।৵০ তিন টাকা ছয় আনা।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸০ বার আনা।

দ্বাবিংশ ভাগের সূচী

শোক-সংবাদ

বিগত ১৯শে চৈত্র শনিবার প্রাতঃকালে ৫টার সময় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় ৪৭ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই নিদারুণ ঘটনায় আমরা যে কি প্রকার মর্ম্মাহত হইয়াছি, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। ৺ব্যোমকেশ বাবুর ন্যায় পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক আর ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি সাংসারিক নানা জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া এবং নিজের সর্ব্ববিধ কাজের প্রতি উপেক্ষা করিয়া পরিষদের জন্য একাগ্রচিত্তে যে ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত খাটিয়াছেন, তাহা সকলেরই সুপরিচিত। পরিষৎ স্থাপনা অবধি পরিষদের প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার অধ্যবসায়, তাঁহার আন্তরিক যত্ন এবং তাঁহার কার্য্য-কুশলতার ফল সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। পরিষদের পূজায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; পরিষৎকেই তিনি প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ দেখিতেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বর্ত্তমানে যে উন্নত অবস্থায় পদার্পণ করিয়াছেন, ইহার অধিকাংশই তাঁহার অবিশ্রান্ত উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। নানা শাখা-প্রশাখা-সম্বলিত হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে আজ একটি প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়াছেন, তাহার মূল কারণ ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় এবং তাঁহার ন্যায় কতিপয় মহাশয়ের অসাধারণ একাগ্রতা ও একনিষ্ঠ সেবা। এই একনিষ্ঠ মিত্রকে হারাইয়া পরিষৎ নিতান্ত দীন হইয়াছেন, সন্দেহ মাত্র নাই; বিশেষতঃ যাঁহারা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও যাঁহারা ইহার শৈশবে ইহার পুষ্টি সাধনের জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এখনও জীবিত আছেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বাবুর মৃত্যু অতীব শোকাবহ ঘটনা। নিজের সাংসারিক কাজ, এমন কি, নিজের জীবনকেও তুচ্ছ করিয়া ৺ব্যোমকেশ বাবু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতি যে প্রকার একনিষ্ঠ সেবার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। তিনি বহু দিন রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যু-শয্যাতেও পরিষদের বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয় ভাবিতেন না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যত দিন থাকিবে, তত দিন উহার সহিত ৺ব্যোমকেশ বাবুর স্মৃতি অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত থাকিবে, এই কথা বলাই বাহুল্য। বর্ত্তমান সময়ে ৺ব্যোমকেশ বাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারের কথা মনে হইয়া আমাদের মনে আরও অশান্তি উপস্থিত হইতেছে। ৺ব্যোমকেশ বাবু তাঁহার জীবিত সময়ে নিজের স্বার্থের দিকে আদৌ দৃক্‌পাত করেন নাই; পরিষদের জন্যই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ মূল্যবান্ সময় ক্ষেপণ করিয়াছেন। এখন আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য হইতেছে যে, তাঁহার দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাংসারিক ক্লেশাপনোদন জন্য আমরা যত্নবান্ হই। তিনি পরিষদের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এখন আমাদের উচিত যে, তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য আমরা পালন করি। ভরসা করি, পরিষদের সদস্য সকলেই এ বিষয়ে আমাদের সহিত একমত হইবেন। পরিশেষে আমরা শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার আত্মার চির-শান্তি প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সম্পাদক।

আসামে শ্রীচৈতন্য *

প্রাচীন কামরূপ তন্ত্রশাস্ত্রের জন্মভূমি বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। এক দিন এই দেশ তান্ত্রিক উপাসনার কেন্দ্রস্থল ছিল। এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াই তন্ত্রশাস্ত্র সমগ্র ভারতবর্ষ, তিব্বত, চীন এবং জাপান দেশ পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এবং তন্ত্রোক্ত সর্ব্বপ্রধান মহাপীঠ ৺কামাখ্যার অবস্থিতিও এই দেশেই; কিন্তু তাহা হইলেও আজ যে এই দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই দেশের অধিবাসিগণের বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বন সম্বন্ধে একটি রহস্যজনক প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রবাদটি এই যে, একদা বিষ্ণু গরুড়-বাহনে ৺কামাখ্যা পীঠের উপর দিয়া আকাশপথে চলিয়া যাইতেছিলেন। ৺কামাখ্যার অনুচর বটুকভৈরবের তাহা সহ্য হইল না; তিনি বিষ্ণুকে গরুড়ের স্কন্ধ হইতে অবতরণ করাইয়া পীঠ-লঙ্ঘন-স্পর্দ্ধার প্রতিশোধস্বরূপ বন্দী করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অনুচর কর্ত্তৃক বিষ্ণু এইরূপ লাঞ্ছিত হইবার কথা শ্রবণ করিয়া, কামাখ্যা ঠাকুরাণী শশব্যস্তে আসিয়া নিজ হস্তে বিষ্ণুর বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন এবং বটুকভৈরবকেও তাহার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনেক গঞ্জনা করিলেন। বিষ্ণু কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, কামাখ্যাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে, এই দেশবাসী লোকগণ কামাখ্যার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর উপাসক হইবে। কামাখ্যা বিষ্ণুর অভিসম্পাত শুনিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং বলিলেন,—আমার অনুচরের দোষে আমাকে অভিসম্পাত করা আপনার উচিত হয় নাই। সে যাহা হউক, আমিও বলিলাম, এ দেশবাসীরা বৈষ্ণবমার্গ অবলম্বন করিলেও চিরকালই মৎস্য-মাংসাশী হইয়া শাক্তাচার-পরায়ণ থাকিবে। এই দেশবাসী: বৈষ্ণবেরা অনেকেই যে মৎস্য-মাংস আহার করিয়া থাকেন, তাহা ঠিক। এই প্রবাদের ভিত্তি যাহাই হউক না কেন, তন্ত্রপ্রধান প্রদেশে বৈষ্ণব-প্রাধান্যকে লক্ষ্য করিয়াই যে এই প্রবাদ সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এই দেশের বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীরা কয়েকটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যথা,—দামোদরী, মহাপুরুষীয়া, হরিদেবী এবং চৈতন্যপন্থী। প্রথম তিন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকেরা এই দেশবাসী লোক ছিলেন। এই দেশে চৈতন্যপন্থীরা কখন কিরূপে আসিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিতে গিয়া জানিতে পারিলাম যে, কামরূপ বিভাগে হাজো অঞ্চলে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আসিয়াছিলেন বলিয়া এক জনশ্রুতি বহু কাল হইতে প্রচলিত আছে। হাজোতে মণিকূট নামক একটি ছোট পাহাড় আছে এবং তাহার শিখরদেশে হয়গ্রীব মাধবের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৌহাটী-শাখার অধিবেশনে পঠিত।

আছে। এই পাহাড়ের পাদদেশে একটি গহ্বর আছে এবং তাহার সন্নিকটে বরাহকুণ্ডের অবস্থিতি। এই গহ্বরটিকে লোকে "চৈতন্যঘোপা" বলিয়া থাকে এবং চৈতন্যদেব কিয়ৎ-কাল এই গহ্বরে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যেখানে চৈতন্যদেব বসিয়াছিলেন এবং যে স্থানে তিনি দণ্ড-কমণ্ডলু রাখিয়াছিলেন, তাহাও সেখানকার লোকেরা আজ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ইহা একটি জনশ্রুতি মাত্র। হাজো অঞ্চলের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার এই জনশ্রুতি জানা থাকিলেও, কেবল এক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই কোনও ঐতিহাসিক তথ্যে উপনীত হওয়া যায় না। এই জনশ্রুতি আমার বহু কাল হইতে জানা থাকিলেও এত দিন আমি তাহাতে কোন আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই; বরং চৈতন্যদেব সম্বন্ধে যে সব পুস্তক বঙ্গদেশে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে চৈতন্যদেবের কামরূপ আগমন সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ দেখিতে না পাইয়া, এই জনশ্রুতির সত্যতা সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহই উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু অল্প দিন হইল, শ্রীযুক্ত লম্বদুরাম চৌধুরী মহাশয় "সৎসম্প্রদায় কথা" নামক এক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই পুস্তিকাতে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে যে, শ্রীচৈতন্য-দেব যে কেবল হয়গ্রীব মাধব পর্য্যন্তই আসিয়াছিলেন, তাহা নহে, তিনি পরশুরামকুণ্ড পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। পরশুরামকুণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া, তিনি আরও কতক দিন হাজোর ঘোপাতে থাকিয়া উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সম্বন্ধে ভট্টদেব তাঁহার বিরচিত "সৎসম্প্রদায়কথা"তে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"পাচে মহাপ্রভু তৈরপরা আসি করতিয়ার তীরে রহিলা। পাচে যেথন রাজা নরনারায়ণ হই উপর দেশর পরা অনেক লোকক নমাই আনি শঙ্করক গোমোস্তা পাতি রাজ্য বসাইবে দিছে মাত্র, তেথনে চৈতন্যভারতী প্রভু মাধব দর্শনে মণিকূটে আসিলা। বরাহকুণ্ডর উপরে গোঁফাত রহি মাধব দর্শন হৈল। পাচে রত্নেশ্বর বিপ্রক শরণ লগাই ভাগবত পঢ়াই রত্নপাঠক নাম দি মাধবর দ্বারত ভাগবত পঢ়িবে দিলা আরু যাত্রা মহোৎসব সঙ্কীর্ত্তন কর্ম্মকো মাধবর দ্বারত প্রবর্ত্তাইলা। পাচে মহাপ্রভু পরশুকুঠারে যাই নামর নির্ণয় লেখি ব্রহ্মকুণ্ডত স্নান করি উলটি আসি সেই গোফাঁতে রহিলা। পাচে মাণ্ডরীর কণ্ঠভূষণক আরু কবিশেখরক, কণ্ঠহার কন্দলীক শরণ লগাই ভাগবত পঢ়াইলা। পাচে হাতে বীণা ধরি কৃষ্ণনাম গাই নারদর শ্রেষ্ঠা দেখাইলা। সেই বেলা দামোদরে মাধব দেখিতে মণিকূটে যাই তাক দেখি দুর্ল্লভ লাভ ভৈলা বুলি প্রণাম করি বোলে—হে মহাপ্রভু, মঞি দরিদ্র ব্রাহ্মণে কিছো আশীষ মাগোঁ। চৈতন্যে বোলে—কেন মতে তুমি দরিদ্র ভৈলা। দামোদরে বোলে—স্বদেশর পরা নামি আহন্তে তাঁতীমরাত নৌকা বুরি সর্ব্বস্ব উটিল। তিনটি প্রাণী ঝাঁজিত ধরি দিগম্বরে তরিলোঁ। পাচে শঙ্করে বস্ত্র তিনিখানি পরিধান করাই নিকটে রাখিছে। পাচে চৈতন্যে বোলে,—হে দামোদর নশ্বর বস্তুত খেদ নকরা। তুমি ঈশ্বরর পার্ষদ। লক্ষ্মীর কোপে গৌতমর বংশত জন্মিছা। পুনু তান বরে তিনি পীঠত পূজ্য হুই নিজ ঐশ্বর্য্যকে পাইবা। এই রহস্য কহি তাক তত্ত্বজ্ঞান দি উড়েষাক গৈলা।" সৎসম্প্র-দায়কথা—৩০ পৃষ্ঠা।

সৎসম্প্রদায়কথা পুস্তক হইতে উদ্ধৃত এই অংশে তিনটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। প্রথম চৈতন্যদেব যখন কামরূপে আগমন করেন, তখন শিববংশীয় মহারাজ নরনারায়ণ সবে মাত্র রাজপাটে বসিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, তিনি হাজোর মাধব-দেবালয়ে কিয়ৎ-কাল বাস করিয়াছিলেন এবং সেখানে তাঁহার সহিত দেবদামোদরের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। তৃতীয়, তিনি পরশুরামকুণ্ড পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। এই বিষয় তিনটির ঐতি-হাসিক ভিত্তি সম্বন্ধে আমরা এখন আলোচনা করিব।

নরনারায়ণ রাজার রাজত্ব-কাল সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। মিষ্টার গেইট তাঁহার Koch kings of Kamrup প্রবন্ধে* নরনারায়ণের রাজত্বকাল ১৫৩৪-১৫৮৪ স্থির করিয়াছেন। তিনি ঐ প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

Three different dates are assigned for the time when he (Naranarayan) ascended the throne in succession to his father Visva Singha viz, 1528 A.D. by Gunabhiram, 1534 in Prasiddhanarayan's Vamsabali and 1555 by Ramchandra Ghosh. His death is said to have occured in 1584 A.D. and Prasiddhanarayan's Vamsavali and Gunabhiram's Assam Buranji agree in fixing 1581 as the date of Raghu's accession to power in the Eastern part of the old Koch kingdom, while the inscription in the Hayagriva temple at Hajo, which was built during his reign and bears the date 1583 A.D. helps to confirm this as the date of the division of the kingdom.

মিষ্টার গেইট নরনারায়ণের সময় ১৫৩৪—১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ স্থির করিতে গিয়া নানা যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বের শেষ কাল যে ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ ছিল, মিষ্টার গেইট সেই সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিত হইয়াছেন; কিন্তু রাজত্বের আরম্ভ-কাল স্থিরীকরণ সম্বন্ধে যুক্তি প্রয়োগ করিতে গিয়া তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, It is less easy to come to a definite conclusion regarding the date of his accession. বাস্তবিক কথাও তাই। আমরা নরনারায়ণের শেষকাল মিঃ গেইটের অনুবর্ত্তী হইয়া ১৫৮৪ বলিয়াই গ্রহণ করিলাম; কিন্তু তাঁহার রাজত্বের আদিকাল ১৫২৮ খৃষ্টাব্দ বলিয়া মনে করি; কেননা স্বর্গীয় রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া-বাহাদুর এবং আসামের ইতিহাস-লেখক মিষ্টার রবিন্সন সাহেব উভয়েই এই কালকেই নরনারায়ণের রাজত্বের আদি কাল বলিয়া তাঁহাদের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ এই কাল চৈতন্য-দেবের কালের সঙ্গেও গরমিল হয় না। চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চরিত পুস্তকের ৩০-৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"শ্রীচৈতন্যদেব শান্তিপুর হইতে

* *vide* Journal, Asiatic Society of Bengal, Vol. *LXII*, part I. no 4, 1893.

বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রথমে যশোড়া গ্রামে গেলেন, তথায় জগদীশ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। * * * তাহার পর শ্রীচৈতন্যদেব আর একবার শ্রীহট্টে আগমন করেন। প্রথমতঃ বুরুঙ্গায় গমন করিয়া পরে ঢাকাদক্ষিণে পিতামহী-সদনে উপস্থিত হন। * * ঢাকা-দক্ষিণ হইতে চলিয়া শ্রীচৈতন্যদেব কামরূপ প্রভৃতি স্থানে এই সময়ে গিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। হাজো নামক স্থানে এখনও লোকে শ্রীচৈতন্যের গোফা বলিয়া একটি স্থান দেখাইয়া থাকে।" ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায়, যে জনশ্রুতির কথা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা শ্রীহট্ট অঞ্চলেও প্রচলিত আছে। অচ্যুতচরণ বাবুর মতেও "এই সকল স্থান দর্শনান্তে তিনি পুনঃ শান্তিপুরে উপস্থিত হন এবং সেই মুহূর্ত্তেই নীলাচলে যাইতে প্রস্তুত হন।" চৈতন্যদেব দ্বিতীয় বার শ্রীহট্টে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর; কিন্তু অচ্যুত বাবু তাহার কোনও সময় নির্ণয় করেন নাই। সৎসম্প্রদায়কথা অনুসারে, তিনি সবে নরনারায়ণ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, এমন সময় কামরূপে আসিয়াছিলেন। রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুর এবং মিষ্টার রবিন্সনের নির্দ্ধারিত ১৫২৮ খৃষ্টাব্দকে নরনারায়ণের রাজত্বের আদিকাল ধরিলেই এই ঘটনা সম্ভবপর হয়। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ ধরিলে ইহা অসম্ভব হইবে, কেন না, চৈতন্যদেব ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দেই ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহা হইলে চৈতন্যদেবের কামরূপ আগমন ঘটনা হইতে নরনারায়ণের প্রকৃত রাজত্বকাল যে ১৫২৮ খৃষ্টাব্দ ছিল, সেই সম্বন্ধে আমরা কতকটা ঐতিহাসিক আলোক প্রাপ্ত হইলাম।

এখন আমরা চৈতন্যদেবের হাজো বাস এবং তথায় দামোদর দেবের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ বিষয়ে আলোচনা করিব। ভট্টদেব তাঁহার 'সৎসম্প্রদায়কথা' তিনখানা পুথি অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছিলেন। তিনি গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন ;—

চৈতন্যসংগ্রহং দৃষ্ট্বা সংগ্রহং কৃষ্ণভারতেঃ।
নৃসিংহকৃত্যমালোক্য কথয়ামি কথামিমাম্ ॥

তিনি এখানে কোন্ চৈতন্যসংগ্রহকে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। কৃষ্ণভারতীর সংগ্রহ এবং নৃসিংহকৃত্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই দুইখানিই অসমীয়া ভাষায় লিখিত পুথি। প্রথমখানা অসমীয়া গদ্যভাষায় লিখিত এবং দ্বিতীয়খানার রচনা পদ্যময়। ভট্টদেব এই দুইখানা পুথির উল্লেখ করাতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই দুইখানা পুথি ভট্টদেবের পূর্ব্বকালের। কৃষ্ণভারতী এবং নৃসিংহ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আমরা এখনও কিছুই জানিতে পারি নাই। আশা করা যায় এক দিন তাঁহাদের বিষয়েও কিছু জানা যাইবে। কৃষ্ণভারতী তাঁহার পুথিতে লিখিয়াছেন ;—

"পাচে প্রভু মাধবক দরশন করি বরাহকুণ্ডর উপরে গোফাঁত রহিয়া রত্নেশ্বরক শরণ করায়া মাধবর দ্বারত ভাগবত কহিবাক দিল। পাচে তান নাম বরপাঠক হৈল। আরো মাণ্ডরী গ্রামর কণ্ঠভূষণক দীক্ষা শিক্ষা দিয়া ভাগবত পাঠ করিবাক আজ্ঞা দিলা। আরো

কণ্ঠাহার কন্দলীকো কৃপা করি, আরো কবিশেখর ব্রাহ্মণক নাম ধর্ম্ম দিলা। পাচে মহাপ্রভু জগন্নাথর মঠর ভিতরে যোগাসনে বসি কাহাকো দেখা নেদিলা।"

ইহা হইতেও দেখা যায়, চৈতন্যদেব মাধব-মন্দিরের সন্নিকটে একটি গহ্বরে ছিলেন এবং তথায় এই দেশীয় কতিপয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। তিনি হাজো হইতে নীলাচলে চলিয়া যান।

নৃসিংহকৃত্য এই ঘটনাকে এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন ;—

"তৈব হন্তে প্রভু কামরূপে গৈয়া
মণিকূট গীরি পাইলা।
বরাহ কুণ্ডর উপর গোফাঁত
চৈতন্য প্রভু রহিলা ॥
রত্ন পাঠকক শরণ লগাই
ভাগবত পাঠ দিলা ॥ ১৪
মাণ্ডরী গ্রামর কণ্ঠভূষণক
কণ্ঠাহার কন্দলীক।
কবিন্দ্র দ্বিজক কবিশেখরক
চৈতন্যে নাম দিলেক ॥
যাত্রা মহোৎসব সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম
মণিকূটে প্রবর্ত্তাই।
তৈর পরা আসি মৌন হয়া রৈলা
ওড়েষা নগর পাই ॥" ১৫

এই পুথি দুইখানি হইতে উদ্ধৃত অংশে দেখা যাইতেছে যে, ভট্টদেব, কৃষ্ণভারতী এবং নৃসিংহের সহিত এই সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন।

এইখানে নৃসিংহকৃত্য সম্বন্ধে একটি কথা উল্লেখ করিতে হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে, আমরা নৃসিংহের কৃত মূল পুথিখানি এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কৃষ্ণ আচার্য্য নামক এক জন এই দেশীয় কবি 'সন্তবংশাবলী' নাম দিয়া নৃসিংহের কৃত পুথিকে অসমীয়া পদ্য ভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। সন্তবংশাবলী যে নৃসিংহের পুথির পদ্য সংস্করণ, সেই সম্বন্ধে কৃষ্ণাচার্য্য তাঁহার পুথির এক যারগায় এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন ;—

"শুনা নরনারী ইতো সন্তবংশাবলী।
জগতকে শুদ্ধ করে যার পদধূলি ॥
নৃসিংহর কথা ইতো সন্তবে সে পদ।
ইহার শ্রবণে করে পাতক উচ্ছেদ ॥" ৫৩

এইখানে একটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার কথা এই যে, যদিও এই দুইখানা পুথিতে চৈতন্যদেবের হাজোর গোফাঁতে বাসের এবং সেখানে কতিপয় এ দেশীয় বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিবার কথা আছে, তথাপি তাঁহার সহিত দামোদর দেবের সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা হইলে ভট্টদেব এই কথা কোথা হইতে পাইলেন? ভট্টদেব দামোদর দেবের সর্ব্বপ্রধান এবং অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। বোধ হয়, দামোদর দেবের নিজ মুখ হইতেই তিনি এই কথা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। কৃষ্ণভারতী এবং নৃসিংহ, ভট্টদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক ছিলেন এবং তাঁহাদের ভিতর কাহারও হয় ত এই কথা বিদিত ছিল না। চৈতন্যদেবের সঙ্গে যে দামোদরদেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা দামোদরদেবের চরিত্রপুথিও স্বীকার করে এবং দামোদর-সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকই তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ৺নীলকণ্ঠদাসের রচিত দামোদরচরিত্রে এই বিষয় এইরূপ ভাবে উল্লিখিত আছে ;—

"দামোদর পাচে কামরূপক আসিলা ॥
বল্লেশ্বর গ্রামে কতো দিন আছিলন্ত।
তথা হন্তে প্রতিদিনে মণিকুটে যান্ত ॥৮২
আসিলন্ত চৈতন্য নারদ বেশ ধরি।
দামোদরে আরাধিলা ভক্তিভাব করি ॥
সাক্ষাতে সে বিষ্ণুরূপ ঋষিয়ে দেখিলা।
জীব উদ্ধারিতে তাঙ্ক তত্ত্বজ্ঞান দিলা ॥৮৩
পরম আনন্দে দুয়ো দুইকো আশ্বাসিলা।
তথা হন্তে চৈতন্য যে ওড়েষাক গৈলা ॥"

এই প্রবন্ধে যে কয়খানা পুথির উল্লেখ করা হইল, তাহার ভিতর "সৎসম্প্রদায় কথা" ছাড়া একখানি পুথিও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এই সব পুথি প্রকাশিত হইলে বোধ হয়, এই সম্বন্ধে আরও নূতন ঐতিহাসিক তথ্য জানা যাইবে। এতগুলি পুথির এবং জনশ্রুতির সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিয়া যদি আমরা চৈতন্যদেবের কামরূপ আগমনকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করি, তাহা হইলে জানি না, আমাদের কোনও বিষয়ের ঐতিহাসিক তত্ত্বে উপনীত হইবার আর কি সম্বল আছে।

এখন আমাদের তৃতীয় প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়াছে, চৈতন্যদেবের পরশুরামকুণ্ড যাত্রা। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণভারতী কিম্বা নৃসিংহ, কোনও উল্লেখ করেন নাই ; কেবল ভট্টদেব তাঁহার সৎসম্প্রদায়কথাতেই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এখন কথা হইয়াছে, আমরা একমাত্র ভট্টদেবের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়াই চৈতন্যদেবের পরশুরামকুণ্ড যাত্রাকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি কি না? আমরা বলি—পারি ; কেন না, ভট্টদেব একজন যে-সে লোক

ছিলেন না। কৃষ্ণভারতী এবং নৃসিংহ, ভট্টদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক হইলেও, তাঁহাদের এক জনও ভট্টদেবের সমকক্ষ ছিলেন না। সংসম্প্রদায়কথার লিখা, কৃষ্ণভারতী এবং নৃসিংহের লিখার সঙ্গে তুলনা করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়, ভট্টদেব ইহাঁদের দুই জন হইতে কত উচ্চে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভট্টদেব দামোদরদেবের সর্ব্বপ্রধান শিষ্য। তিনি দামোদরদেবের সমসাময়িক লোক ছিলেন। দামোদরদেবের কাল ১৪৮৮ হইতে ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দ। ভট্টদেব সংস্কৃত এবং দেশীয় ভাষায় এক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন; তিনি সমগ্র ভাগবত পুরাণকে অসমীয়া গদ্য ভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা প্রাঞ্জল অসমীয়া গদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন এবং সংসম্প্রদায়কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এই কয়খানি পুস্তক দেশীয় ভাষায় রচিত। তাঁহাকে অসমীয়া ভাষায় গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার ভগবদ্ভক্তিবিবেক নামক সংস্কৃত গ্রন্থ আসামে প্রচলিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি অনুপম গ্রন্থ এবং তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় এবং হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তাঁহার উপর দামোদরদেবের এত দূর বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা ছিল যে, তাঁহার মঠের ভার তাঁহার আত্মীয় স্বজনের উপর না রাখিয়া তাঁহারই উপর অর্পণ করেন। তাঁহার উপাধি কবিরত্ন ছিল এবং তিনি "কবিরত্ন" নামেই আসামে সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। দামোদরদেব যখন তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত অসমীয়া গদ্যে অনুবাদ করিতে আদেশ করেন, তখন তাঁহাকে এই ভাবে বলিয়াছিলেন;—

"শুনা কবিরত্ন তুমি ব্যাস সমসর।
তুমি মোর বান্ধব অপর দামোদর॥
* * * *
আরু এক জগত ঈশ্বর আজ্ঞা ধরা।
কথাবন্ধে এক খণ্ড ভাগবত করা॥" রামরায় দাস।

ঈদৃশ এক জন মহৎ ব্যক্তি যে বিশেষরূপে না জানিয়া না শুনিয়া চৈতন্যদেব সম্বন্ধে একটা অমূলক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবেন, ইহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই কথা অলীক বলিয়া বিশ্বাস করিলে তিনি কখনই ইহাকে তাঁহার পুস্তকে স্থান দিতেন না। বিশেষতঃ পরশুরামকুণ্ড ভারতবর্ষে একটি চিরপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। চৈতন্যদেবের জীবন-চরিত্র হইতে দেখা যায় যে, তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন; তিনি কামরূপে কেদার-মাধব পর্য্যন্ত আসিয়া পরশুরামকুণ্ডে না গিয়া ফিরিয়া যাইবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নয়। হয় ত তিনি পরশুরামকুণ্ডে যাইবার জন্যই কামরূপ অঞ্চলে আসিয়া থাকিবেন।

উপসংহারে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে, আজ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে প্রকাশিত চৈতন্যদেব সম্বন্ধে গ্রন্থাবলীতে চৈতন্যদেবের আসাম আগমনের কোনও উল্লেখ নাই বলিয়াই যে এই কথাকে ঐতিহাসিক সত্য নয় বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে, এমন কোনও কথা নয়

অল্প কাল মাত্র হইল, বঙ্গদেশে প্রত্নতত্ত্বের উপর শিক্ষিত লোকদের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে কত নূতন ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে, কত পুরাতন কাহিনী—যাহা এত দিন ইতিহাস বলিয়া চলিয়া আসিতেছিল, ভ্রান্তমত বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? আসামের প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে এখনও রীতিমত কোন অনুসন্ধান হয় নাই; কখন যে হইবে, তাহাও বলিতে পারি না। বঙ্গ এবং আসাম, এই দুই দেশ এত সন্নিকটবর্ত্তী এবং দুই দেশের অধিবাসীদিগের ভিতর ধর্ম্ম, সমাজ, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে এত সৌসাদৃশ্য যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে এক দেশের লোক অপর দেশের লোকের সহিত নানা ভাবে সম্পর্কিত ছিল বলিয়া সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। বঙ্গদেশের লোক আসাম দেশে এবং আসাম দেশের লোক বঙ্গদেশে চলিয়া গিয়া সেই সেই দেশের লোক বলিয়া পরিগণিত হওয়ার অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের অনেক অংশ পূর্ব্বে কামরূপ বলিয়াই প্রখ্যাত ছিল। আজ কাল আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুগ্রহে পরস্পরকে যতটা দূর বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছি, পূর্ব্বে যে সেরূপ ছিল না, তাহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। সেই জন্য অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে আসাম সম্বন্ধে এবং আসামে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে যে অনেক নূতন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বরং না হওয়াই আশ্চর্য্যের বিষয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দেবগোস্বামী
(আসাম)

মানভুম জেলার গ্রাম্য সঙ্গীত

মানভূম জেলার অধিকাংশ অধিবাসী অনার্য্য কোলবংশীয়। মোট জেলার লোকসংখ্যা ১৫৪৮০০০। কুর্ম্মি, সাঁওতাল, ভূমিজ ও বাউরিজাতীয় ব্যক্তিগণ সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গত লোক-গণনায় জানা গিয়াছে যে, এই জেলায় কুর্ম্মির সংখ্যা—২২২০০০, সাঁওতালের সংখ্যা—২৩২০০০, ভূমিজের সংখ্যা—১১৬০০০, বাউরির সংখ্যা—১০৬০০০।

কোলবংশীয় অনার্য্যগণ নৃত্য-গীতে বিশেষ অনুরক্ত। পূজা-পার্ব্বণ ও বিবাহাদি উৎসবে কোল-পল্লী সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠে। নৃত্য-গীত তাহাদের উৎসবের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। সারা দিন মজুরি করিয়া সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিরিবার সময় কোল-রমণীগণ হাট-মাঠ, পথ-ঘাট সঙ্গীতে প্লাবিত করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়। শ্রমসাধ্য কার্য্য করিবার সময়ও তাহাদের গানের বিরাম নাই। প্রকৃতির ক্রোড়ে পালিত অশিক্ষিত জাতি-সকল যখন প্রাণ খুলিয়া গান ধরে, তখন তাহাদের আন্তরিক ভাবোচ্ছ্বাস দৃষ্টে সদা চিন্তাপরায়ণ সভ্য জাতিগণের হিংসা হইবার কথা।

কুর্ম্মিগণ আচার-ব্যবহার ও শিক্ষায় অপেক্ষাকৃত উন্নতি লাভ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সভ্য জাতিগণের ন্যায় তাহাদেরও হৃদয়পটে সমাজ-সমস্যার ছায়া পড়িয়াছে। এখনকার কুর্ম্মি-সমাজে রমণীগণের নৃত্য ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। হয় ত পূর্ব্বদেশাগত বাঙ্গালীর অনুকরণে তাহাদের সমাজ হইতে রমণীগণের সঙ্গীতও এক দিন উঠিয়া যাইবে।

কোল-রমণীগণ যে সকল গানে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া থাকে, অনেক সময়ে সেই সকল গানের কোন বিশেষ অর্থ থাকে না। গানের ভাষায় অনেক সময়ে ব্যাকরণের শৃঙ্খল বা ছন্দালঙ্কারের কিম্বা রাগরাগিণীর নিগড় থাকে না। কিন্তু এই প্রকার গান গাহিয়া কোলগণ যে প্রকার আনন্দ অনুভব করে, মার্জ্জিত-রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ধ্রুপদ ও চৌতালে অনেক সময় সে প্রকার আনন্দ উপভোগের সুবিধা প্রাপ্ত হয়েন না।

কোলগণের সঙ্গীতের সাহচর্য্য করিবার জন্য অনেক সময়ে কোন বাদ্যের প্রয়োজন হয় না। নৃত্যের সহিত যে সকল গান গীত হয়, প্রায় সেই সকল গানের সহিত মাদোল ও বংশীর ধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে। সাঁওতালগণ বাঙ্গালা গান গাহিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত তাহারা সাঁওতালি ভাষায় রচিত গানও গাহে। অপর জাতিরা কেবল বাঙ্গালা গান গাহিয়া থাকে। কয়েকটি বাঙ্গালা গানের নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১)

নাগর১ যাছন্২ গো
ভাত হাতে৩ টাঙ্গিয়া৪ ঝলকায়ে৫
বাইরালেন৬ কুঁকড়ি ডাকে৭
সোঝো গ্যালেন্ কুলিবাটে৮
চুটিয়া৯ ফুঁকিয়া১০।
ভাত খাবার বেলা হ'ল
এখ্নো নাগর না আইল
(কোন বাটে) কেঁদ১১ খাছন্ মহুল বনে।

(২)

জামপাটা১২ চিরি চিরি নৌকা বনাব১৩
নৌকায় নহর১৪ চলি যাব
বাপ্ ঘরে তেল্পানে তড়্কা ঝল্মল্ করে।
আম্পাতে তড়্কা মাঝ্লে
তড়্কা ঝল্মল্ করে।

(৩)

তেঁতুল পাতে ধান মেলেছি গো
পায়রা রাজা ঘুরি ফিরি খায়।

---

(১) নাগর—রসিক পুরুষ।
(২) যাছন্—গিয়াছেন।
(৩) ভাত হাতে—ভাত খাইবার হাতে, অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তে।
(৪) টাঙ্গিয়া—টাঙ্গি, এতদ্দেশীয় এক প্রকার অস্ত্র।
(৫) ঝল্কায়ে—নাড়িতে নাড়িতে।
(৬) বাইরালেন—বাহিরে গিয়াছেন।
(৭) কুঁকড়ি ডাকে—কুক্কুট ডাকিবার সময়, অতি প্রত্যূষে।
(৮) কুলিবাটে—গ্রাম্য রাস্তার দিকে।
(৯) চুটিয়া—চুটি, এক প্রকার বিড়ি বা চুরুট।
(১০) ফুঁকিয়া—টানিতে টানিতে।
(১১) কেঁদ—এতদ্দেশীয় এক প্রকার বন্য ফল।
(১২) জামপাট—জাম গাছের পাটা বা তক্তা।
(১৩) বনাব—তৈয়ার করিব।
(১৪) নহর—বাপের বাড়ী।
(১৫) তড়্কা—কাণের ফুল।

ভাল রে পায়রা তোরে দেখিব রে
তোরি পাথায় সিপাহী সাজাব।

(৪)

ডেহিরির[১] উপর ডেহিরি দাদা
ডেহিরি কত দূর্ রে,
লোয়াগড় চাঁদড়া[২]
দেশ কত দূর্ রে।

(৫)

কোন ফুলের সঙ্গে পীরিতি করিব
কোন ফুলের সঙ্গে যাব রে সজনি,
যুঁহি ফুলের সঙ্গে পীরিতি করিব
গুলাব ফুলের সঙ্গে যাব রে সজনি !

অনেক গানে প্রশ্নোত্তর থাকে। গানের প্রথম অংশে প্রশ্ন ও শেষাংশে তাহার উত্তর থাকে। এই প্রকার গানে কবিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পায়। এই প্রকার কয়েকটি গানের দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রদত্ত হইল।

(৬)

(প্রশ্ন) কোন্ সঁয়[৩] বাইরায় খড়ি পিঁপড়ি[৪]
কোন্ সঁয় বাইরায় ধেনু গাই।
কোন্ সঁয় বাইরায় সাঁগুকা বিটিয়া[৫]
ছুয়ো খোড়ে[৬] আয়্তা লাগায়ে ?
(উত্তর) টিলা[৭] সঁয় বাইরায় খড়ি পিঁপড়ি
বাথান[৮] সঁয় বাইরায় ধেনু গাই।
ঘর সঁয় বাইরায় শাঁগুকা বিটিয়া
ছুয়ো খোড়ে আয়্তা লাগায়ে।

---

(১) ডেহিরি—চৌকাঠ।
(২) গ্রামের নাম।
(৩) কোন্ সঁয়—কোন্ স্থান হইতে।
(৪) খড়ি পিঁপড়ি—শ্বেত বর্ণের পিপীলিকা, উই।
(৫) সাঁগুকা বিটিয়া—শাশুড়ীর কন্যা, স্ত্রী।
(৬) ছুয়ো খোড়ে—দুই পায়ে।
(৭) টিলা—উই-ঢিবি।
(৮) বাথান—গোঠ।

(৭)

(প্রশ্ন) কেতি[১] জানল[২] বরদা[৩] চৈত বৈশাক্
কৈসে[৪] জানল আষাঢ় মাস।
কৈসে জানল বরদা আশিন ভাদর্
কৈসে জানল বরদা কাতিক মাস্॥
(উত্তর) ধূলায় জানল বরদা চৈত বৈশাক্
কাদায় জানল আষাঢ় মাস।
আসে জানল বরদা আশিন ভাদর
শিঞারে[৫] জানল বরদা কাতিক মাস॥

(৮)

কোন্ ঠাঞে[৬] ফোটে হর্দিরে[৭] ঝিঙ্গা ফুল,
ঝাঁটি গাঁধায়[৮] ফোটে হর্দিরে ঝিঙ্গা ফুল।
কোন্ ঠাঞে ফোটে লাল সালুকের ফুল,
মালদহে ফোটে লাল সালুকের ফুল।

প্রশ্নোত্তরের গান ব্যতীত অন্য প্রকার আর কয়েকটি গানের নমুনা নিয়ে দেওয়া হইল।

(৯)

ও বাছা ফুচুর‍্যা[৯]
তুই নাকি পুরবাসে[১০] যাবি?
পুরবাসে গেলে বাছা
মাড়[১১] কুথা পাবি?

---

(১) কেতি—কিরূপে।
(২) জানল—জানিতে পারিল।
(৩) বরদা—গাভী।
(৪) কৈসে—কিসের দ্বারা।
(৫) শিঞারে—সাজ-সজ্জায়। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্থায় এ দেশে গরুর গা চিত্রিত করিতে হয়।
(৬) ঠাঞে—স্থানে।
(৭) হর্দিরে—হরিদ্রা রঙের।
(৮) ঝাঁটি গাঁধায়—বন্য কাষ্ঠে নির্ম্মিত মাচার উপর।
(৯) ফুচু—লোকের নাম।
(১০) পুরবাস—প্রবাস।
(১১) মাড়—ভাতের ফেন।

(১০)

বাপ্ হঁয়ে আনেছে বর
সই, দোষ দিব কি পরকে ?
কিবা শিবের রূপের ছটা
গায়ে ভসম্ মাথায় জটা
ঢাকের মতন মোটা সোটা
যম লেরেছে বল্‌কে।

(১১)

কোনহ ডালে কুইলিনী[১] কুড়ুর্‌ছে[২]
শ্যামবঁধু, কোন ডালে তার বাসা ?
আগহি[৩] ডালে কুইলিনী কুড়ুর্‌ছে
শ্যাম বঁধু, মাঝ্ ডালে তার বাসা।
ছাঁওকে[৪] পাড়ব মাটিকে মারব
বাঁসাটি বাণে ভাসাব।
বহুত যতনে সাগর বাঁধব।
সাগর শুখাল মাণিক লুকাল
অভাগীর কপালের দোষে।

দশম ও একাদশ সংখ্যক গান দুইটি অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ে রচিত বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গদেশীয় গান এতদ্দেশীয় ভাষার ছাঁচে ঢালিয়া এই গান রচিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় লোকগণ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। পূর্ব্বদেশাগত বৈষ্ণবগণ এতদ্দেশে বিস্তর বৈষ্ণব পদ আমদানি করিয়াছেন। দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামে মাদোলের বাদ্য সহকারে স্থানে স্থানে অনার্য্যগণ কর্ত্তৃক বিশুদ্ধ বৈষ্ণব পদ গীত হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে বৈষ্ণবগণ দেশ ও পাত্রের উপযোগী করিবার জন্য গানের স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। আবার স্থানে স্থানে অক্ষুণ্ণ বৈষ্ণব গানও শ্রুত হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত গানটি স্থানে স্থানে গাহিতে শোনা গিয়াছে।

গগনে উদিতে ভানু ছল করে বলে কানু
শোন্ সখি, শোন্।

---

(১) কুইলিনী—কোকিলবধূ।
(২) কুড়ুর্‌ছে—গান করিতেছে।
(৩) আগহি—উপরের।
(৪) ছাঁওকে—ছানাকে।

আমরা গোয়ালা জাতি দেবি ভগবতী

(ও তাই গেল আজ্ রাতি)

রাখাল সনে বিস্তমান কপিলাকে দিব দান

শোন্ সখি, শোন্। ইত্যাদি

এই প্রকার গান গাহিবার ও শুনিবার জন্ত কোলজাতীয় পুরুষ ও রমণীগণের উত্তম ও আগ্রহ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

শ্রীহরিনাথ ঘোষ

1 Percentএর প্রতিশব্দ

One Percent, Two percent প্রভৃতি কথার বাঙ্গালা কি ? আমি যত দূর জানি, সহজ কথায় এতদর্থবোধক কিছু শব্দ আমাদের নাই। ডাক্তারী পুস্তকেই এই কথাগুলি বেশী ব্যবহার করিতে হয়। কেহ কেহ বাঙ্গালা অক্ষরে "ওয়ান্ পারসেণ্ট", "টু পারসেণ্ট" লিখিয়া গোলমাল এড়াইয়াছেন; কেহ বা খাটী বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া "শতকরা এক ভাগ দ্রব, শতকরা দুই ভাগ দ্রব" ইত্যাদি লিখিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদে শতকরার হিসাবের বহুল ব্যবহার না থাকায় আয়ুর্ব্বেদীয় পরিভাষা হইতেও কোন সাহায্য পাওয়া যায় না।

পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে "One percent, Two percent" প্রভৃতির একটি সুন্দর প্রতিশব্দ আছে। কথাটি জমী ক্রয়ে ও কমিশনের হিসাব কষিতে ব্যবহৃত হয়। এক শত টাকা মূল্যে ক্রীত জমীর বার্ষিক আয় ৫৲ টাকা হইলে ঐ ক্রয়কে "পাঁচোত্তরা" ক্রয় বলে। এইরূপে "চারোত্তরা, আটোত্তরা, সাড়ে সাতোত্তরা" প্রভৃতি কথারও ব্যবহার আছে। যদি কোন জমীর আয় চারি টাকা হয় ও মূল্য ৯০৲ টাকা হয়, তবে তাহা প্রায় "সাড়ে চারোত্তরা" হইল। "এই জমী কি দরে কেনা হইয়াছে", এই প্রশ্নের উত্তরে "পাঁচোত্তরা কিনিয়াছি" কিংবা "ছয়োত্তরা কিনিয়াছি", এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হয়; প্রশ্নকর্ত্তা, উত্তরদাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী শ্রোতা কাহারও বুঝিবার বাকী থাকে না।

কমিশন কষিবার সময়ও ঐরূপ। বড় বড় মামলা-মোকদ্দমা বা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মধ্যবর্ত্তী সম্পাদক (উকীল) যে কমিশন দাবী করিয়া থাকেন, তাহা তায়দাদের উপর "আধোত্তরা, একোত্তরা" বা ততোধিক হিসাবে কষা হইয়া থাকে অর্থাৎ মোকদ্দমা বা বেচা-কেনার Value (তায়দাদ)এর উপর একটা শতকরা নির্দ্দিষ্ট হারে পাইয়া থাকেন।

"উত্তর" শব্দের গ্রাম্য ব্যবহারে "উত্তরা" শব্দের উৎপত্তি। "একোত্তর, দ্বয়োত্তর" লিখিলে যেমন সুশ্রাব্য হয়, তেমনই ব্যাকরণ-শুদ্ধও হয়। এই শব্দটি সাহিত্যিকেরা গ্রহণ করিলে ভাষায় একটি অভাব দূর হইবে। কয়েক বৎসর যাবৎ সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নে বিশেষ যত্নশীল আছেন। সম্প্রতি যাহাতে মেডিকেল স্কুলসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে পরিষৎ অতিশয় উদ্যোগী হইয়াছেন। এই সুন্দর শব্দটি গ্রহণ করিবার পক্ষে এখনই মাহেন্দ্র যোগ।

নিম্নে প্রয়োগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল;—

- ½ percent Commission—আধোত্তর (বা কথোপকথনে আধোত্তরা) কমিশন।

1 Percent solution—একোত্তর দ্রব।

3 Percent solution of Carbolic acid—কার্ব্বলিক এসিডের ত্রিনোত্তর দ্রব।

4 Percent alcoholic solution—চারোত্তর এলকোহলীয় দ্রব, এলকোহলের চারোত্তর দ্রব।

6 Percent watery solution—ছয়োত্তর বা ষড়োত্তর জলীয় দ্রব।

"Percent" এই শব্দের পরিবর্ত্তে ইংরেজীতে যে সাঙ্কেতিক চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়, বাঙ্গালাতে অবিকল তাহা ব্যবহৃত হইতে পারে।

শ্রীতারকনাথ দেব

শ্রীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পানিহাটী-মাহাত্ম্য

স্থান-মাহাত্ম্য

"পানিহাটী গ্রামে নানা ভাবের প্রকাশ"—(ভক্তিরত্নাকর)

শ্রীপাট পানিহাটী যাঁহার পুণ্যময় আভায় শ্রেষ্ঠতম তীর্থরূপে আলোকিত, সেই সেবাপরায়ণ রাঘব পণ্ডিতের বিবরণ দিবার পূর্ব্বে পানিহাটীর মাহাত্ম্য ও যৎকিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক তথ্যাদি বিবৃত করিলে বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ, পানিহাটীর সহিত বৈষ্ণব-জগতের সম্বন্ধ বিশেষ ভাবেই জড়িত; বহু ভক্তের ইহা লীলাস্থল। বৈষ্ণবের পক্ষে শ্রীপাট পানিহাটী চিন্ময় ভূমি। ইহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের আনন্দ-বিশ্রামের স্থান; শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অতি প্রিয় বিহার-ক্ষেত্র। এই স্থানেই নিত্যানন্দ প্রভুর অভিষেক-লীলা হইয়াছিল; পানিহাটী সর্ব্ব আদি প্রচারক্ষেত্র; 'মালসা ভোগ' প্রথার ইহাই প্রথম উদ্ভবস্থান। "জম্বিরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল" এই অনৈসর্গিক ঘটনা এই স্থানেই ঘটিয়াছিল। বুদ্ধ যেরূপ রাজ-ঐশ্বর্য্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধত্ব লাভের জন্য গয়া-সন্নিধানে 'বোধিদ্রুম'-তলে উপস্থিত হইয়া ভিখারী সাজিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় পারিষদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীও ঠিক সেইরূপ ভাবে নব লক্ষ মুদ্রা বাৎসরিক আয়ের বিষয়-বৈভব ও অতুলনীয়া সুন্দরী ভার্য্যা তুচ্ছ করিয়া পানিহাটীর শ্রীবটবৃক্ষ-তলে কাঙ্গাল সাজিয়াছিলেন। অদ্যাপিও তাঁহার আগমন উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর মহাসমারোহে 'স্মরণ উৎসব' হইয়া থাকে, উহারই নাম 'দণ্ড-মহোৎসব'। এই কৃপাদণ্ডের চিড়া মহোৎসব হইতেই সর্ব্বদেশে বৈষ্ণব-সমাজে মালসা-ভোগ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত কত শত ভক্তের পদধূলি যে এই স্থানে পতিত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বৈষ্ণব শাস্ত্র বলেন;—

> যে স্থানে বৈষ্ণব জন করেন বিজয়।
> সেই স্থান হয় সদা অতি পুণ্যময়॥—(ভক্তিরত্নাকর, ৮ম তরঙ্গ)

গৌড় মণ্ডলমধ্যে যতগুলি শ্রীপাট আছে, তন্মধ্যে শ্রীপাট পানিহাটীই বর্ত্তমানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উজ্জ্বল শ্রীপাট। অন্যান্য শ্রীধামাদি অপেক্ষা ইহার মাহাত্ম্য বেশী। ইহা অত্যুক্তি নহে, অতি সত্য কথা। কেন? তাহার কারণ জানাইতেছি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে;—

> শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দের নর্ত্তনে।
> শ্রীবাস কীর্ত্তনে আর রাঘব-ভবনে॥
> এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা আবির্ভাব।—(অন্ত্য—২য় পরি)

অপিচ অন্যত্রে,—

এই মত শচীগৃহে সতত ভোজন।
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্ত্তন দর্শন॥
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখেন আসি বারে বারে।
নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে॥—(চরিতামৃত, অন্ত্য, ২ পরিঃ)

বর্ত্তমান কালে প্রভুর অতি প্রিয় চারিটি স্থানের মধ্যে তিনটি ক্ষেত্র অপ্রকট বা আমার মত অভক্তের পাপ-চক্ষুর বিষয়ীভূত নহে। শ্রীবাস-অঙ্গনের শ্রীগৌরপদরজঃকে মাতা সুরধুনী আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন, কণামাত্র রাখেন নাই। কারণ, নবদ্বীপের উক্ত অংশ এক্ষণে গঙ্গাগর্ভে নিহিত। শচী আম্মির পবিত্র রন্ধন এবং প্রভুর ভোজন-লীলা এক্ষণে কোন্ ব্রহ্মাণ্ডের ভক্তগণের যে আনন্দদায়ক, তাহা কি করিয়াই বা জানিব? আর মূর্ত্তিমন্ত প্রেম শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু "কোথায় যে নাচিছে", তাহাও আমার মত বহির্ম্মুখ কেমন করিয়া দেখিবে? ভক্ত বলেন;—

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

এখানেও প্রভেদ; অর্থাৎ সকল ভাগ্যবানে নহে, মহাভাগ্যবান্ যাঁহারা, তাঁহাদেরই নিত্য-লীলা দেখিবার অধিকার।

আসল কথা, প্রভু সকল ক্ষেত্রগুলি আমাদের চর্ম্ম-চক্ষুর অন্তরালে রাখিলেও তাঁহার নিরন্তর আবির্ভাব-ক্ষেত্র রাঘব-ভবনটিকে লুকাইতে পারেন নাই। পতিতপাবন পতিতের জন্য একটি চিহ্ন রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং স্বমুখের বাণীতে এই "রাঘব-ভবনে"ই তিনি চিরতরে আবদ্ধ হইয়া আছেন। এই কারণেই বৈষ্ণব তীর্থ-মধ্যে পানিহাটীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন। গৌর-ভক্তগণের পক্ষে এমন পুণ্যময় স্থান ভূমণ্ডলমধ্যে আর কোথাও নাই।

শুধু ভক্তের নহে, এই স্থানে ঐতিহাসিকেরও বুঝিবার অনেক বিষয় আছে; পুরাতত্ত্ব-বিদেরও গবেষণার যথেষ্ট উপকরণ আছে; সৌন্দর্য্যলিপ্সুর উপভোগের দৃশ্যাদিও অতুলনীয়। ১২৫ বৎসর মাত্র বয়সের বটবৃক্ষ দেখিবার জন্য যাঁহারা সাগ্রহে "বোটানিক্যাল গার্ডেনে" গমন করেন, তাঁহারা একবার কলিকাতার এত নিকটে আসিয়া ৫০০ বৎসরের বটবৃক্ষ দেখিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করুন। আকবরের ঠাকুর-দাদার পূর্ব্ব হইতেও এই বৃক্ষ বর্ত্তমান।

ঐতিহাসিক তথ্য

পানিহাটীর উত্তরাংশের নাম ভবানীপুর। এই ভবানীপুর সীমার মধ্যে আমাদের 'রাঘব-ভবন'।

মুসলমান-রাজত্ব সময়ে পানিহাটী একটি মহকুমায় পরিণত হয়। এ জন্য এক জন কাজী (বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট স্বরূপ) সৈন্য-সামন্ত লইয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতে থাকেন।

নিত্যধামগত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় পানিহাটীতে কাজীর বাসের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। যথা ;—"হোসেন খাঁ, 'সাহা' উপাধি ধারণ করিয়া গৌড়ের রাজা হইলেন। তাঁহার অধীনে স্থানে স্থানে এক একজন কাজী রাখিলেন ; ঐ সকল কাজী সৈন্যসামন্ত পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। * * নবদ্বীপে বেলপুখুরিয়াতে 'চাঁদ খাঁ' নামে একজন কাজী, * * শান্তিপুরে 'মলুক' নামে একজন কাজী * * এইরূপ পানিহাটী গ্রামে একজন কাজী বাস করিতেন।"—(অমিয় নিমাই-চরিত, ১ম খণ্ড, ৴০ পৃঃ)

কাজীর আবাস-ভূমি ও বিচারালয় প্রভৃতি সমস্তই কাল-মাহাত্ম্যে লুপ্ত হইয়াছে। তবে গোরস্থান, নমাজের ইদ্‌গা, খাজনাখানা, গেট প্রভৃতির চিহ্ন এবং কাহারও কাহারও নাম এখনও রহিয়াছে। আর চন্দ্রকেতু রাজার খোদিত হংসডিম্বাকৃতি পরিখার পয়ঃপ্রণালী গঙ্গার এক ধার হইতে আরম্ভ করিয়া যাহা কিঞ্চিৎ দূরে অন্য ধারে মিশিয়াছিল, তাহা স্থানে স্থানে গড়, ঝিল, পুষ্করিণী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোবার দ্বারা বেশ সুস্পষ্ট প্রমাণ দর্শাইয়া দিতেছে। কিন্তু ভবানী দেবীর মূর্ত্তি আর নাই। সহজ অনুমান, মুসলমানগণের আবাসগৃহে দেবীমূর্ত্তির অবস্থান তাঁহারা ভাল বিবেচনা করেন নাই।

৺গঙ্গার গতি

অতি অল্প দিনের মধ্যে ভাগীরথীর যেরূপ রূপান্তর হইয়া গিয়াছে, তাহা দেখিলে ও শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়, পানিহাটীতে সেরূপ কোনই উপদ্রব এ পর্য্যন্ত হয় নাই। চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে যে স্থানে জলের সীমা ছিল, অধুনা ঠিক সেই স্থানেই রহিয়াছে। মহাপ্রভু যে ইষ্টকময় ঘাটে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ঘাট এবং সেই স্থান পূর্ব্ববৎ বিরাজমান।

(রেণেল্ড সাহেবের ১৩০ বৎসর পূর্ব্বেকার মানচিত্রে এবং এসিয়াটিক সোসাইটির প্রচারিত ১৫১৮ খৃঃ অব্দের অর্থাৎ ৩৯৮ বৎসর পূর্ব্বেকার রচিত "গাসটলডি:সের গালকো দি বাঙ্গলা" নামক মানচিত্রে গঙ্গার এই স্থানে যেরূপ গতি অঙ্কিত আছে, এখনও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত মানচিত্রে পানিহাটীর নাম উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু পানিহাটীর এক মাইল উত্তর দিকে সুখচর গ্রামের নাম রহিয়াছে।)

পানিহাটী কত দিনের গ্রাম

পানিহাটী যে বহু প্রাচীন গ্রাম, তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের দ্বারা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়।

যশোহর জিলায় এক জাতীয় ধান্য দৃষ্ট হয়, তাহার নাম 'পেনিটি ধান'। কৃষকগণ তাহাদের পিতৃপিতামহ হইতে শুনিয়া আসিতেছে যে, বহু পূর্ব্বকালে এই ধান্য গঙ্গার ধারে পেনিটি বা পানিহাটী নামক গ্রাম হইতে সে দেশে আমদানী হয়। শুদ্ধ গঙ্গার ধারে কেন, সারা বাঙ্গলায় ইহা ছাড়া পানিহাটী নামে আর কোন গ্রাম নাই।

প্রেমাবতার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ১৪৩৮ শকে (ইং ১৫১৬ খৃঃ) পানিহাটিতে শুভাগমন করিয়া তৎকালে ইহাকে বিশেষ সৌষ্ঠবশালী এবং বহু পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যের বাসভূমি অর্থাৎ সভ্য জনপদ দেখিয়াছিলেন।—(বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা, ২ বর্ষ, ৪০৬ অঃ)

আরও বহু পূর্ব্বের কথা, রাজা বল্লাল সেনের সময়েও (১১০২ খৃঃ) পানিহাটী যে জনবহুল গ্রাম ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

মেলগ্রন্থে পানিহাটীর 'করবংশ' প্রসিদ্ধ। এই স্থানে বিস্তর মৌলিক 'কর' উপাধিধারী কায়স্থের বাস ছিল। কর কায়স্থগণ পরিচয়স্থলে 'পানিহাটীর কর' বলিয়া সমাজে পরিচয় দিয়া থাকেন। কায়স্থ-সমাজের মেল-বন্ধন বল্লাল সেনের সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পরেই হইয়াছে। কিন্তু অধুনা পানিহাটীতে এক ঘরও কর কায়স্থের বাস নাই।

অতি প্রাচীন কালে পানিহাটী গভীর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। তাহার অন্যতম প্রমাণ 'বন-দেবীর আস্তানা'। (এই আস্তানা গ্রামের মধ্যস্থলে, মেদিনীপুরের বিখ্যাত উকীল বাবু মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ফুলপুকুরের বাগানমধ্যে।) বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগণ প্রতি বৎসর নির্দ্ধারিত দিবসে এই স্থানে আগমন করিয়া হিংস্র জন্তু প্রভৃতির উপদ্রব নিবারণ জন্য বন-দেবীর পূজা দিয়া থাকেন।

এই সকল প্রমাণাদির দ্বারা সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল হইতে যে পানিহাটী সভ্য জনপদরূপে অবস্থিত, তাহা সহজে প্রমাণিত হইতেছে।

বর্ত্তমান

বর্ত্তমানে পানিহাটী একটি বড় গণ্ডগ্রাম, বিস্তর শিক্ষিত লোকের বাসভূমি। ইহার থানা খড়দহ। শিয়ালদহ মুন্সিফির অধীনে ২৪ পরগণা মধ্যস্থিত; স্বনাম 'পানিহাটী মিউনিসিপ্যালিটী'র অন্তর্গত। কলিকাতা হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তটভূমির উপরেই স্থিত। ইহার দক্ষিণে আগড়পাড়া, পশ্চিমে ৺গঙ্গাদেবী, উত্তরে সুখচর ও পূর্ব্বে সোদপুর গ্রাম। ১৯১১ খৃঃ অব্দের লোক-গণনায় লোকসংখ্যা ৪ হাজার। এই গ্রাম কালেক্টরী ১৫৫, ১৮০, ১৮১, ১৯৪ নম্বর তৌজিভুক্ত। রাস্তা বাদে মোট ৫১৮ একার জমি। পানিহাটীর উপর দিয়া তিনটি সুবৃহৎ রাস্তা গিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক সময়ে যে রাস্তাটি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার নাম 'বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড'। ইহা অতিশয় প্রসর এবং দুই ধারে ঘন বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা সুশোভিত। ইহা এমন সুন্দর দৃশ্যময় ও সুশীতল যে, শুনা যায়, এরূপ রাজবর্ত্ম ভারতবর্ষমধ্যে খুবই বিরল। দ্বিতীয়, মুরশিদাবাদ রোড বা পুরাণ রাস্তা; পানিহাটীর পূর্ব্ব ধার দিয়া বরাবর কলিকাতায় মিশিয়াছে। নবাবের সৈন্যাদি স্থলপথে কলিকাতায় আসিতে হইলে এই পথেই যাতায়াত করিত। তৃতীয়, রাজা রামচাঁদের ঘাটের উপর হইতে আরম্ভ করিয়া বারাসত, বাদু, দেগঙ্গা, হাড়োয়া, চৌরশী, বসিরহাট, টাকি ও প্রতাপাদিত্যের পুরাতন যশোহরের উপর দিয়া গিয়াছে। রেল হইবার পূর্ব্বে ঐ সমস্ত জন-

পদবাসী এই রাস্তা দিয়াই ৺গঙ্গাদর্শনে আসিতেন। প্রবাদ, চন্দ্রকেতু রাজা ইহা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীপাট পানিহাটীর অতীত এবং বর্ত্তমানের নানাবিধ তথ্যের বিশেষ পরিচয় দিবার একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও, প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এই স্থানেই আমরা ক্ষান্ত হইয়া রাঘব পণ্ডিতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি।

শ্রীরাঘব পণ্ডিত মহারাজ

"রাঘব পণ্ডিত বন্দোঁ প্রণতি বিস্তর।"—(চৈতন্যমঙ্গল)

বৈষ্ণব-শাস্ত্রে তিন জন রাঘবনামা ভক্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রথম রাঘব গোস্বামী, দ্বিতীয় রাঘবপুরী, তৃতীয় রাঘব পণ্ডিত। রাঘব গোস্বামী দাক্ষিণাত্য রামনগরনিবাসী ব্রাহ্মণ, "ভক্তি-রত্নপ্রকাশ" গ্রন্থ-প্রণেতা; পূর্ব্বলীলায় ইহাঁর 'চম্পকলতা' আখ্যা। ইনি সমুদয় ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে সঙ্গে করিয়া শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে ইহাঁর সমাধি বর্ত্তমান।

রাঘবপুরী—ইহাঁর বিশেষ কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না,—

"গরুড়াবধূতদেবঃ পুরী রাঘবসংজ্ঞকঃ।"—(বৈষ্ণব অভিধান)

এইবার আমরা রাঘব পণ্ডিত মহারাজের বিষয় বলিতেছি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, যে রাঘব পণ্ডিত অসামান্য ভক্তিবলে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে কিনিয়া রাখিয়াছিলেন, যাঁহার গৃহই প্রভুর আনন্দ-বিশ্রামের স্থান, শ্রীমাধব ঘোষের অর্দ্ধ খণ্ড হরীতকী সঞ্চয় করাতে যে মহাপ্রভু বৈরাগ্যের হানি বিবেচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাঘব পণ্ডিতের অপূর্ব্ব প্রেমবলে স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুই বৎসরাধিক কাল সেবার জন্য "রাঘবের ঝালি" হইতে সুস্বাদু আচারাদি খাদ্য দ্রব্য আনন্দে সঞ্চয় করিয়া স্বেচ্ছায় যতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইতেন, শ্রীনিত্যা-নন্দপ্রভু যাঁহার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া পানিহাটীকে বাসভূমে পরিণত করিয়াছিলেন—সেই মহাপ্রেমিক, অত্যাশ্চর্য্য সেবাপরায়ণ রাঘব পণ্ডিতের জীবনী বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত হইবার উপায় নাই। বৈষ্ণব গ্রন্থের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত অংশ হইতে যাহা জানিতে পারা যায়, তাহাতে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না। অত্যন্ত দুঃখের কথা, এমন মহাপুরুষের পুণ্যময় জনক-জননীর নাম পর্য্যন্ত জানিতে পারিলাম না। বৈষ্ণব গ্রন্থমধ্যে যে যে স্থানে ইহাঁর বিষয় বর্ণিত আছে, আমরা তৎসমুদয়ই সংগ্রহ করিয়াছি। সংগৃহীত বিষয়গুলি হইতে পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন, ইনি ধর্ম্মরাজ্যের কত উচ্চ পদবীতে আরূঢ় ছিলেন। অধিকাংশ বৈষ্ণব গ্রন্থেই ইহাঁর মহিমার কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীপাট পানিহাটী রাঘব পণ্ডিতের জন্মভূমি বলিয়াই আজ ইহা বৈষ্ণবগণের নিকট পরম তীর্থরূপে প্রণম্য।

"যে কুলে যে দেশে ভাগবত অবতরে।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তারে॥
যে স্থান হইয়া ভক্ত করেন প্রয়াণ।
পুণ্যময় তীর্থ হয় সে সকল স্থান॥
ভক্ত-জন্মস্থানের মহিমা অপার।
* * * *॥—(ভক্তিরত্নাকর, ৮ম তরঙ্গ)

রাঘবকে বক্ষে ধারণের জন্যই ত শ্রীভগবানের পদরজঃ লাভ করিয়া পানিহাটী মহিমান্বিত হইয়াছে! পানিহাটীর নাম শ্রবণে কত মহাপুরুষকে কৃতাঞ্জলিবদ্ধে দণ্ডবৎ করিতে দেখিয়াছি। এ ভক্তি, এ গৌরব শুদ্ধ পণ্ডিত মহারাজের জন্যই। নতুবা বাঙ্গালার বিস্তৃত ভূখণ্ডমধ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রামটি কাহার লক্ষ্যমধ্যে আসিত? কিন্তু হতভাগ্য গ্রামবাসী আমরা, সে পূর্ব্ব-গৌরবে কিছুমাত্র গৌরবান্বিত নহি। অপি চ নেড়ানেড়ির কাণ্ড বলিয়া এতাবৎ ইহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছি। এত সভ্য আমরা! এত আভিজাত্য আমাদের! হায়, ভেক যেমন পদ্মের নিকটে বাস করিয়াও মধুর আস্বাদ পায় না, দূরদেশাগত ভ্রমরেরই তাহা লভ্য হয়, আমাদেরও তদ্রূপ অবস্থা।

নিম্নলিখিত প্রামাণিক গ্রন্থে বৈষ্ণব-বন্দনা-প্রসঙ্গে পণ্ডিত মহারাজের বন্দনা পাওয়া যায়, যথা;—

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে—'রাঘব পণ্ডিত বন্দোঁ প্রণতি বিস্তর'।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি, ১০ম)—'রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।'

দৈবকীনন্দনকৃত বৈষ্ণব-বন্দনায় (১৯ পৃঃ)—

'মহা অনুভব বন্দোঁ পণ্ডিত রাঘব।
পানিহাটী গ্রামে যাঁর প্রকাশ বৈভব॥'

বৃন্দাবনদাসকৃত ঐ (৩৭ পৃঃ)—

"বন্দিব রাঘবানন্দ যাঁর ঘরে নিত্যানন্দ
অনুভব করিল বিদিত।
বাড়ীর জম্বির গাছে কদম্ব ফুটিয়া আছে
সর্ব্ব লোক দেখিতে বিস্মিত॥"

বৃন্দাবন ঠাকুরের ঐ (১০ পৃঃ)—

"চলিলেন পণ্ডিত শ্রীরাঘব উদার।
গুপ্তে যাঁর ঘরে হইল চৈতন্য-বিহার॥"

বৈষ্ণব অভিধানে (৪৯ পৃঃ)—'রাঘবো জগদানন্দপণ্ডিতঃ শ্রীপুরন্দরঃ।'

শ্রীবৃন্দাবনলীলায় ইনি ধনিষ্ঠা সখী ছিলেন। যথা ;—

"ধনিষ্ঠা ভক্ষ্যসামগ্রীং কৃষ্ণায়াদাদ্‌ব্রজেঽমিতাম্।
সৈব সংপ্রতি গৌরাঙ্গপ্রিয়ো রাঘবপণ্ডিতঃ॥" ১৬৬॥

—(গৌরগণোদ্দেশদীপিকা)

"ধনিষ্ঠা সখী এবে রাঘব পণ্ডিত।
চৈতন্যের শাখা পানিহাটীতে বিদিত॥"—(বৈষ্ণব আচারদর্পণ)

নিম্নলিখিত কয়েকখানি প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থের উদ্ধৃত পয়ারগুলি দ্বারা পণ্ডিত মহারাজের প্রেমভক্তি এবং পানিহাটীর মাহাত্ম্য বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি হইবে। যথা ;—

অন্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায় শ্রীচৈতন্যভাগবতে ;—

"পানিহাটী গ্রামে হৈল পরম আনন্দ।
আপনে সাক্ষাৎ যথা প্রভু গৌরচন্দ্র॥
প্রভু বোলে রাঘবের আলয়ে আসিয়া।
পাসরিলুঁ সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া॥
গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়।
সেই সুখ পাইলাঙ রাঘব আলয়॥"

ঐ অন্যত্রে ;—

"হেন মতে নিত্যানন্দ পানিহাটী গ্রামে।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ সনে॥"

* * * *

"পানিহাটী গ্রামে হৈল যত প্রেমসুখ।
চারি বেদে বর্ণিবেন সে সব কৌতুক॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ;—

"রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বার বার॥"—(অন্ত্য,—৬ষ্ঠ পরিঃ)

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (ভাষা) ;—

"এক দিনে নৌকা আইল পানিহাটী গ্রাম।
নৌকা হইতে ভক্ত সঙ্গে নামে ভগবান॥"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার গ্রন্থে ;—

"ত্রিবেণী পর্য্যন্ত আর পানিহাটী গ্রাম।
কীর্ত্তন দেখিতে লোক চলে অবিরাম॥"

ভক্তিরত্নাকরে ;—

"ভক্ত সঙ্গে কি অদ্ভুত প্রভুর বিলাস।
পানিহাটী গ্রামে নানা ভাবের বিকাশ॥"

ঐ অন্তরে ;—

"রাঘব পণ্ডিত-গৃহে সে নৃত্য কীর্ত্তন।
তাহা বর্ণিবারে শক্তি ধরে কোন্ জন॥"

এই পানিহাটীই যে রাঘব পণ্ডিতের জন্মভূমি, তাহার নিশ্চয়তার প্রমাণ ভক্তিরত্নাকরে (৮ম তরঙ্গ, ৫৩৮ পৃঃ) দৃষ্ট হয়। যথা ;—

"রামদাস গদাধর দাসাদি সহিত।
পানিহাটী গ্রামে প্রভু হইলা উপনীত॥
মহাভক্ত রাঘবের জনম তথাই।
ভক্ত-জন্মস্থানের মহিমা অন্ত নাই॥"

রাঘব পণ্ডিত ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব ছিলেন। কেন না, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতি ভিক্ষা বা অন্ন গ্রহণ করাইতে সাহস করিতেন না, তিনিও তাহা কখনও অঙ্গীকার করিতেন না। পণ্ডিত উপাধি, শ্রীবিগ্রহ সেবা এবং প্রভুর ইহাঁর হস্তে ভোজন দ্বারা উক্ত প্রমাণ দৃঢ়ীভূত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদে শ্রীরাঘব পণ্ডিত 'বিপ্র' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। যথা,—"আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি নন্দন রাঘব। শ্রীবাস আদি যত ভক্ত বিপ্র সব॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ;—

"প্রভু বোলে রাঘবের কি সুন্দর পাক।
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক॥
রাঘব প্রভুর প্রীত শাকেতে জানিঞা।
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিঞা॥"—(অন্ত্য খণ্ড, ৫ অঃ)

কিন্তু ব্রাহ্মণকুলের কোন্ বংশ তিনি উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। অধিকন্তু রাঘবের বংশধর বলিয়া পানিহাটী বা অন্য কোন স্থানে কোন ব্রাহ্মণের বাসের সংবাদ পাওয়া যায় না। গ্রন্থাদিতেও ইহাঁর স্ত্রীপুত্রের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইনি যে চিরকাল কুমার ছিলেন, তাহা সহজানুমেয়। পরিজনমধ্যে ইহাঁর এক ভাগ্যবতী ভগিনী ছিলেন। তিনিও বিধবা ; নাম শ্রীমতী দময়ন্তী দেবী। ইনি মহাপ্রভুর অনুরক্তা দাসী ছিলেন। পূর্ব্বলীলায় তাঁহার গুণমালা আখ্যা। "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা"য় রাঘব পণ্ডিতের পরিচয়ের পরেই লিখিত আছে ;—"গুণামালা ব্রজে যাসীদ্দময়ন্তী তু তৎস্বসা॥"১৬৭॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি, ১০ পৃঃ)—

"রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।"

* * *

"তাঁর ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয়দাসী।"

এই ভাগ্যবতী রমণীই মহাপ্রভুর জন্য অতি পবিত্রভাবে স্বহস্তে সারা বৎসর ধরিয়া নানাবিধ আচারাদি খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন। রথযাত্রার সময় সেই সমস্ত দ্রব্য মোট মোট সাজাইয়া রাঘবপণ্ডিত শ্রীক্ষেত্রে প্রভুর নিকট লইয়া যাইতেন। মহাপ্রভু সানন্দে তাহা গ্রহণ করিয়া বৎসরাধিক কাল ভোজনের জন্য সযত্নে রক্ষা করিতে গোবিন্দকে আজ্ঞা দিতেন। ঐ সব দ্রব্যের মোট 'রাঘবের ঝালি' নামে খ্যাত।

শ্রীচরিতামৃতে ;—

"রাঘব পণ্ডিত চলিলা ঝালি সাজাইয়া।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া ॥"—(অন্ত্য, ১০ পরিঃ)
"রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী।
দোঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম শকতি ॥"—(অন্ত্য, ১০ম পরিঃ)

ঐ অন্যত্রে (অন্ত্য ১০ম) ;—

"তাঁর ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয়দাসী।
প্রভুর ভোগসামগ্রী সে করে বারমাসি ॥
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যান গুপত করিয়া ॥
বার মাস প্রভু তাহা করেন অঙ্গীকার ॥
রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধি যাহার ॥"

ইহা ব্যতীত রাঘব পণ্ডিতের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে মকরধ্বজ কর নামক জনৈক মৌলিক কর উপাধিধারী কায়স্থের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনিও পানিহাটীবাসী ; স্ত্রীপুত্র-পরিজনাদি সহিত পণ্ডিত মহারাজের সেবকত্বে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি অতিশয় সুগায়ক ছিলেন। মহাপ্রভু ইহাঁর সঙ্গীত শুনিতে ভালবাসিতেন। ইহাঁদেরই বংশধরগণ 'পানিহাটীর কর' নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীচরিতামৃতে (আদি, ১০ম পরিঃ) ;—

"রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।
তাঁর এক শাখা মুখ্য মকরধ্বজ কর ॥"

কর মহাশয়ও পরম ভক্ত ছিলেন। পূর্ব্বলীলায় ইহাঁর সুকেশী সখী আখ্যা।

"পীতাম্বরস্তু কাবেরী সুকেশী মকরধ্বজঃ ॥"১৬৮॥—(গণোদ্দেশদীপিকা)
"মকরধ্বজ কর বন্দোঁ গুণের নিদান।
প্রভু স্থানে কৃষ্ণগুণ সদা যাঁর গান ॥"—(বৃন্দাবন, বৈষ্ণববন্দনা)
"মকরধ্বজ কর বন্দোঁ প্রভুর গায়ন ॥"—(দৈবকিনন্দন, বৈষ্ণববন্দনা)

এই কর মহাশয়ের উপর 'ঝালি' রক্ষণাবেক্ষণের সমুদয় ভার অর্পিত হইত। ইনিও প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞানে বাহকদিগের সহিত পুরুষোত্তমে 'ঝালি' পৌঁছাইয়া দিতেন।

"ঝালির উপর মৌসীন (মুন্‌সিব) মকরধ্বজ কর।
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর ॥"

—(শ্রীচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১০ম পঃ)

এই মহাভাগ্যবান্ কর মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের উপদেশামৃত পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

"মকরধ্বজ প্রতি গৌরচন্দ্র।
কহিলেন সেবিহ তুমি রাঘবানন্দ ॥
রাঘব পণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তোমার।
সে কেবল সুনিশ্চয় জানিয় আমার ॥"—(চরিতামৃত)

রাঘব-ভবনে যে সমস্ত লীলা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার একটি তালিকা দিয়া একে একে সংক্ষিপ্ত ভাবে তৎসমুদায় বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

১ম। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রেম প্রচার জন্য পানিহাটী আগমন এবং অভিষেক-লীলা।
২য়। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড-মহোৎসব।
৩য়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পানিহাটী আগমন।
৪র্থ। রাঘব পণ্ডিতের ঝালির বিবরণ।
৫ম। রাঘব পণ্ডিতের অদ্ভুত সেবানিষ্ঠা।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর রাঘব-ভবনে আগমন ও অভিষেক-লীলা

"সুরধুনী-তীরে হরি বলে কে ?
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
নিতাই নইলে প্রাণ জুড়ালো কিসে ?"

পুরীধামে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আজ্ঞায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৌড়দেশে প্রেম প্রচার জন্য বহির্গত হন। তিনি সর্ব্বপ্রথম পানিহাটীতে রাঘব-ভবনে আসিয়া উহাকেই আদি প্রচারক্ষেত্রে পরিণত করেন। এই সময়ের বিবরণ বিস্তর প্রাচীন পদে বর্ণিত হইয়াছে। ভক্ত-মনোরঞ্জনের নিমিত্ত আমরা দুই একটি উদ্ধৃত করিতেছি।

বিরলে নিতাই পাইয়া নিজ কাছে বসাইয়া
মধু-ভাবে কহে ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হ'য়ে হরিনাম লওয়াও গিয়ে
যাও নিতাই সুরধুনী-তীরে ॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ সব জীব হইল অন্ধ
কেহ ত না পাইল হরিনাম।

এক নিবেদন তোরে নয়নে দেখিবে যারে
কৃপা ক'রে লওয়াবে নাম ॥
কৃতপাপ দুরাচার নিন্দুক পাষণ্ডি আর
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
কুমতি তার্কিক জন অধম পড়ুয়াগণ
জন্মে জন্মে ভকতি-বিমুখ।
কৃষ্ণ-প্রেম দান করি বালক পুরুষ নারী
খণ্ডাইও সবাকার দুখ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তখন ;—

গৌরাঙ্গ আদেশ পাইয়া নিতাই বিদায় হইয়া
আইলেন শ্রীগৌড়মণ্ডলে।
সঙ্গে ভাই অভিরাম গৌরীদাস গুণধাম
কীর্ত্তন বিহরে কুতুহলে ॥
রামাই সুন্দরানন্দ বাসু আদি ভক্তবৃন্দ
সতত কীর্ত্তন-রসে ভোলা।
পানিহাটী গ্রামে আসি গঙ্গাতীরে পরকাশি
রাঘব পণ্ডিত সহ মেলা ॥
সকল ভকত লৈয়া গৌর-প্রেমে মত্ত হৈয়া
বিহরয়ে নিত্যানন্দ রায়।
পতিত দুর্গত দেখি হইয়া করুণ আঁখি
প্রেম-রত্ন জগতে বিলায় ॥
হরিনাম-চিন্তামণি দিয়া জীবে কৈল ধনী
পাপ তাপ দুঃখ দূরে গেল।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সুরধুনী-তীরে পানিহাটী গ্রামে আসিয়া পদার্পণ করিলেন। সঙ্গে অভিরাম (খানাকুল), মাধব ঘোষ (বিখ্যাত গায়ক), গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, রামদাস, সুন্দরানন্দ, গদাধর দাস (এড়িয়াদহ), মুরারি, কমলাকর পিপলাই (মাহেশ), সদাশিব, পুরন্দর, কৃষ্ণদাস হোড়, পরমেশ্বর দাস (খড়দহ), মহেশ, গৌরীদাস পণ্ডিত (অম্বিকা), উদ্ধারণ দত্ত (সপ্তগ্রাম) প্রভৃতি বহুসংখ্যক ভক্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাঘব-ভবনে গমন করিলেন।

রাঘব পণ্ডিত মহাসমারোহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে স্বগৃহে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। 'করগোষ্ঠীর' সহিত রাঘবের আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

"আজি পরাণনাথ আইল মম ঘরে।"

এই বার দয়াল নিতাই কীর্ত্তন করিবার জন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, মুকুন্দ ঘোষ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, প্রভু আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ের চিত্র শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে সুন্দরভাবে পরিদৃষ্ট হয়। (অন্ত্য, ৫ম পরিঃ),—

"হেন মতে নিত্যানন্দ পানিহাটী গ্রামে।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ সনে॥
নিরন্তর পরানন্দে করেন হুঙ্কার।
বিহ্বলতা বই দেহে বাহ্য নাহি আর॥
নৃত্য করিবার ইচ্ছা হইল অন্তরে।
গায়ক সকলে আসি মিলিলা সত্বরে॥

* * * *

মাধব গোবিন্দ বাসুদেব তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই॥
হেন সে নাচেন অবধূত মহাবল।
পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল॥
নিরবধি হরি বলি করেন হুঙ্কার।
আছাড় দেখিতে লোকে লাগে চমৎকার॥
যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে।
সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে॥" (ইত্যাদি)

এইরূপে প্রভু নিত্যানন্দ অধিকারী অনধিকারী নির্ব্বিশেষে প্রেম বিতরণ করিয়া জীব-জগতের উদ্ধার সাধন করিতে লাগিলেন। ত্রিবেণী হইতে পানিহাটী পর্য্যন্ত অসংখ্য লোক কীর্ত্তন দেখিতে রাঘব-ভবনে উপস্থিত হইতে লাগিল। স্থাবর-জঙ্গম প্রেমানন্দে মগ্ন হইল।

"ত্রিবেণী পর্য্যন্ত আর পানিহাটী গ্রাম।
কীর্ত্তন দেখিতে লোক চলে অবিরাম॥
দিবসে ভোজন আর রাত্রিতে কীর্ত্তন।
অনন্ত কহিতে নারে আসে কত জন॥"—(বংশবিস্তার গ্রন্থ)

এক দিবস এইরূপ মধুর নৃত্য-কীর্ত্তন হইতেছে, এমন সময়ে নবদ্বীপে শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীগৌরাঙ্গদেব যেমন মহাপ্রকাশ-লীলা করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাবে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রাঘবের বিষ্ণু-খট্টায় উপবেশন করিয়া ভক্তবৃন্দের প্রতি আজ্ঞা করিলেন—"আজ আমার অভিষেক কর"।

ভক্তবৃন্দ এই মহানন্দজনক আজ্ঞা পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। রাঘব পণ্ডিত প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় অভিষেকের কি যে আয়োজন করিবেন, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে একটু প্রকৃতিস্থ হইলে

উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। রাঘব পণ্ডিত সহস্র সহস্র মৃৎকলসী আনাইয়া নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য সহ পূত গঙ্গাবারিতে পূর্ণ করিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে যাবতীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ হইয়া গেল। তখন দামোদর পণ্ডিত অভিষেক-মন্ত্রে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীমস্তকে গঙ্গাবারি ঢালিতে লাগিলেন। হরিধ্বনিতে জল-স্থল কম্পিত হইতে লাগিল।

স্নানের পর রাঘব পণ্ডিত নূতন গামছা দ্বারা শ্রীঅঙ্গ মুছাইয়া নূতন বসন পরিধান করাইলেন। নরহরি শ্রীঅঙ্গে অগুরু, চন্দন-চূয়া চর্চ্চিত করিয়া দিলেন। তুলসী সহিত সুন্দর সুগন্ধি ফুলের মালা গলদেশে লম্বিত হইল। অতঃপর সুন্দর খট্টায় দুগ্ধফেননিভ শয্যা পাতিয়া তদুপরি প্রভুকে বসান হইল। ভাগ্যবান্ রাঘব পণ্ডিত শ্রীমস্তকে ছত্র ধরিলেন। কেহ চামর, কেহ গন্ধ, কেহ তাম্বূল প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া প্রভুর অগ্রে করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। আজ রাজরাজেশ্বরের অভিষেক! কেহ কি স্থির থাকিতে পারে?

"জয়ধ্বনি করিতে লাগিল ভক্তগণ।
চতুর্দ্দিকে হৈল মহা আনন্দ-ক্রন্দন॥
ত্রাহি ত্রাহি সভে বোলেন বাহু তুলি।
কারো বাহ্য নাহি সবে মহা কুতূহলী॥
স্বানুভাবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
প্রেম-দৃষ্টি বৃষ্টি করি চারি দিকে চায়॥"—(অন্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায়)

পানিহাটীতে এই অভিষেক উপলক্ষ্যে বিস্তর প্রাচীন পদ রচিত হইয়াছিল। সকলগুলি উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে। এ জন্য একটি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

গীত—আশাবরী।

আজু আনন্দে নিতাইচাঁদে।
শোভাময় সিংহাসনে বসাইয়া কেহ না ধৈরজ বাঁধে॥
সুবাসিত গঙ্গাজল লৈয়া।
পড়ি মন্ত্র মাথে ঢালে জল
দামোদর হরষিত হৈয়া॥
জয় জয় ধ্বনি করি।
মানুষে মিশায়ে সুরগণ শোভা
নিরখে নয়ন ভরি॥
কেহ গায় অভিষেক রঙ্গে।
পরাইয়া শুভ্র বাস নরহরি চন্দন দেই সে অঙ্গে॥
—(ভক্তিরত্নাকর, ১২ তরঙ্গ)

প্রভু খট্টার উপর উপবেশন করিয়া রাঘবকে আজ্ঞা করিলেন,—"রাঘব, কদম্বফুল আমার অতি প্রিয়। তুমি কদম্বের মালা আমাকে উপহার দাও।"

রাঘব করযোড়ে কহিলেন,—"শ্রীপাদ, এ সময় ত কদম্বফুল ফোটে না। কি করিয়া আপনার আজ্ঞা পালন করিব ?"

প্রভু। বাটীর মধ্যে গমন করিয়া একবার তোমার উদ্যান দেখ দেখি ; পাইলেও পাইতে পারিবে।

রাঘব বাটীর মধ্যে গমন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। দেখিলেন, জাঁম্বিরের গাছে বিস্তর কদম্ব ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। যথা ;—

"আজ্ঞা করিলেন শুন রাঘব পণ্ডিত।
কদম্বের মালা ঝাট আনহ ত্বরিত॥
বড় প্রীত আমার কদম্ব পুষ্প প্রতি।
কদম্বের বনে নিত্য আমার বসতি॥
করযোড় করি রাঘবানন্দ কহে।
কদম্ব পুষ্পের যোগ এ সময় নহে॥
প্রভু বোলে বাড়ী গিয়া চাহ ভাল মনে।
কদাচিত ফুটিয়া বা থাকে কোন স্থানে॥
বাড়ীর ভিতরে গিয়া চাহেন রাঘব।
বিস্মিত হইলা দেখি মহা অনুভব॥
জম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল।
ফুটিয়া আছয়ে অতি পরম অতুল॥"

—(শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৫ম পরিঃ)

টাবা নেবুর গাছে কদম্বের ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া রাঘব আনন্দে বাহ্য-হারা হইলেন। ভক্তগণ অপূর্ব্ব কদম্বপুষ্পের সৌরভে বিহ্বলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মালা গাঁথিয়া পণ্ডিত মহারাজ প্রভুর গলদেশে অর্পণ করিলেন। তখন সকলে পরানন্দে নৃত্য করিয়া উঠিলেন।

এইরূপ লীলাতরঙ্গে ভক্তগণ মগ্ন রহিয়াছেন, এমন সময়ে আচম্বিতে কোথা হইতে অদ্ভুত দমনক পুষ্পের মহাসুগন্ধ ভক্তগণ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন,—"কোন সুগন্ধ তোমরা কি নাসিকায় অনুভব করিতেছ ?"

ভক্তগণ। হাঁ প্রভু, দমনক পুষ্পের গন্ধের মত অতি মনোহর সুগন্ধ আমরা পাইতেছি।

প্রভু। ইহার গুপ্ত রহস্য কেহ কি কিছু বুঝিতে পারিয়াছ ?

ভক্তগণ। আজ্ঞা না।

প্রভু। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু তোমাদের কীর্ত্তন শুনিতে নীলাচল হইতে রাঘব-ভবনে

আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার গলদেশের দমনক পুষ্পের মালার গন্ধই তোমরা পাইয়াছ। অতএব সর্ব্বকার্য্য পরিহার পূর্ব্বক নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর। এই বলিয়া হুঙ্কার গর্জ্জনে সর্ব্বলোকের উপর প্রেম-দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন ভক্তগণের হইল কি?—

"নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেম-দৃষ্টিপাতে।
সভার হইল আত্মবিস্মৃতি দেহেতে॥

* * *

যে ভক্তি গোপিকাগণের কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে॥"—(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

এইরূপ প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় ভক্তগণ কি করিতে লাগিলেন?—

"কেহ গিয়া বৃক্ষের উপর ডালে চড়ে।
পাতে পাতে বেড়ায় তথাপি না পড়ে॥
কেহো কেহো প্রেম-সুখে হুঙ্কার করিয়া।
বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লাফ দিয়া॥

* * *

কেহো বা গুবাক-বনে যায় রড় দিয়া।
গাছ পাঁচ সাত গুয়া একত্র করিয়া॥
হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেম-বল।
তৃণপ্রায় উপাড়িয়া ফেলাল সকল॥"—(ঐ)

আরও কি হইল?—

"অশ্রু কম্প স্তম্ভ ঘর্ম্ম পুলক হুঙ্কার।
স্বরভঙ্গ বৈবর্ণ্য গর্জ্জন সিংহ-সার॥
শ্রীআনন্দমূর্চ্ছা আদি যত প্রেমভাব।
ভাগবতে কহে যত কৃষ্ণ অনুরাগ॥
সভার শরীরে পূর্ণ হইল সকল।"—(ঐ)

তখন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার পারিষদগণকে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন করিয়া প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই পারিষদগণের এক একজন ভুবনপাবন, অতুলনীয় শক্তিধর।

"যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান।
সভাতে হইল সর্ব্ব-শক্তি অধিষ্ঠান॥
সর্ব্বজ্ঞতা বাক্‌সিদ্ধ হইল সভার।
সভে হইলেন যেন কন্দর্প আকার॥
সভে যারে পরশ করেন হস্ত দিয়া।
সেই হয় বিহ্বল সকল পাসরিয়া॥"—(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

এইরূপে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নানাবিধ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া তিন মাস যাবৎ শ্রীপাট পানিহাটী ধন্ত করিয়াছিলেন।

"এইমত পানিহাটী গ্রামে তিন মাস।
করে নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তির বিলাস॥

* * *

পানিহাটী গ্রামে যত হৈল প্রেম-সুখ।
চারি বেদে বর্ণিবেন সে সব কৌতুক॥"—(শ্রীচৈতন্তভাগবত)

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড-মহোৎসব

"ইনি (রঘুনাথ দাস) জীবনের ত্যাগস্বীকারে জগদ্বিখ্যাত শাক্যসিংহেরও সন্নিধানে বসিবার যোগ্য পুরুষ এবং বৈরাগ্যের চরমোৎকর্ষে ঋষি-যোগীরও শিক্ষাস্থল।"—(কালীপ্রসন্ন ঘোষ)

এক দিবস ঐরূপ ভাব-তরঙ্গে সকল ভক্তগণকে ডুবাইয়া নিত্যানন্দপ্রভু পানিহাটীর গঙ্গা-তীরে বটবৃক্ষের চবুতরা উপরে বসিয়া আছেন। চারি দিকেই ভক্তগণের আনন্দকোলাহল এবং হরিধ্বনিতে জল-স্থল কম্পিত হইতেছে। এমন সময়ে একটি সুন্দর যুবক ধীরে ধীরে বৃক্ষের কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। যুবকের চরণ চঞ্চল, পিণ্ডার (বেদীর) নিকট অগ্রসর হইতে প্রাণের ইচ্ছা, কিন্তু যাইবেন কি, পা যেন আর উঠিতেছে না। তাই বেদীর দিকে সলজ্জভাবে এক একবার দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তাঁর দেখিতেছেন যে,—

"গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডির উপরে।
বসি আছেন যেন কোটী সূর্য্যোদয় করে॥
তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।
দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত॥"—(চরিতামৃত, অন্ত্য, ৬)

যুবক বিস্মিত হইলেন। অধিক ক্ষণ আর সে ভাবে থাকিতে পারিলেন না। তাই সেই স্থানেই প্রভুর উদ্দেশে ভূমিতে দেহ বিলুণ্ঠিত করিলেন। এই যে এত ক্ষণ একটি যুবক এক স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, পার্ষদগণের মধ্যে কেহই তাহা লক্ষ্য করেন নাই। দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করাতে জনৈক সেবক তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুকে বলিলেন,—"ঐ দেখুন, রঘুনাথ দাস আসিয়া আপনাকে দণ্ডবৎ করিতেছেন।" প্রভুর দৃষ্টি তখন রঘুনাথের উপর পতিত হইল। রঘুনাথকে দেখিয়া শ্রীপাদ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং রহস্ত করিয়া রঘুনাথকে ডাকিয়া বলিলেন;—

"শুনি প্রভু কহে চোরা দিলি দরশন।
আয় আয় আজি তোর করিব দণ্ডন॥"—(ঐ)

শ্রীপাদ ডাকিতেছেন, কিন্তু রঘুনাথ আসিতেছেন না। সলজ্জ এবং সঙ্কুচিতভাবে পূর্ব্ব-

স্থানেই দণ্ডায়মান আছেন। তখন নিত্যানন্দপ্রভু উঠিয়া গিয়া জোর করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিলেন। আর—"আকর্ষিয়া তাঁর মাথে প্রভু ধরিল চরণ।"—(চরিতামৃত, অন্ত্য,)

যে পদরজঃ পাইবার জন্য কত শত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণিগণ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তপস্যা করিতেছেন, সেই শ্রীপাদপদ্ম আজ নিতাইচাঁদ আমাদের জোর করিয়া রঘুনাথের মস্তকে অর্পণ করিলেন। ধন্য রঘুনাথ দাস! ধন্য তোমার ভক্তি! তাহার পর কি হইল?

"কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়॥
নিকটে না আইস মোর ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছোঁ দণ্ডিমু তোমারে॥"—(ঐ)

শ্রীপাদ তখন রঘুনাথকে দণ্ড দিতে চলিলেন। দণ্ড কি? না, "চিড়া দধি আনিয়া আমার ভক্তগণকে ভোজন করাও।" অপরূপ দণ্ডবার্ত্তা শুনিয়া রঘুনাথ দাস আনন্দে অধীর হইলেন। ধনীর সন্তান, অর্থের কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই। একা বিংশতি লক্ষ মুদ্রার অধিকারী। তৎক্ষণাৎ দ্রব্যাদি আহরণ জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। মহোৎসবের বিশেষভাবেই আয়োজন হইতে লাগিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে উৎসব-সংবাদ চারি দিকে প্রচার হইয়া গেল। বিশেষতঃ রঘুনাথ দাসের অতুল বিষয়-বৈভবাদি পরিত্যাগ করণান্তর বৈরাগ্য গ্রহণ-সংবাদে উহাঁকে দর্শন করিবার জন্য লোকের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। অচিরেই বৃক্ষতল সহস্র সহস্র মনুষ্যে পূর্ণ হইল।

এ দিকে অন্যান্য গ্রাম হইতে ভারে ভারে দ্রব্য-সামগ্রী আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। বহুসংখ্যক হোলপা (মালসা) এবং বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা (গামলা) আনা হইল। দধি-দুগ্ধ, ক্ষীর, চিনি, চিড়া, চাঁপাকলা, ঘৃত, কর্পূর প্রভৃতি উপকরণ রাশীকৃত হইল। বড় বড় মাটীর গামলার কতকগুলিতে উষ্ণ দুগ্ধ দিয়া চিড়া ভিজাইয়া তাহাতে দধি, চিনি দিয়া ভোগের যোগ্য করা হইল। অপর গামলাগুলিতে উক্ত গরম দুগ্ধের চিড়া লইয়া তাহার সহিত ক্ষীর, চাঁপাকলা, চিনি, ঘৃত, কর্পূর প্রভৃতি মিশাইয়া সজ্জিত করা হইল। এইরূপে ভোগের আয়োজনাদি শেষ হইলে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ভুবনমোহন বেশে সজ্জিত হইয়া পিণ্ডার উপরে বসিলেন। একজন ব্রাহ্মণ শতটি সুসজ্জিত মালসা প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। নিত্যানন্দের পার্শ্বে রামদাস, সুন্দরানন্দ, গদাধরদাস, মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর, ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাস, মহেশ, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস হোড়, উদ্ধারণ দত্ত প্রভৃতি বহুসংখ্যক ভক্তগণ শোভা পাইতে লাগিলেন। মহোৎসব দেখিতে যে সকল সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য আসিয়াছিলেন, প্রভু তাঁহাদেরও মাল্য দিয়া স্বীয় পার্শ্বে বসাইলেন। এইরূপে বেদীর উপরের স্থান পূর্ণ হইলে শ্রীবৃক্ষতলায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বহুতর লোক উপবেশন করিলেন। ক্রমে এমন ভিড় হইতে লাগিল যে, বৃক্ষতলও পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তখন লোকে ;—

"তীরে স্থান না পাইয়া আর কথো জন।
জলে নামি করে দধি চিপিটক ভক্ষণ॥"—(চরিতামৃত)

শ্রীপাদ তখন প্রত্যেক লোককে ছুইটি করিয়া মালসা দিবার আজ্ঞা দিলেন। ছুইটি দিবার কারণ, একটিতে দুগ্ধ চিড়া, অপরটিতে দধি চিড়া ভোজনের জন্য। বিংশতি জন পরিবেষক বেদীতে, বৃক্ষতলে এবং গঙ্গার তীরভূমিতে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় রাঘব পণ্ডিত নানাবিধ মনোহর প্রসাদ লইয়া প্রভু ও ভক্তগণকে বিতরণ করিতে করিতে প্রভুকে কহিলেন,—"শ্রীপাদ, আমি আপনার সেবার জন্য গৃহে বহুবিধ প্রসাদ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, আর আপনি এখানে সেবা করিতে উদ্যত হইয়াছেন?" প্রভু হাসিয়া হাসিয়া কহিলেন,—"প্রসাদ রাখিয়া ভালই করিয়াছ; এখন থাকুক, রাত্রে তোমার বাটীতে গিয়া তাহা ভোজন করিব। এখন যে প্রসাদ আনিয়াছ, খাওয়া যাউক। আর জান ত রাঘব, আমি গোয়াল গোপগণের সহিত এইরূপ পুলিন-ভোজন বড়ই ভালবাসি। এক্ষণে তুমিও এখানে আমার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া প্রসাদ পাও।" এই বলিয়া রাঘবকে ছুইটি মালসা প্রদান করিলেন। সমস্ত লোকের পরিবেষণ সমাপ্ত হইলে প্রভু ভাবাবেশে এক লীলা করিলেন, তাহা ভগবান্ অন্তরঙ্গ যাঁহারা, তাঁহারাই বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঘটনাটি এই ;—

"সকল লোকের চিড়া সম্পূর্ণ যবে হৈল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল॥
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সভার চিড়া দেখিতে লাগিলা॥
সকল কুণ্ডী হোলনার চিড়া একেক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস॥"—(ঐ)

গৌরাঙ্গদেবও হাসিয়া হাসিয়া নিত্যানন্দ-মুখে এক এক গ্রাস দিতে লাগিলেন। অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবগণ এ রঙ্গ দেখিয়া মোহিত হইতে লাগিলেন।

"তবে আসি নিত্যানন্দ আসনে বসিলা।
চারি কুণ্ডী আরোয়া চিড়া ডাহিনে রাখিলা॥
আসন দিয়া মহাপ্রভুরে তাহাঁ বসাইলা।
ছুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা॥"—(ঐ)

এইবার নিত্যানন্দ প্রভু সকলকে ভোজন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন সকলে মিলিয়া হরিধ্বনি করিয়া মহানন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণের সুরধুনীকে যমুনা ভ্রম হইল। তাঁহাদের মনে হইল, তাঁহারা যেন দ্বাপরের লোক, শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের সহিত আজ পুলিন-ভোজন করিতেছেন। নিত্যানন্দ-কৃপায় সকলেই এই ভাবে বিভোর হইলেন। পানিহাটী বৃন্দাবনে পরিণত হইল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মহোৎসবের সংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে প্রচার হওয়াতে চতুর্দ্দিক্ হইতে অনবরত লোক-সমাগম হইতে লাগিল। তাই লোক-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের উপ-যোগী দ্রব্যাদিরও বিস্তর দোকান-পসারি আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের বিবরণ শুনুন ;—

"মহোৎসব শুনি পসারি গ্রাম গ্রাম হৈতে।
চিড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে॥
যত দ্রব্য লঞা আইসে সব মূল্য লয়।
তারি দ্রব্য মূল্য লঞা তাহারে খাওয়ায়॥
কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন।
সেহো চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ॥"—(চরিতামৃত, অন্ত্য, ৬)

প্রভুর ভোজন শেষ হইলে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাম্বূলাদি যোগাইলেন। ভক্তগণ মাল্য-চন্দনে শ্রীঅঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া দিল। পরে রঘুনাথ দাসকে প্রভু আহ্বান করিয়া দেবদুর্ল্লভ স্বীয় অধরামৃত প্রদান করিলেন। রঘুনাথ প্রসাদ প্রাপ্তে মহানন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন। ইহাই রঘুনাথ দাসের দণ্ডমহোৎসব। এই উৎসব ১৪৩৯ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথিতে সম্পন্ন হইয়াছিল। অদ্যাবধি উক্ত মাসের উক্ত তিথিতে মহাসমারোহে সেই স্থানেই উৎসব হইয়া থাকে। ঐ দিন প্রেমবন্যায় পানিহাটী গ্রাম ভাসিয়া যায়।

দিবা অবসান হইলে রঘুনাথ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সহ নিত্যানন্দ প্রভু রাঘব-মন্দিরে গমন করিলেন ও কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

"ভক্ত সব নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়।
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগৎ ভাসায়॥

*　*　*　*

নৃত্য করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিল।
ভোজনের কালে পণ্ডিত নিবেদন কৈল॥"—(চরিতামৃত, অন্ত্য, ৬)

রাঘব পণ্ডিত মহারাজ দিবাভাগে যে সমস্ত প্রসাদ প্রভুর জন্য রাখিয়াছিলেন এবং প্রভু সেই সমস্ত রাত্রে অঙ্গীকার করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কীর্ত্তন-শেষে পণ্ডিত মহাশয় সুযোগ বুঝিয়া সেই সমস্ত আনিয়া প্রভুকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর ডাইন দিকে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর উদ্দেশে একখানি আসন প্রস্তুত হইলে রাঘব দেখিতে পাইলেন ;—

"মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিলা।"—(চরিতামৃত, অন্ত ৬)

তখন পণ্ডিত মহারাজ মহানন্দে দুই ভাইকে ভোজন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বার বার॥

* * *

সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুর্য্যের সার।
দুই ভাই তাহা খাঞা সন্তোষ অপার ॥"—(চরিতামৃত, অন্ত্য, ৬)

পশ্চাৎ সমুদয় ভক্তগণকে প্রসাদ পরিবেষণ করা হইল। এই সময় ভক্তগণ রঘুনাথকে লইয়া এক সঙ্গে প্রসাদ পাইবেন, এ জন্য তাঁহাকে ডাকিতে উদ্যত হইলে, রাঘব তাঁহাদের নিষেধ করিলেন। পরে ভক্তগণের আহার শেষ হইলে সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত মহারাজ সুন্দর বিছানায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শয়ন করাইয়া পদসেবা দ্বারা তাঁহার নিদ্রা আকর্ষণ করাইয়া নিজে ভোজন করিতে গেলেন। এই সময় তিনি রঘুনাথকে ডাকিয়া—

"কহিল চৈতন্য গোসাঞি করিয়াছেন ভোজন।
তার শেষ পাইলে তোমার খণ্ডিল বন্ধন ॥"—(চরিতামৃত, অন্ত্য, ৬)

এই বলিয়া প্রভুদ্বয়ের ভুক্তাবশেষ মহামহাপ্রসাদ প্রদান করিলেন। ইহারই জন্য রঘুনাথকে ভক্তগণ সঙ্গে প্রসাদ পাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এইরূপে রঘুনাথ সে রাত্র রাঘব-ভবনে অবস্থিতি করিয়া পরদিন প্রাতে পূর্ব্বোক্ত গঙ্গাতীরস্থ শ্রীবৃক্ষরাজমূলে, যেখানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সপারিষদে বসিয়া আছেন, তথায় উপস্থিত হইয়া প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন;—

"অধম পামর মুঞি হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয়ে পাঙ চৈতন্য-চরণ ॥
বামন হঞা যেন চান্দ ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু যাইতে কভু সিদ্ধ নয় ॥
যত বার পলাঙ আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতা মাতা দুই জনা রাখয়ে বান্ধিয়া ॥
তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অধমেও পায়।
তোমার কৃপা বিনে কেহো চৈতন্য না পায় ॥
অযোগ্য মুঞি নিবেদন করিতে করোঁ ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ গোঁসাঞি হইয়া সদয় ॥
মোর শিরে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ কর আশীর্ব্বাদ ॥"—(ঐ)

রঘুনাথ দাসের কাকুতি দেখিয়া প্রভু ভক্তগণের প্রতি চাহিয়া কহিতে লাগিলেন;—

"হাসিয়া কহে প্রভু সব ভক্তগণে।
ইহাঁর বিষয়-সুখ ইন্দ্রসুখ সমে॥

চৈতন্য-কৃপাতে সেহো নাহি ভায় মনে।
সবে আশীষ দেহ পায় চৈতন্য-চরণে ॥
কৃষ্ণপাদপদ্ম-গন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মলোক আদি সুখ তারে নাহি ভায় ॥"—(চরিতামৃত, অন্ত্য,)

এই কথা বলিয়া প্রভু রঘুনাথের মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম অর্পণ করিয়া বলিলেন ;—

"তুমি যে করাইলে এই পুলিন-ভোজন।
তোমায় কৃপা করি চৈতন্য কৈলা আগমন ॥
কৃপা করি কৈল দুগ্ধ চিপীট ভক্ষণ।
নৃত্য দেখি রাত্রে কৈল প্রসাদ ভোজন ॥
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে ॥
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
অন্তরঙ্গ ভৃত্য বলি রাখিবেন চরণে ॥
নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন ভবনে।
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য-চরণে ॥"—(ঐ)

সকল ভক্তগণ তখন রঘুনাথকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ তাঁহাদের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া এবং শ্রীরাঘব পণ্ডিতের সহিত নিভৃতে পরামর্শ করিয়া এক শত মুদ্রা এবং ৭ তোলা সুবর্ণ মহান্তগণের দক্ষিণাস্বরূপ নিত্যানন্দ প্রভুর ভাণ্ডারীর হস্তে প্রদান করিলেন এবং প্রভু যাহাতে এ সংবাদ জানিতে না পারেন, তাহার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন।

ইহার পর রাঘব পণ্ডিত মহাশয় রঘুনাথকে স্বীয় ভবনে লইয়া গিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করাইলেন এবং প্রসাদি মাল্য-চন্দন ও পাথেয়স্বরূপ প্রচুর প্রসাদাদি সঙ্গে দিয়া সজল-নয়নে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। রঘুনাথ দাস রাঘবের চরণধূলি গ্রহণ করতঃ প্রেমানন্দে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন ;—

"তাঁর পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা।
নিত্যানন্দ-কৃপায় আপনাকে কৃতার্থ মানিলা ॥"—(ঐ)

রাঘব-মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আগমন

"এক দিনে নৌকা আইল পানিহাটী গ্রাম।
ভক্ত সঙ্গে নৌকা হইতে নামে ভগবান ॥"—(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক)

এই সেই পানিহাটী! ঐ সেই প্রভুর আনন্দ-বিশ্রামের স্থান রাঘব-মন্দির! ঐ সেই ভাগীরথীতীরে প্রাচীন ৫০০ বৎসরের বটবৃক্ষ! উহারই দক্ষিণ পার্শ্বে ইষ্টক-নির্ম্মিত ঐ ভগ্ন

ঘাট! এই ঘাটেই দেবেন্দ্র-মুনীন্দ্রের সাধনার ধন প্রভুর শ্রীচরণ-ধূলি পতিত হইয়াছিল। ধন্য পানিহাটী তোমার তপস্যা-বলকে! আর আমরাও ধন্য তোমার ক্রোড়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং ভগবান্ মানবরূপে আমাদের বাস-ভবনের পার্শ্বে আসিয়াছিলেন, এ কথা মনে আসিলেও আনন্দে অধীর হই।

নীলাচলধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবন গমন-মানসে মহাপ্রভু যখন বহির্গত হইলেন, তখন উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি মহাভাগবত গজপতি প্রতাপরুদ্র তাঁহার রাজ্যের মধ্যে যে যে পথ দিয়া প্রভু গমন করিবেন, সেই সমস্ত পথ সুসজ্জিত করিয়া এবং বিবিধ অনুষ্ঠানে তাঁহার যাত্রার সুবিধা করিয়া দিয়া নিজে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু রামানন্দ রায়, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে উড়িষ্যার শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া সাশ্রুনয়নে ভক্তদের বিদায় দিলেন। এইবার মুসলমান-অধিকার। বিশেষ সেই সময় প্রতাপরুদ্রের সহিত মুসলমান বাদসাহের সহিত যুদ্ধ হইতেছিল। সে কারণ এক রাজ্য হইতে অপর রাজ্যে যাইবার পক্ষে বড়ই অসুবিধা। এই মুসলমান-অধিকার পার না হইলে অন্যত্র যাইবার উপায় নাই; তাই লীলা-ময় প্রভু এ স্থলে এক লীলা প্রকাশ করিলেন। সেই লীলার ফলে সেই দেশের এক জন সম্ভ্রান্ত যবন রাজকর্ম্মচারী প্রভুর পরম ভক্ত হইয়া বৈষ্ণব হইলেন এবং নিজে নৌকাদি সংগ্রহ করিয়া প্রভুকে তাহাতে আরোহণ করাইলেন, আরও জলদস্যুর ভয়ে অপর কতকগুলি নৌকাতে সৈন্য-সামন্ত পুরিয়া স্বয়ং প্রহরিস্বরূপ থাকিয়া প্রভুর সঙ্গে পিছলদা পর্য্যন্ত আসি-লেন। মহাপ্রভু পিছলদা পর্য্যন্ত আসিয়া ভক্ত মুসলমানকে সৈন্য-সামন্ত সহ বিদায় দিলেন। যবন-রাজকর্ম্মচারী প্রভুর সঙ্গ ছাড়িয়া কোন মতে যাইতে চাহেন না। তিনি,—

"উচ্চৈঃস্বরে হরি বলি কান্দে ফুকারিয়া।
মহাভাগবত হৈলা প্রভু-কৃপা পাঞা॥
ছাড়িয়া না যায় ম্লেচ্ছ কান্দিতে লাগিল।
বহু যত্নে প্রভু তারে বিদায় করিল॥"—(ঐ)

পিছলদা হইতে স্বতন্ত্র নৌকাযোগে এক দিনেই প্রভু পানিহাটী আসিয়া পৌঁছিলেন। অতি আশ্চর্য্য ঘটনা, নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিবা মাত্র কোথা হইতে অসংখ্য লোক প্রভুকে দেখিবার জন্য সমুদয় স্থান পূর্ণ করিয়া ফেলিল। লোকের হুড়াহুড়িতে এবং প্রত্যেকের মুখে "জয় গৌর হরি, জয় গৌর হরি" শব্দে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। প্রভু লোক-সংঘট্টে উপরে উঠিতে পারিতেছিলেন না। এই সময়ের চিত্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। মহানুভব প্রেমদাসকৃত অনুবাদ হইতে সামান্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি;—

"এক দিনে নৌকা আইল পানিহাটী গ্রাম।
ভক্ত সঙ্গে নৌকা হইতে নামে ভগবান্॥

রাজা কহে সার্ব্বভৌম সে গ্রামে কে হয়।
কি নিমিত্ত তথা প্রভু করিল বিজয়॥
ভট্ট কহে তথা আছে রাঘব পণ্ডিত।
পরম মহান্ত তিঁহো জগতে বিদিত॥
বার্ত্তাহারী লোক কহে শুন ভট্টাচার্য্য।
সেই গ্রামে যাইতে হৈল পরম আশ্চর্য্য॥
রাজা কহে কি আশ্চর্য্য হইল তাহা বল।
লোক কহে নরদেব শুন যে দেখিল॥
গঙ্গাতীর-সীমা প্রভু যেই মাত্র গেলা।
অকস্মাৎ কোথা হৈতে লোকময় হৈলা॥
যত লোক আইল তাহা কহিতে না পারি।
এই কথা শুনি মনে কহিবে বিচারি॥
ধরণীতে ধূলিরাশি যতেক আছিল।
হেন বুঝি সেই সব লোকময় হৈল॥
অথবা আকাশে ছিল যত তারাগণ।
নর হঞা পৃথিবীতে করিল গমন॥
গৌরহরি বলি লোকে চতুর্দ্দিকে ধায়।
চলিবারে মহাপ্রভু পথ নাহি পায়॥
বহু কষ্টে আইলা রাঘবের ঘরে।
রাঘব ডুবিলা মহা আনন্দসাগরে॥
সে রাত্রি রহিলা প্রভু তাঁহার মন্দিরে।
নানা যত্নে নানা সেবা করিল প্রভুরে॥"

রাঘব শশব্যস্তে গললগ্নীকৃতবাসে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রভু ভাগ্যবান্ নাবিককে নিজ পরিধানের বস্ত্র প্রদান করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করতঃ রাঘব সঙ্গে ভিড়ের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এতদঞ্চলের লোকসমূহ নদীয়া অবতারের সংবাদ কেবল লোকমুখে শুনিয়াই আসিতেছিলেন। আজ তাঁহারা স্বচক্ষে প্রভুকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তাঁহাদের ভববন্ধন মোচন হইয়া গেল। প্রভুর সকরুণ দৃষ্টিপাতে সকলেই প্রেম লাভ করিলেন। রাঘব আনন্দ-পাথারে হাবুডুবু খাইতে খাইতে সানুচরে প্রভুর সেবাদির পারিপাট্য করিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। এক দিবস মহাপ্রভু এখানে অবস্থিতি করিয়া স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত উদ্ধার করতঃ পর দিন প্রাতে কুমারহট্টে শ্রীনিবাস-সমীপে গমন করিলেন।

এ স্থানে একটি আপাত বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে এবং

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গৌড়ে আগমনকালীন শ্রীপাট পানিহাটীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন লিখিত আছে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে ইহার বিপরীত অর্থাৎ প্রভুর গৌড় হইতে নীলাচলে ফিরিয়া যাইবার সময় পানিহাটীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, লিখিত আছে। এই অসামঞ্জস্য ঘটনার মীমাংসা কি ?

মীমাংসা অতি সহজ। শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে যাহা লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পুনরুক্তি-ভয়ে সে সব কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন নাই। এ কথা উভয় গ্রন্থেই পাওয়া যায়। বস্তুতঃ নীলাচল হইতে আসিবার সময় ও তথায় যাইবার সময় উভয় সময়েই প্রভু পানিহাটীতে পদধূলি দিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীক্ষেত্র হইতে শ্রীবৃন্দাবন বা গৌড় যাত্রার বিবরণে পানিহাটীতে প্রভুর পূর্ব্বোক্ত অবস্থিতি-কাহিনী বর্ণন করিয়া পরে লিখিতেছেন,—

"তথা হৈতে প্রভু যৈছে গৌড়েরে চলিলা।
তবে রামকেলী গ্রামে প্রভু যৈছে গেলা ॥

* * *

নাটশালা হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি আইলা।
লোকভিড়-ভয়ে বৃন্দাবনে নাহি গেলা ॥
শান্তিপুরে পুনঃ কৈলা দশ দিন বাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ॥
অতএব ইহাঁ তার না কৈল বিস্তার।
পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাঢ়য়ে অপার ॥"—(চরিতামৃত, মধ্য, ১৬ পরিচ্ছেদ)

এ জন্য চরিতামৃতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে পানিহাটীতে অবস্থিতি-কাহিনী আদৌ উল্লেখ নাই।

আবার শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদির লিখিত পানিহাটীর বিবরণ চৈতন্য-ভাগবতে উল্লেখ না করিয়া অতি সংক্ষেপে দুই কথায় নীলাচল হইতে গৌড়ে আগমন-কাহিনী সমাপন করিয়াছেন। যথা,—

"ঠাকুর থাকিয়া কত দিন নীলাচলে।
পুন গৌড় দেশে আইলেন কুতূহলে ॥"—(চৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৩ অঃ)

তাহা হইলে উক্ত দুই সময়েই প্রভুর পানিহাটীতে আগমন-কাহিনী দুইখানি গ্রন্থ দ্বারা বেশ স্পষ্ট বুঝা গেল।

শ্রীবৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রভুর শ্রীক্ষেত্রে পুনরায় গমনসময়ে পানিহাটীতে অবস্থানের কথা অতি মধুরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ রাঘব-চরিত্রের অনেক কথা ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। সেই সব মহাশক্তিসম্পন্ন পয়ারগুলি ভক্তমনোরঞ্জন জন্য অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি।

"কথো দিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পানিহাটী রাঘব-মন্দিরে ॥
কৃষ্ণ-কার্য্যে আছেন শ্রীরাঘব পণ্ডিত।
সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইলা বিদিত ॥
প্রাণনাথ দেখিয়া শ্রীরাঘব পণ্ডিত।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা পৃথিবীত ॥
দৃঢ় করি ধরি রমা-বল্লভ-চরণ।
আনন্দে রাঘবানন্দ করেন ক্রন্দন ॥
প্রভুও রাঘব পণ্ডিতেরে করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নয়নের জলে ॥
হেন সে আনন্দ হৈল রাঘব-শরীরে।
কোন্ বিধি করিবেন কিছুই না স্ফুরে ॥
রাঘবের ভক্তি দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
রাঘবেরে করিলেন শুভ দৃষ্টিপাত ॥
প্রভু বোলে রাঘবের আলয়ে আসিয়া।
পাসরিলুঁ সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া ॥
গঙ্গায় মজ্জন হৈলে যে সন্তোষ হয়।
সেই সুখ পাইলাঙ রাঘব আলয় ॥
হাসি বোলে প্রভু "শুন রাঘব পণ্ডিত।
কৃষ্ণের রন্ধন গিয়া করহ ত্বরিত ॥"
আজ্ঞা পাই শ্রীরাঘব পরম সন্তোষে।
চলিলেন রন্ধন করিতে প্রেমরসে ॥
চিত্তবৃত্তি যতেক মানস আপনার।
সেইরূপে পাক বিপ্র করিলা অপার ॥
আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
নিত্যানন্দ সঙ্গে আর যত আপ্তগণ ॥
ভোজন করেন গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীকান্ত।
সকল ব্যঞ্জন প্রভু প্রশংসে একান্ত ॥
প্রভু বোলে রাঘবের কি সুন্দর পাক।
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক ॥
রাঘবো প্রভুর প্রীত শাকেতে জানিঞা।
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিঞা ॥

এই মত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন আসি প্রভু করি আচমন ॥"

— ভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

এই সময় গদাধর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস প্রভৃতি যেখানে যত অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন, সকলেই প্রভুর আগমন-বার্ত্তা পাইয়া রাঘব-মন্দিরে ধাইয়া আসিলেন। দয়ার অবতার প্রভু সকলকেই শুভাশীর্ব্বাদ দিতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রভুকে পাইয়া আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন।

"পানিহাটী গ্রামে হৈল পরম আনন্দ।
আপনে সাক্ষাতে যথা প্রভু গৌরচন্দ্র ॥"—(ঐ)

পরে মহাপ্রভু রাঘব পণ্ডিতকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিতে লাগিলেন ;—

"রাঘব পণ্ডিত প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর।
নিভৃতে করিলা কিছু রহস্য উত্তর ॥
"রাঘব! তোমারে আমি নিজ গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বই ॥
এই নিত্যানন্দ যেই করায়েন্ আমারে।
সে-ই করি আমি, এই বলিল তোমারে ॥

*   *   *   *

যেই আমি, সেই নিত্যানন্দ, ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই ॥
মহাযোগেশ্বরো যাহা পাইতে দুর্ল্লভ।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা হইব সুলভ ॥
এতেকে হইয়া তুমি মহা সাবধান।
নিত্যানন্দ সেবিহ—যে হেন ভগবান ॥"—(ঐ)

ইহার পর পণ্ডিত মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য শ্রীমকরধ্বজ কর প্রতি মহাপ্রভু বলিলেন—"মকরধ্বজ, তুমি ভাগ্যবান্, কায়মনোবাক্যে রাঘব পণ্ডিতের সেবা করিও। তুমি রাঘব প্রতি যাহা করিবে, তৎসমুদয় আমারই প্রতি করা হইতেছে, ইহা নিশ্চিত জানিও।"

"হেন মতে পানিহাটী গ্রাম ধন্য করি।
আছিলেন কথো দিন শ্রীগৌরাঙ্গ হরি ॥"

—ভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

রাঘবের ঝালি এবং মহানিষ্ঠায় শ্রীবিগ্রহ-সেবা

"রাঘব পণ্ডিত চলিলা ঝালি সাজাইয়া"

—(চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ১০ম পরিঃ)

রাঘব পণ্ডিত প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া পুরীধামে শ্রীগৌরাঙ্গদর্শনে যাইতেন। এ সময় তাঁহার সঙ্গে কতকগুলি মোট যাইত, তাহারই নাম "রাঘবের ঝালি।" পণ্ডিত মহারাজ এবং তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী দেবী অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে মহাপ্রভুর এক বৎসরের সেবার উপযোগী নানাবিধ স্থায়ী লাড়ু, মিষ্টান্ন ও আচারাদি প্রস্তুত করিয়া এই মোটগুলি পূর্ণ করিতেন। সেই অপূর্ব্ব ঝালির বিবরণ এই বার শ্রবণ করাইব।

ঝালির মধ্যে আমের কাসুন্দি, আমসি, আম্রখণ্ড, আম্রতৈল, আম্রকলির আচার, ঝাল আদা, নেবু আদা ইত্যাদি প্রায় এক শত প্রকার কেবল আচার। এইরূপ;—

"ধনিয়া মহুরী তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া।
লাড়ু বান্ধিয়াছে চিনিপাক করিয়া॥
শুণ্ঠিখণ্ড লাড়ু আর আমপিত্তহর।
পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি বস্ত্রের কোথলী ভিতর॥
কোলিশুণ্ঠি কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর।
কত নাম লইব শত প্রকার আচার॥
নারিকেলখণ্ড লাড়ু আর লাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার।
অমৃত কর্পূর-আদি অনেক প্রকার॥
শালি কাঁচুটি ধান্যের আতব চিড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় থলী সব ভরি॥
কথোক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাকে লাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥

* * *

ফুট কলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভিজাইল।
চিনিপাকে কর্পূরাদি দিয়া লাড়ু কৈল।
কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার।
ঐছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহস্র প্রকার॥

রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী।
দুঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম শকতি॥
গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছাকিয়া।
পাঁপড়ি করিয়া লৈল গন্ধদ্রব্য দিয়া॥
পাতল মৃৎপাত্রে সন্ধানাদি নিল ভরি।
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কোথলী॥
সামান্য ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি করাইল।
পরিপাটি করি সব ঝালি ভরাইল॥
ঝালি বান্ধি মোর দিল আগ্রহ করিয়া।
তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রমশ করিয়া॥
সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির বিচার।
'রাঘবের ঝালি' বলি বিখ্যাতি যাহার॥—(ঐ)

পাছে কোন দিন মহাপ্রভুর গুরু ভোজন জন্য উদরে আম হয়, এ জন্য ভক্তিমতী দময়ন্তী দেবী—

"যত্ন করি শুণ্ডি করি পুরাণ সুকুতা॥
সুকুতা বলিয়া অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে।
সুকুতায় যে সুখ প্রভুর, তাহা নহে পঞ্চামৃতে॥
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহ মাত্র লয়।
সুকুতা পাতা কাসুন্দীতে মহা সুখ পায়॥
মনুষ্যবুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
গুরুভোজনে উদরে কভু আম হঞা যায়॥
সুকুতা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ।
এই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস॥"

এই সব দ্রব্যের ভার মকরধ্বজ করের উপর অর্পিত হইত। তিন জন বাহক লইয়া কর মহাশয় প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞানে শ্রীপুরুষোত্তমে ঝালি পৌঁছাইয়া দিতেন। প্রভুর সন্নিধানে ঝালি পৌঁছিলে তিনি সাগ্রহে সকল দ্রব্যের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আস্বাদ লইয়া গোবিন্দকে অতি যত্নের সহিত উহা রক্ষা করিতে আজ্ঞা দিতেন। কারণ, এ সব সামগ্রী বৎসরাবধি প্রভুর ভোগে ব্যবহৃত হইবে।

"রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল॥
সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ কৈল।
স্বাদু সুগন্ধি দেখি বহু প্রশংসিল॥
বৎসরের তরে আর রাখিল ধরিয়া।—(ঐ)

সর্ব্বপ্রথমেই উক্ত হইয়াছে, মাধব ঘোষ আধখানি হরীতকী সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, এ জন্য প্রভু বৈরাগ্যের হানি বিবেচনা করিয়া মাধবকে উপদেশ দিয়াছিলেন; সেই আদর্শ-প্রভু রাঘবের অপূর্ব্ব প্রেম-ভক্তির নিকট আজ পরাজিত হইয়া গৃহীর ন্যায় সমুদয় খাদ্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। রাঘবের শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রীতি এতই উচ্চ!

শ্রীশ্রীমদনমোহন-সেবা

এই বার শ্রীরাঘবের অতুলনীয় সেবা-নিষ্ঠার বিষয় উত্থাপন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। এই সেবা-নিষ্ঠার বিষয় স্বয়ং মহাপ্রভু পুরীধামে সকল ভক্তগণ সমক্ষে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

রাঘব-গৃহে অতি অপরূপ মূর্ত্তি শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ বিরাজিত। এমন মনোহর মূর্ত্তি আর কোথাও আছে কি না, সন্দেহ। মদনমোহন ত প্রকৃতই মদনমোহন। রাঘবের উদ্যানে শত শত নারিকেল বৃক্ষ; তাহাতে কতই না ফল ফলিতেছে। সমুদয়ই শ্রীকৃষ্ণের ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যদি তিনি শ্রবণ করেন যে, অমুক গ্রামে বৃহৎ এবং সুমিষ্ট নারিকেল পাওয়া যাইবে, তাহা হইলে সে গ্রাম ১০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী হইলেও এবং চারি পণ অবধি কড়ি দিয়াও সেই নারিকেল ক্রয় করিয়া আনাইয়া ঠাকুরকে অর্পণ করিতেন।

প্রতি দিন ৫।৭টি নারিকেল ছুলিয়া শীতল জলে ডুবাইয়া রাখা হইত। ভোগের সময় তাহাদের পুনরায় সংস্কার করিয়া মুখটি ছিদ্র করতঃ শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইত। রাঘবের অচলা ভক্তিতে;—

> কৃষ্ণ সেই নারিকেল-জল পান করি।
> কভু শূন্য রাখেন কভু জল ভরি॥

শ্রীকৃষ্ণ জল পান করিলে পর রাঘব প্রেমানন্দে শস্যগুলি বাহির করতঃ বহুতর পাত্রে সুসজ্জিত করিয়া পুনরায় তাহাতে শ্রীতুলসী দিয়া ভগবান্‌কে ডাকিতেন। ভক্তের ভগবান্ পুনরায় শস্যগুলি ভোজন করিতেন।

এক দিন জনৈক সেবক ১০টি নারিকেল লইয়া ভোগ দিতে আসিলেন। দৈবাৎ দরজার উপরের ভিতে তাঁহার হাত স্পর্শ হইয়াছিল এবং সেই হস্তে তিনি নারিকেলগুলি স্পর্শ করাতে পণ্ডিত মহারাজ তাহা দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেইগুলি ফেলিয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। কারণ, দরজা দিয়া লোকের গতায়াত-সময় পায়ের ধূলা বায়ুতে উড়িয়া উপরের ভিতে লাগিয়াছে, ভিতের উপর হাত দিয়া নারিকেলে হস্ত দেওয়াতে তাহাতেও পদধূলি লাগিল এবং সে কারণ উহা কৃষ্ণ-সেবার অযোগ্য হইল। পুনরায় অন্য নারিকেল আনাইয়া অতি পবিত্র ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উৎসর্গীকৃত হইলে পণ্ডিত মহাশয় তৃপ্ত হইলেন।

কেবল যে নারিকেল এইরূপ ভাবে চড়া দাম দিয়া ও দূর দেশ হইতে আনাইয়া ভোগ দিতেন, তাহা নহে; কলা, আম্র, কাঁটাল প্রভৃতি সুমিষ্ট ফলের বিষয় কিম্বা রন্ধনের উপযোগী ফল-মূল, শাক-সবজির বিষয়, আরও চিড়া, হুড়ুম, সন্দেশ, মিষ্টান্ন ক্ষীর, ওদন, কাশীমর্দ্দি, আচারাদি এবং গন্ধ, বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি দ্রব্যের সংবাদ শ্রবণ মাত্রেই সাগ্রহে আনয়ন করিতেন ও শ্রীমদনমোহন জীউকে অর্পণ করিতেন।

রাঘবের এইরূপ সেবা-পারিপাট্যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব চিরতরে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পণ্ডিত মহারাজ নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া শ্রীশ্রীমদনমোহনকে যেরূপ ভাবে ভোগ দিতেন, ঐরূপ পৃথক্ পাত্রে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্য একটি ভোগ দিতেন। রাঘবের ঐকান্তিক ভক্তিতে মহাপ্রভু মধ্যে মধ্যে শ্রীরাঘবকে দর্শন দিয়া তাঁহার প্রদত্ত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া যাইতেন।

রাঘব যখন সজল-নয়নে মহাপ্রভুকে ভোগে বসিবার জন্য ডাকিতেন, তিনি তখন নীলাচলে ৫২ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া রাঘব-মন্দিরে ছুটিয়া আসিতেন। প্রভু ইহা স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। ধন্য ধন্য শ্রীল রাঘব পণ্ডিত মহারাজ!

বড়ই পরিতাপের বিষয়, বৈষ্ণব গ্রন্থে এই যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ ব্যতিরেকে রাঘব পণ্ডিতের পরিচয় আর কিছুই পাওয়া যায় না। সে কারণ তাঁহার উচ্চ প্রেম-ভক্তির কত বিবরণই না অন্ধকারে রহিয়া গেল।

শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউয়ের শ্রীমন্দির এখনও সুন্দর অবস্থায় আছে এবং এই মহাপ্রেমিকের সমাধিবেদী শ্রীমন্দিরের পশ্চিম দিকে বর্ত্তমান। তদুপরি মালতী-কুঞ্জ। রাশি রাশি মালতী ফুলে এবং তাহার সুগন্ধে প্রকৃতি দেবী অদ্যাবধিও রাঘবকে ভক্তি-উপহারে ভূষিত করিতেছেন।

শ্রীঅমূল্যধন রায়

নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি*

বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, পদাবলী-সাহিত্যে "নেহ" ও "লেহ" শব্দের প্রয়োগ কত অধিক। নেহ শব্দের মূল কি এবং কোন্ ভাষা হইতে এই শব্দটিকে পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিতে আমাদের অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না। এ সম্বন্ধে বোধ হয়, অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রাকৃত ভাষা হইতেই যে এই শব্দটিকে পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা অনায়াসে স্বীকার করিতে বোধ হয়, কেহই আপত্তি করিবেন না। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা প্রাকৃত ভাষা হইতে নিম্নে নেহ শব্দের দুইটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম,—

সব্ভাবণেহভরিএ রত্তে রজ্জিজ্জই ত্তি জুত্তমিণম্।
সদ্ভাবস্নেহভরিতে রক্তে রজ্যত ইতি যুক্তমিদম্॥

—গাথাসপ্তশতী, ১।৪১।

বন্ধবণেহব্ভহিও হোই পরোবি বিণএণ সেবিজ্জন্তো।
বান্ধবস্নেহাভ্যধিকো ভবতি পরোপি বিনয়েন সেব্যমানঃ॥

—সেতুবন্ধ, ৩।২৮।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা গেল যে, ণেহ শব্দটি খাঁটি প্রাকৃত। সংস্কৃতে যেখানে স্নেহ শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে, প্রাকৃতে সেই স্থলে ণেহ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; সুতরাং প্রাকৃত ভাষা হইতেই যে এই শব্দটিকে পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু আপত্তি হইতে পারে যে, প্রাকৃতে ণেহ শব্দ লিখিতে ণ-কারের ব্যবহার হয়, বাঙ্গালায় উহা ন-কারে পরিণত হইল কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে এ স্থলে কয়েকটি অবান্তর কথার আলোচনা করিতে হইবে এবং তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির বানানের কথাও এখানে আসিয়া পড়িবে।

দুই একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি লইয়া যাঁহারা একটু নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, প্রাচীন পুথির বানান বর্ত্তমানে প্রচলিত বাঙ্গালার অনুরূপ নহে। প্রচলিত বাঙ্গালায় শশী, শীষ, শেষ, শুভ্র, শুন (ধাতু), শেজ স্থলে অনেক পুথিতেই সসি, সীস, সেস, সুন, সুন (ধাতু), সেজ লিখিত দেখা যায়। অনেকে ইহা লিপিকরের ভ্রম বলিয়া সহজেই ইহার একটা সুমীমাংসা করিয়া নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু আমাদের মত এইরূপ সিদ্ধান্তের অনুকূলে নহে। কেন না, অদ্যাবধি যেখানে যত বাঙ্গালা পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোন পুথির সহিতই যখন বর্ত্তমান বানানের অবিকল মিল নাই, তখন বিশেষ ভাবে বিচার

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২২শ, ৯ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

না করিয়া, সকল লিপিকরকেই মূর্খ বলিয়া বিবেচনা করা আমাদের ন্যায়-সঙ্গত মনে হয় না। পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত যে পুথিকে অনেকে চণ্ডীদাসের জীবিতকালে লিখিত বলিয়া অনুমান করেন এবং কেহ কেহ যে পুথিকে চণ্ডীদাসের স্বহস্ত-লিখিত বলিতেও কুণ্ঠিত নহেন, সেই পুথিতেও যখন আমরা এইরূপ বানান পাইতেছি, তখন ইহা লিপিকর-ভ্রম বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত কি না, সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন। অবশ্য লিপিকরগণ যে অভ্রান্ত বা মূর্খ লোকে মোটেই পুথি লিখিত না, এ কথা আমরা বলিতেছি না। প্রাচীন পুথিতে ভূরি ভূরি লিপিকরের ভ্রম দৃষ্ট হইবে এবং স্থানে স্থানে এরূপ ভ্রমের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাতে কবির কবিত্ব পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কিন্তু লিপিকরের ভ্রমের সহিত যদি আমরা প্রাচীন পুথির সমস্ত বানানই পরিবর্ত্তন করিয়া দেই, তাহা হইলে বোধ হয়, আমাদের প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করা হইবে না। কেন না, প্রাচীন বাঙ্গালার বানান কেবল সংস্কৃতের অনুরূপ ছিল না।

আজ পর্য্যন্ত বঙ্গাক্ষরে লিখিত বঙ্গভাষার যে সকল প্রাচীন পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহোদয় কর্তৃক সংগৃহীত "চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়" গ্রন্থ তন্মধ্যে সুপ্রাচীন*। এই গ্রন্থের বানান-পদ্ধতি আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রাচীন বাঙ্গালার বানান প্রাকৃতের অনুরূপ ছিল এবং বঙ্গভাষা প্রাকৃত ভাষা হইতেই উৎপন্ন। পাঠকগণের অবগতির জন্য উক্ত গ্রন্থ হইতে আমরা কয়েকটি শব্দ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। প্রাকৃতের সহিত বঙ্গভাষার কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, ইহাতে তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

প্রাচীন বাঙ্গালা—	প্রাকৃত—
সঅল	সঅল
গঅণ	গঅণ
তিহুবণ	তিহুঅণ
ণিঅড়	ণিঅড়
নেউর	ণেউর
রঅণ	রঅণ
লোঅ	লোঅ
সীস	সীস
সুহে	সুহ
মুহ	মুহ
ণই	ণই
জউনা	জউণা

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২২শ ভাগ, ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু কর্তৃক সংগৃহীত কৃষ্ণকীর্ত্তন নামক পুথিতেও আমরা প্রাকৃতের প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারি। এই সকল কারণে আমাদের বোধ হয়, প্রাচীন বঙ্গভাষার বানান-প্রণালী প্রাকৃতেরই অনুরূপ ছিল এবং বঙ্গভাষা প্রধানতঃ প্রাকৃত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং প্রাচীন পুথির বানানকে লিপিকরের ভ্রম মনে করিয়া বর্ত্তমান রীতি অনুসারে বিশুদ্ধ করা আমাদের সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না এবং এইরূপ শুদ্ধ করিতে যাইয়াই প্রাকৃত "ণেহ" শব্দের ণ-কার ন-কারে পরিণত হইয়াছে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।*

"লেহ" শব্দটির মূল কি, এ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে কেহ কোন আলোচনা করিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। করিয়া থাকিলেও আমরা তাহা অবগত নহি। সংপ্রতি প্রাচীন সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, পদাবলী-সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় এই শব্দটির উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করিয়াছেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে সতীশ বাবুর আলোচনাটি উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"প্রাচীন পুথির 'ল' ও 'ন' অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। লিপিকরদিগের অপ্রণিধানে অনেক স্থলেই সেই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি রক্ষিত না হওয়ায় 'ল' ও 'ন' অক্ষরের গোলযোগ হেতু পাঠ-বিকৃতির কারণ ঘটিয়াছে।

'ল' ও 'ন'-কারের গোলযোগের সর্ব্বপ্রধান দৃষ্টান্ত 'নেহ' ও 'লেহ' শব্দদ্বয়। সংস্কৃত স্নেহ শব্দের অপভ্রংশ হইতে সিনেহ ও নেহ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। পদাবলি-সাহিত্যের হস্তলিখিত ও মুদ্রিত গ্রন্থে 'সুলেহ' ও 'লেহ' শব্দেরও বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় 'সুলেহ' ও 'লেহ' শব্দ অশুদ্ধ বিবেচনায় সর্ব্বত্রই 'সিনেহ' ও 'নেহ' লিখিয়াছেন। আমাদিগের বোধ হয়, 'সিনেহ' ও 'নেহ' রূপ দুইটিই প্রাচীনতর। সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থালয়ে রক্ষিত পদকল্পতরুর একখানা পুথিতে আমরা কোথায়ও 'লেহ' বা 'সুলেহ' শব্দ পাই নাই, উহাদিগের পরিবর্ত্তে 'নেহ' ও 'সুনেহ' পাইয়াছি। হিন্দী ও মৈথিল সাহিত্যেও 'নেহ' শব্দেরই প্রয়োগ দৃষ্ট হয় ; সুতরাং ল ও ন অক্ষরের গোলযোগ হইতেই প্রথমে লেহ ও সুলেহ শব্দ দুইটির উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিলে এইরূপ ভ্রান্ত সাদৃশ্যের (false analogy) অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যে শব্দ একবার ভাষায় চলিয়া গিয়াছে, তাহা ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ না হইলেও তাহা পরিত্যাগ করা অসম্ভব।" ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুর এই কথা যে সুন্দর যুক্তিপূর্ণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনেক লিপিকর যে 'নেহ' শব্দের স্থলে ল ও নএর সাদৃশ্যবশতঃ 'লেহ' লিখিয়া থাকিবেন, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু পদাবলী-সাহিত্যে এই শব্দটির অতিশয় বাহুল্য

---

* সিদ্ধহেমচন্দ্র ৮।২।৭৭, ৮।২।১০২ সূত্রের টীকায় "নেহ" শব্দ পাওয়া গিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের প্রচলিত ভাষাসমূহে "ণ" স্থানে "ন"এর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

দেখিয়া স্বতই মনে হয়, ইহার কোনও মূল থাকিলেও থাকিতে পারে, সমস্ত লিপিকর কি একটি শব্দ সম্বন্ধে এতই ভুল করিয়াছেন? আর যে যে স্থলে লেহ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তথায় যেন লেহ শব্দই বেশ সুন্দর সঙ্গত হয়। নিম্নে "লেহ" শব্দের গুটিকয়েক দৃষ্টান্ত দিতেছি ;—

"সেই কৃষ্ণ হয় অখিল শকতি,
এই কৃষ্ণরূপে দেহা।
এই কৃষ্ণ হয় গোকুল-জীবন
যেই জন রাখে **লেহা**॥"

—চণ্ডীদাসের পদাবলী, সা-প সংস্করণ, ৩৯ পদ।

"সুন্দরি, বেকত গোপত **লেহা**।
বঞ্চিত আজু করণে নাহি পারবি
সাখি দেয়ল তুয়া দেহা॥ ধ্রু॥"—প-ক-ত, ২৩২ পদ।

"তবহুঁ জগত ভরি অকিরিতি এহ।
রাধামাধব অবিচল-**লেহ**॥"—প-ক-ত, ২৩৩ পদ।

উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত হইতে "লেহ" শব্দের বেশ সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায় এবং আরও অনেক গ্রন্থ হইতে এইরূপ ভূরি ভূরি প্রয়োগ দেখান যাইতে পারে। এখন কথা এই যে, এইরূপ একটা বহুবিস্তৃত শব্দকে কেবল লিপিকরের ভ্রমজাত বলিয়া স্বীকার না করিয়া, উহার কোন মূল অনুসন্ধান করা যায় কি না, তাহাই বিবেচনীয়। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু যে সব স্থলে ঐরূপ প্রয়োগ পাইয়াছেন, তাহা তিনি সমস্তই পরিবর্ত্তন করিয়া 'নেহ' করিয়া দিয়াছেন। পদকল্পতরুর সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু কিন্তু সে পথ অবলম্বন করেন নাই। তিনি নেহ ও লেহ উভয় প্রয়োগই রক্ষা করিয়াছেন। আমাদের বোধ হয়, এ বিষয়ে সতীশ বাবুই উৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, কেন না, তিনি লেহ শব্দটিকে অপপ্রয়োগ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেও উহার প্রাচীনত্ব বিবেচনা করিয়া, তাহাকে ত্যাগ করা সঙ্গত বোধ করেন নাই। সতীশ বাবুর এই রক্ষণশীলতা এবং তাঁহার এইরূপ আলোচনা হইতেই আমরা আজ এই শব্দটির মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার সুযোগ পাইলাম। এ জন্য সতীশ বাবুকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আমাদের বোধ হয়, "লেহ" শব্দের মূলানুসন্ধান ঐ প্রকারে না করিলেও চলিতে পারে। সাতবাহন-বিরচিত "গাথাসপ্তশতী" নামক গ্রন্থ প্রাকৃত-সাহিত্যের একখানি অতি চমৎকার বই। ঐ গ্রন্থে এবং প্রাকৃত অপরাপর গ্রন্থে আমরা "লেহলা" বলিয়া একটি শব্দ পাইয়াছি। উহার অর্থ—"লালসা"।

কহ তংপি তুই ণ ণাঅং জহ সা আসন্দিআণঁ বহুআণম্।
কাউণ উচ্চবচিঅং তুহ দংসণলেহলা পড়িআ॥
কথং তদপি ত্বয়া ন জ্ঞাতং যথা সা আসন্দিকানাং বহুনাম্।
কৃত্বা উচ্চাবচিকাং তব দর্শনলালসা পতিতা॥

—গাথাসপ্তশতী, ৭।৯৭।

অমরসিংহ তাঁহার কোষে লিখিয়াছেন,—"কামোঽভিলাষস্তর্ষশ্চ স মহাল্লালসা।" লালসা অর্থে অতিশয় আকাঙ্ক্ষা। মেদিনীকোষে লালসা শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—ঔৎসুক্য। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"দোহদং দৌহৃদং শ্রদ্ধা লালসা।" সুতরাং এই লেহলা শব্দের লা-লোপে 'লেহ' বা ল-লোপে 'লেহা' উপরিকথিত যে কোন অর্থে পদাবলী-সাহিত্যের লেহরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া আমাদের বোধ হয়। চণ্ডীদাসের পদাবলীর এক স্থলে আছে,—

সে হেন নাগর　　　　গুণের সাগর
জগৎ দুর্ল্লভ লেহা।
তু হেন নাগরী　　　　প্রেমের আগরী
কেন বাড়াইলি লেহা॥"

উপরিলিখিত পদাংশের যে দুই স্থলে লেহ শব্দ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, লালসা শব্দের কথিত অর্থ অসঙ্গত হইবে না। সখী কহিতেছেন,—সেই গুণের সাগর নাগর শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহাকে আকাঙ্ক্ষা করা জগতের (জগদ্বাসীর) পক্ষে দুর্ল্লভ, তুমি প্রেমিকার অগ্রগণ্যা নাগরী হইয়া কেন তাঁহাতে অভিলাষ বাড়াইলে? এই ঔৎসুক্য, অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা এবং শ্রদ্ধা অর্থ হইতেই পরে পদাবলী-সাহিত্যে স্নেহ, প্রীতি ও প্রেম অর্থে "লেহ" শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকিবে, এরূপ বিবেচনা করা, বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে না।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

সুশ্রুতে ধর্ম্মভাব*

আয়ুর্ব্বেদে কেবল শারীরিক বিষয় লইয়াই সমুচিত উপদেশ প্রদত্ত হইবে, ধর্ম্মাচরণের কোন কথা ইহাতে কেন থাকিবে, এইরূপ প্রশ্নে সনাতন ধর্ম্মবিশ্বাস অবলম্বনকারী কোন ব্যক্তিরই আস্থা থাকিতে পারে না। কারণ, ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেও পরলোকের প্রতি বিশ্বাস রাখিতে ও আস্তিকতা অবলম্বন করিতে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রেও এই জন্যই "দৈব" ও "মানুষ" এই উভয় প্রকার চিকিৎসার উল্লেখ করা হইয়াছে। সাধারণতঃ যে সকল ঔষধ ব্যবহার করিয়া রোগ প্রতীকার করা হইয়া থাকে, তাহাই "মানুষ" চিকিৎসা ; আর রোগের প্রতীকারের জন্য যে শান্তি ও স্বস্ত্যয়নাদি দৈব বিধান কৃত হইয়া থাকে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাহাই "দৈব" চিকিৎসা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

যাহা হউক, প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতাতে যেরূপ ধর্ম্মভাবের উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পরিলোচনা দ্বারা প্রাচীনগণ কিরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে তাঁহাদের কিরূপ মতি ও গতি ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। বর্ত্তমানের এই নিবিড় অধর্ম্মসঙ্কট যুগে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের এই ধর্ম্মভাবও কথঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া সর্ব্বতোভাবে সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়।

১। আয়ুর্ব্বেদের অপৌরুষেয়ত্ব

বেদের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বাগ্রে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা কর্ত্তৃকই অভিব্যক্ত হয়। ভগবান্ ধন্বন্তরি এ বিষয়ে স্বশিষ্য সুশ্রুতকে বলিতেছেন,—

"ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্যানুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ শ্লোকশতসহস্রমধ্যায়সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভুঃ। ততোঽল্পায়ুষ্ট্বমল্পমেধস্ত্বঞ্চাবলোক্য নরাণাং ভূয়োঽষ্টধা প্রণীতবান্।"

(১অ° সূত্র)

আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ। প্রজা সৃষ্টির পূর্ব্বেই ভগবান্ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা এক সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেই আদিসংহিতাতে এক লক্ষ শ্লোক ও এক সহস্র অধ্যায় বর্ত্তমান ছিল। তাহার পরে মনুষ্যের অল্পায়ু বিবেচনা করিয়া, ব্রহ্মা স্বীয় ঐ সুবৃহৎ সংহিতাকে শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, বিষতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র ও বাজীকরণতন্ত্র এই আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদের গুরুপরম্পরার সমুল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—

"ব্রহ্মা প্রোবাচ, ততঃ প্রজাপতিরধিজগে, তস্মাদশ্বিনৌ, অশ্বিভ্যামিন্দ্রঃ, ইন্দ্রাদহম্।"—(১অ° সূত্র)

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২২শ, ৯ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

সর্ব্বপ্রথমে লোকগুরু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আয়ুর্ব্বেদ উপদিষ্ট হয়। ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রজাপতি দক্ষ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। দক্ষ হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদের নিকট হইতে এবং আমি (ধন্বন্তরি) ইন্দ্রের নিকটে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলাম।

২। আয়ুর্ব্বেদপাঠে পুণ্যসঞ্চয় ও ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তি

"স্বয়ম্ভুবা প্রোক্তমিদং সনাতনং পঠেদ্ধি যঃ কাশিপতিপ্রকাশিতম্।
স পুণ্যকর্ম্মা ভুবি পূজিতো নৃপৈরসুক্ষয়ে শক্রসলোকতাং ব্রজেৎ ॥"—(১অ° সূত্র°)

সনাতন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র সর্ব্বপ্রথমে লোকগুরু স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা প্রকাশ করেন। কাশীপতি ধন্বন্তরি পরম্পরাক্রমে তাহার প্রচার করেন। এই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র যিনি অধ্যয়ন করিবেন, সেই ব্যক্তির অক্ষয় পুণ্য সঞ্চিত হইবে; তিনি রাজগণ কর্ত্তৃক সুপূজিত হইবেন এবং নিজের দেহাবসানে পরলোকে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইবেন।

অন্যত্র দেখা যায়,—

"সহোত্তরং হ্যেতদধীত্য সর্ব্বং ব্রাহ্মাবিধানেন যথোদিতেন।
ন হীয়তেঽর্থান্মনসোঽভ্যুপেতাদেতদ্বচো ব্রাহ্ম্যমতীব সত্যম্ ॥" (৬৬ অ° উত্তর°)

ব্রহ্মা যেরূপ অধ্যয়ন-বিধির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি তাহা সম্যক্‌রূপে পরিপালন-পূর্ব্বক উত্তরতন্ত্র সহিত এই সমগ্র সুশ্রুত-সংহিতা অধ্যয়ন করিবেন, তিনি নিজ সাত্ত্বিক প্রকৃতির প্রভাব অনুসারে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাই সুসম্পন্ন হইবে;—কারণ, এই গ্রন্থমধ্যে অভ্রান্ত সত্য ব্রহ্মার বাক্যসমূহই উপনিবদ্ধ হইয়াছে।

৩। দীক্ষাবিধি

অধ্যয়ন-বিধির ব্যবস্থা প্রণয়নেও সুশ্রুত সনাতন বেদোক্ত অনুশাসনেরই অনুসরণ করিয়াছেন। যথা;—

"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যানামন্যতমং × × × ভিষক্ শিষ্যমুপনয়েৎ। ... ... উপনয়নীয়ন্তু ব্রাহ্মণঃ প্রশস্তেষু তিথিকরণমুহূর্ত্তনক্ষত্রেষু প্রশস্তায়াং দিশি শুচৌ সমে দেশে চতুর্হস্তং চতুরস্রং স্থণ্ডিলমুপলিপ্য গোময়েন দর্ভৈঃ সংস্তীর্য্য পুষ্পৈর্লাজভক্তৈ রত্নৈশ্চ দেবতাঃ পূজয়িত্বা বিপ্রান্ ভিষজশ্চ তত্রোল্লিখ্যাভ্যুক্ষ্য চ দক্ষিণতো ব্রহ্মানং স্থাপয়িত্বাগ্নিমুপসমাধায় ... ... হৌমিকেন বিধিনা স্রুবেনাজ্যাহুতীর্জুহুয়াৎ। সপ্রণবাভির্মহাব্যাহৃতিভিস্ততঃ প্রতি-দৈবতমৃষীংশ্চ স্বাহাকারঞ্চ কুর্য্যাৎ।" (২য় অ° সূত্র°)

ভিষক্, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকুলসম্ভূত যথোচিত গুণসম্পন্ন শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য দীক্ষা প্রদান করিবেন। কিন্তু স্বেচ্ছাচারে দীক্ষা প্রদান করা চলিবে না;—অধ্যয়ন-বিহিত তিথি, করণ, মুহূর্ত্ত, নক্ষত্র ও দিক্ প্রশস্ত হওয়া চাই। তাহার পরে বৈদিক বিধান অনুসারে যথাবিহিত স্থণ্ডিল, গোময়, দর্ভ, পুষ্প, লাজ, ভক্ত ও রত্ন প্রভৃতি দ্বারা দেবতা,

ব্রাহ্মণ ও ভিষগ্‌গণের অর্চ্চনা করিতে হইবে। যথাবিধানে সমিধাদি গ্রহণপূর্ব্বক প্রণব উচ্চারণে বেদবিহিত হোম-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

অধিকন্তু গুরু ও শিষ্য উভয়েই অগ্নি সাক্ষী পূর্ব্বক শপথ গ্রহণ করিবেন। শিষ্য কাম ও ক্রোধাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্যব্রত অবলম্বন করিবেন; দ্বিজ, গুরু, দরিদ্র, মিত্র, সন্ন্যাসী ও শরণাপন্ন ব্যক্তিগণকে নিজের ঔষধ দ্বারা নীরোগ করিবেন; কিন্তু পাপকার্য্যে সমাসক্ত লোকের রোগ প্রতীকার করিয়া, এ জগতে পাপ অনুষ্ঠানের সাহায্যকারী হইবেন না।

৪। অধ্যয়নের বিধি ও নিষেধ

"কৃষ্ণেঽষ্টমী তন্নিধনেঽহনী দ্বে কৃষ্ণেতরেঽপ্যেবমহর্দ্বিসন্ধ্যম্।
অকালবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুঘোষে স্বতন্ত্ররাষ্ট্রক্ষিতিপব্যথাসু॥
শ্মশানযানাস্তনাহবেষু মহোৎসবৌৎপাতিকদর্শনেষু।
নাধ্যেয়মন্যেষু চ যেষু বিপ্রা নাধীয়তে নাশুচিনা চ নিত্যম্॥"

(২ অ° সূত্রং)

কৃষ্ণ ও শুক্ল উভয় পক্ষের অষ্টমী, পঞ্চদশী (অমাবাস্যা ও পূর্ণিমা), ত্রয়োদশী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে, দিনের উভয় সন্ধ্যাতে, অকাল-বিদ্যুৎ উন্মেষে, অসাময়িক মেঘগর্জ্জনে, পারিবারিক বিপত্তিতে, রাজ্যের বা রাজার কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, শ্মশানভূমিতে, কোনরূপ যান আরোহণে, বধ্যভূমিতে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র, কুবের, মদন ও কৌমুদী প্রভৃতি মহোৎসব ব্যাপারে, ধূমকেতু বা উল্কাপাত প্রভৃতি উৎপাত প্রাদুর্ভূত হইলে এবং সর্ব্বথা অশুচি অবস্থায় অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ। অধিকন্তু এতদ্ভিন্ন অন্য যে সকল দিনে ব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন করেন না, সেই সকল দিনও অনধ্যায় বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পরিগণিত হইয়াছে।

৫। রক্ষাকর্ম্ম

সুশ্রুতে রোগীর রক্ষাবিধানের জন্য যে শ্লোকগুলি উপনিবদ্ধ দেখা যায়, তৎপাঠেও ইহার দৃঢ় প্রতীতি হয়, প্রাচীন কালে কোন কর্ম্মই ধর্ম্মের ছায়া-বিবর্জ্জিত করিয়া কৃত হইত না। আর্য্যগণ প্রত্যেক কার্য্যেই ধর্ম্মের সংস্রব রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এক ব্রহ্ম দ্বারাই এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল পরিব্যাপ্ত দেখিয়াছেন এবং সেই ব্রহ্মেরই বিভিন্ন শক্তিকে দেবতা-বিশেষরূপে পরিগণিত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যের সম্পাদকরূপে পরিবর্ণন করিয়াছেন; বাস্তবিক কিন্তু নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় শক্তিসমূহেই সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই পূর্ণ সত্তার স্ফুরণ তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন।

সুশ্রুতের রক্ষা-মন্ত্রগুলি এই;—

"কৃত্যানাং প্রতিঘাতার্থং তথা রক্ষোভয়স্য চ।
রক্ষাকর্ম্ম করিষ্যামি ব্রহ্মা তদনুমন্যতাম্॥

নাগাঃ পিশাচা গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো যক্ষরাক্ষসাঃ।
অভিদ্রবন্তি যে যে ত্বাং ব্রহ্মাস্তা ঘ্নন্তু তান্ সদা॥
পৃথিব্যামন্তরীক্ষে চ যে চরন্তি নিশাচরাঃ।
দিক্ষু বাস্তনিবাসাশ্চ পান্তু ত্বাং তে নমস্কৃতাঃ॥
পান্তু ত্বাং মুনয়ো ব্রাহ্ম্যা দিব্যা রাজর্ষয়স্তথা।
পর্ব্বতাশ্চৈব নদ্যশ্চ সর্ব্বাঃ সর্ব্বেঽপি সাগরাঃ॥
অগ্নী রক্ষতু তে জিহ্বাং প্রাণান্ বায়ুস্তথৈব চ।
সোমো ব্যানমপানং তে পর্জ্জন্যঃ পরিরক্ষতু॥
উদানং বিদ্যুতঃ পান্তু সমানং স্তনয়িত্নবঃ।
বলমিন্দ্রো বলপতির্ম্মনুর্মন্যে মতিং তথা॥
কামাংস্তে পান্তু গন্ধর্ব্বাঃ সত্ত্বমিন্দ্রোঽভিরক্ষতু।
প্রজ্ঞাং তে বরুণো রাজা সমুদ্রো নাভিমণ্ডলম্॥
চক্ষুঃ সূর্য্যো দিশঃ শ্রোত্রে চন্দ্রমাঃ পাতু তে মনঃ।
নক্ষত্রাণি সদা রূপং ছায়াং পান্তু নিশাস্তব॥
রেতস্ত্বাপ্যায়য়ন্ত্বাপো রোমাণ্যোষধয়স্তথা।
আকাশং খানি তে পাতু দেহং তব বসুন্ধরা॥
বৈশ্বানরঃ শিরঃ পাতু বিষ্ণুস্তব পরাক্রমম্।
পৌরুষং পুরুষশ্রেষ্ঠো ব্রহ্মাত্মানং ধ্রুবো ভ্রুবৌ।
এতা দেহে বিশেষেণ তব নিত্যা হি দেবতাঃ।
এতাস্ত্বাং সততং পান্তু দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুহি॥
স্বস্তি তে ভগবান্ ব্রহ্মা স্বস্তি দেবাশ্চ কুর্ব্বতাম্।
স্বস্তি তে চন্দ্রসূর্য্যৌ চ স্বস্তি নারদপর্ব্বতৌ॥
স্বস্ত্যগ্নিশ্চৈব বায়ুশ্চ স্বস্তি দেবাঃ সহেন্দ্রগাঃ॥
পিতামহকৃতা রক্ষা স্বস্ত্যায়ুর্ব্বর্দ্ধতাং তব।
ঈতয়স্তে প্রশাম্যন্তু সদা ভব গতব্যথঃ॥
ইতি স্বাহা॥" (৫ অ° সূত্র°)

প্রাচীন যুগে চিকিৎসকের কর্ত্তব্য সাধারণ—নিতান্ত ব্যবসায় মাত্র ছিল না। রোগের যন্ত্রণায় পরিপীড়িত মুহ্যমান ব্যক্তিকে চিকিৎসক পিতার ন্যায় এই সকল বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা আশ্বস্ত করিয়া তাহার রোগের দুর্ব্বিসহ ক্লেশসমূহ বিদূরিত করিতে কদাচ পরাঙ্মুখ হইতেন না। চিকিৎসক কেবল রোগের ব্যবস্থা করিয়াই নিজে রোগীর দায় হইতে পরিমুক্ত হইলেন, এইরূপ ভাবিতেন না; যাঁহার সহিত সকলের অস্তিত্ব, সেই পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরের প্রত্যেক সত্তার প্রতি রোগীর প্রকৃত শ্রদ্ধার উৎপাদন পূর্ব্বক তাহার দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ বলের

পরিবর্দ্ধনেই তিনি একান্ত প্রয়াস পাইতেন। এই অমৃতকল্প আর্ষ বিধানের অমোঘ ফলে ঈশ্বরের প্রতি আত্ম-সমর্পণ করিয়া, সম্পূর্ণ সত্ত্বগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক, বাস্তবিক পক্ষে রোগ-পরিক্লিষ্ট ব্যক্তিও আশাতিরিক্ত ফল প্রাপ্ত হইতেন;—ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া সত্ত্ব সত্ত্বই তাঁহার ব্যাধির ভীষণ আক্রমণ বিদূরিত হইয়া যাইত। উত্তরকালেও চিকিৎসকমণ্ডলী এই বৈদিক রক্ষামন্ত্র দ্বারা পীড়িতের ব্যাধিনিবারণে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। অধুনা যেন ধর্ম্মের সহিত মানবের সকল বন্ধনই পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বত্র ঐহিক তামসিক স্বার্থ-সিদ্ধির ব্যাপারই পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম্মপথ সুদূরে অপসারিত হইতেছে।

লোক-চক্ষুর অগোচরেও কত শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; স্ব স্ব প্রকৃতি-বশে সেই শক্তিনিচয়ই দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস বা পিশাচরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। দেব-প্রকৃতি ক্রূর আচরণসম্পন্ন নহেন, সুতরাং তাঁহাদিগের হইতে জীবগণের মঙ্গলই সংসাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু দানব, যক্ষ, রাক্ষস বা পিশাচ প্রভৃতি ক্রূর ও হিংসা-প্রকৃতিপরায়ণ, সুতরাং লোক-লোচনের অন্তরালে ইহাদের দ্বারা জীবগণের নানারূপ অকল্যাণ সংঘটিত হইয়া থাকে; এই জন্যই সেই সকল নিবারণের জন্য প্রাচীন বৈদিক যুগে এই রক্ষা বিধানের অনুষ্ঠান।

রক্ষা-মন্ত্রগুলির মর্ম্ম এই;—আভিচারিক প্রতিঘাত বা রাক্ষস প্রভৃতির ভয় হইতে তোমার রক্ষা-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি; ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সেই রক্ষাকর্ম্ম অনুমোদিত হউক।

নাগ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, পিতৃগণ, যক্ষ বা রাক্ষসগণ—যাঁহারা তোমার প্রতি আক্রমণ করিতে পারেন, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ তোমার সেই আপৎ বিনাশ করুন।

পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে, দিক্‌সকলে বা বাস্তুগৃহে যে সকল নিশাচর বাস করেন, তাঁহা-দিগকে নমস্কার করিতেছি, তাঁহারা সকলেই প্রসন্ন হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন।

ব্রহ্মর্ষিগণ, দিব্যর্ষিগণ, রাজর্ষিগণ, পর্ব্বত, নদী ও সাগরসকল তোমাকে রক্ষা করুন।

অগ্নি জিহ্বা, বায়ু প্রাণ, সোম ব্যান, পর্জ্জন্য অপান, বিদ্যুৎ উদান, মেঘ সমান, বলপতি ইন্দ্র বল ও সত্ত্ব, মনু মন্যাশয় এবং মতি, গন্ধর্ব্বগণ কাম, রাজা বরুণ প্রজ্ঞা, সমুদ্র নাভিমণ্ডল, সূর্য্য চক্ষু, দিক্‌সকল শ্রবণেন্দ্রিয়, চন্দ্র মন, নক্ষত্রগণ রূপ, রাত্রি ছায়া, জল রেতঃ, ওষধিসকল রোমাবলি, আকাশ ছিদ্র-সকল, পৃথিবী শরীর, বৈশ্বানর শির, বিষ্ণু পরাক্রম, পুরুষশ্রেষ্ঠ (নারায়ণ) পৌরুষ, ব্রহ্মা আত্মা এবং ধ্রুব ভ্রূদ্বয় রক্ষা করুন।

যাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইল, সেই সমুদয় দেবতাই তোমার শরীরে নিত্য অবস্থান* করিয়া থাকেন। ইহাঁরা সর্ব্বদাই তোমাকে পালন করুন এবং তুমি দীর্ঘায়ু লাভ কর।

---

* বিশ্বরূপ বিষ্ণুর অবয়বীভূত কোন্ দেবতা কোন্ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, তাহা সুশ্রুতে এইরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে;—"অথ বুদ্ধেব্রহ্মা। অহঙ্কারস্যেশ্বরঃ। মনসশ্চন্দ্রমাঃ। দিশঃ শ্রোত্রস্য। ত্বচো বায়ুঃ। সূর্য্যশ্চক্ষুষোঃ। রসনস্যাপঃ। পৃথ্বী ঘ্রাণস্য। বচোঽগ্নিঃ। হস্তয়োরিন্দ্রঃ। পাদয়োর্ব্বিষ্ণুঃ। পায়োর্ম্মিত্রঃ। প্রজাপতিরুপস্থস্য।"

(১ অঃ শারীর)

ভগবান্ ব্রহ্মা, চন্দ্র, সূর্য্য, নারদ, পর্ব্বত, অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তোমার মঙ্গল করুন।

পিতামহ ব্রহ্মা কর্তৃক যে রক্ষাবিধান জীবগণের মঙ্গল সাধন জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তোমার আরোগ্য লাভার্থ সেই রক্ষা-কর্ম্ম কৃত হইল;—অতএব তোমার মঙ্গল হউক, তোমার আয়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, তোমার সকল প্রকার বাধা ও বিঘ্ন দূরীভূত হউক এবং তুমি সতত ব্যথাশূন্য হইয়া থাক।

বেদাত্মক মন্ত্র দ্বারা তোমার রক্ষাবিধান অনুষ্ঠিত হইল, ইহা হইতে কোন অভিচার বা ব্যাধিনিবন্ধন তোমার কোন ভয় থাকিবে না, নিশ্চয় জানিও। আমি তোমার যে রক্ষা বিধান করিলাম, তাহা হইতে তুমি দীর্ঘ আয়ুঃ প্রাপ্ত হও।

৬। আয়ুর্ব্বর্দ্ধক সদ্নীতি

সদ্নীতির উপদেশ সুশ্রুতে অনেক আছে। এ স্থলে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গেল;—

"ন দেব-ব্রাহ্মণ-পিতৃ-পরিবাদাংশ্চ, ন নরেন্দ্র-দ্বিষ্টোন্মত্ত-পতিত-ক্ষুদ্র-নীচাচারানুপাসীত।"

(২৪ অ°, চিকিৎসা°)

দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণের নিন্দা করিতে নাই। রাজার প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন, উন্মত্ত, নিজের সদাচার হইতে পরিভ্রষ্ট, জাতিতে হীন বা অসৎকর্ম্মে সমাসক্ত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কখনও মিলিত হওয়া উচিত নহে।

"দেব-গো-ব্রাহ্মণ-চৈত্য-ধ্বজ-রোগি-পতিত-পাপকারিনাঞ্চ ছায়াং নাক্রমেত।"

(২৪ অ° চিকিৎসা°)

দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ, শ্মশান-বৃক্ষ, পতাকা, রোগী বা পাপানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তির ছায়া অতিক্রম করিতে নাই।

"সততাধ্যয়নং বাদঃ পরতন্ত্রাবলোকনম্।
তদ্বিদ্যাচার্য্যসেবা চ বুদ্ধিমেধাকরো গণঃ॥
আয়ুষ্যং ভোজনং জীর্ণে বেগানাঞ্চাবিধারণম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ সাহসানাঞ্চ বর্জ্জনম্॥"—(২৮ অ° চিকিৎসা°)

নিরন্তর সৎশাস্ত্রের অধ্যয়ন, বাদ (পরমতের খণ্ডন পূর্ব্বক নিজের ন্যায়ানুমোদিত মত সংস্থাপন), ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, বেদান্ত ও ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রান্তরের অনুশীলন এবং তত্তৎ বিদ্যাভিজ্ঞ আচার্য্যগণের সহবাস, এই সমুদয় বুদ্ধি ও মেধাবর্দ্ধক সদ্গুণ। অধিকন্তু ভুক্ত দ্রব্য পরিপক্ক হইবার পরে আয়ুর্ব্বর্দ্ধক দ্রব্য ভোজন করা, মল ও মূত্রাদির বেগ ধারণ না

ব্রহ্মা বুদ্ধির, ঈশ্বর অহঙ্কারের, চন্দ্র মনের, দিক্‌সকল শ্রবণেন্দ্রিয়ের, বায়ু ত্বকের, সূর্য্য চক্ষুর্দ্বয়ের, সলিল রসনেন্দ্রিয়ের, পৃথিবী ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ের, মিত্রদেবতা গুহ্যের এবং প্রজাপতি উপস্থ ইন্দ্রিয়ের অধিপতি।

বেদান্ত প্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্রেও এইরূপ ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতৃ দেবগণের পরিবর্ণনা আছে।

করা, ইন্দ্রিয় সংযম, অহিংসা এবং নিজের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া বলবানের সহিত মল্ল-যুদ্ধ প্রভৃতিতে প্রবৃত্ত না হওয়া; এই সকল বিধির সম্যক্ পরিপালনে আয়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

৭। দৈবব্যপাশ্রয়-চিকিৎসা

ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন গ্রহণপূর্ব্বক ঔষধ ব্যবহারের বিধানও আয়ুর্ব্বেদে প্রদত্ত হইয়াছে। এ স্থলে কিছু উল্লেখ করা গেল।

তৈল-বিশেষ বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া ব্যবহার প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে;—

"মজ্জসার মহাবীর্য্য সর্ব্বান্ ধাতূন্ বিশোধয়।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পাণিস্ত্বামাজ্ঞাপয়তেঽচ্যুতঃ॥"—(১৩অ° চিকিৎসা°)

হে মজ্জসার মহাবীর্য্য তুবরক, * তুমি এই পীড়িত ব্যক্তির রস ও রক্তাদি সকল ধাতুকে দোষপরিশূন্য কর; শঙ্খ, চক্র ও গদাপাণি অচ্যুত নারায়ণ তোমাকে এই আজ্ঞা করিতেছেন।

অন্যত্র আয়ুষ্কামীয়ে দেখা যায়;—

"মন্ত্রৌষধসমাযুক্তং সংবৎসরফলপ্রদম্।
বিল্বস্য চূর্ণং পুষ্যে তু হুতং বারান্ সহস্রশঃ॥
শ্রীসূক্তেন নরঃ কাল্যে সসুবর্ণং দিনে দিনে।
সর্পির্ম্মধুযুতং লিহ্যাদলক্ষ্মীনাশনং পরম্॥"—(২৮ অ° চিকিৎসা°)

মন্ত্রদ্বারা অনুপ্রাণিত যথোপযুক্ত ঔষধসহ বিল্বচূর্ণ এক বৎসর পর্য্যন্ত সেবন করিবে। পুষ্যা নক্ষত্রে ঋগ্‌বেদোক্ত শ্রীসূক্ত,—

"হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ॥"—ইত্যাদি

দ্বারা সহস্র বার অভিপূত করিয়া তদনন্তর স্বর্ণভস্ম সহ ঘৃত ও মধুযোগে এই বিল্বচূর্ণ সেবনে আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হইবে।

প্রসিদ্ধ সোমরসায়নযোগের অভিমন্ত্রণে উক্ত হইয়াছে;—

"মহেন্দ্র-রামকৃষ্ণানাং ব্রাহ্মণানাং গবামপি।
তপসা তেজসা বাপি প্রশাম্যধ্বং শিবায় বৈ॥"—(৩০অ° চিকিৎসা°)

মহেন্দ্র, রাম, কৃষ্ণ, ব্রাহ্মণগণ ও গো-সকলের তপঃ ও তেজঃপ্রভাবে তোমরা মঙ্গলদায়ক হইয়া রোগ দূর কর।

অপস্মার রোগ আরোগ্য বিধানার্থ দেখিতে পাওয়া যায়;—

"পূজাং রুদ্রস্য কুর্ব্বীত তদ্‌গণানাঞ্চ নিত্যশঃ॥"—(৬১ অ° উত্তর°)

অপস্মার রোগ হইতে আরোগ্য লাভের জন্য প্রমথগণের সহিত রুদ্রের সতত অর্চ্চনা করিবে।

---

* তুবরক, তুবাস্ত (কলাই) বিশেষ, জমার। ইহার ফলের মজ্জাতে তৈল উৎপন্ন হয়। (সুশ্রুত দ্রষ্টব্য)

যে যোগে কোন মন্ত্রের সমুল্লেখ নাই, সেখানে কি করিতে হইবে?—

"যত্র নোদীরিতো মন্ত্রো যোগেষ্বেতেষু সাধনে।

শস্তিতা তত্র সর্ব্বত্র গায়ত্রী ত্রিপদী ভবেৎ॥"—(২৮ অ° চিকিৎসা°)

যেখানে যোগবিশেষে কোন মন্ত্রের পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ নাই, তাহার সর্ব্বত্রই "ত্রিপদী গায়ত্রী" দ্বারা ঔষধকে অনুপ্রাণিত করিয়া তৎপরে ব্যবহার করিতে হইবে।

৮। গ্রহোৎপত্তি

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই শিশুগণের যে সকল ব্যাধি * উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা প্রায়শঃ গ্রহগণের পীড়নবশতই ঘটিয়া থাকে, প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে। কিরূপে সেই গ্রহগণের উৎপত্তি হইয়াছে ;—

"এতে গুহস্য রক্ষার্থং কৃত্তিকোমাগ্নিশূলিভিঃ।

সৃষ্টাঃ শরবনস্থস্য রক্ষিতস্যাত্মতেজসা॥"—(৩৭ অ° উত্তর°)

প্রসিদ্ধি আছে, কার্ত্তিকেয় শরবনে নিজের তেজঃপ্রভাবে রক্ষিত হইলেও কৃত্তিকা, অগ্নি, উমা ও মহেশ্বর ইঁহারা সকলেই স্নেহবশতঃ তাঁহার রক্ষার জন্য স্কন্দ প্রভৃতি গ্রহগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

যখন বয়োবৃদ্ধির সহিত আর কুমারের রক্ষার কোন প্রয়োজন রহিল না, তখন কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মহাদেব স্কন্দ প্রভৃতি গ্রহগণকে তাঁহাদের বক্ষ্যমাণ জীবিকার উপায় বলিয়া দিয়াছিলেন ;—

"কুলেষু যেষু নেজ্যন্তে দেবাঃ পিতর এব চ।

ব্রাহ্মণাঃ সাধবশ্চৈব গুরবোঽতিথয়স্তথা॥

গৃহেষু তেষু যে বালাস্তান্ গৃহ্নীধ্বমশঙ্কিতাঃ।

তত্র বো বিপুলা বৃত্তিঃ পূজা চৈব ভবিষ্যতি॥"—(৩৭ অ° উত্তর°)

হে গ্রহগণ, যাহারা দেবতা, পিতৃপুরুষ, ব্রাহ্মণ, সাধু ব্যক্তি, গুরুজন ও অতিথিবর্গের সমুচিত সৎকারে পরাঙ্মুখ, তাহাদের সন্তানগণ তোমাদিগের কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে এবং তন্নিবন্ধন সেই ব্যক্তিগণের পূজা লাভ করিয়া তোমরা জীবিকা প্রাপ্ত হইবে।

৯। সৎপুত্র

ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদেও "সৎপুত্র" উৎপাদনে যেরূপ নিয়ম অবশ্য প্রতিপাল্য, তাহার যথোচিত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই জন্য সুশ্রুত বলিয়াছেন ;—

পুংসবন "ততো বিধানং পুত্রীয়মুপাধ্যায়ঃ সমাচরেৎ॥"—(২অ° শারীর°)

শুদ্ধ সত্ত্বগুণসম্পন্ন সৎপুত্র লাভের জন্য স্ত্রীর ঋতু দর্শনের পরে আচার্য্য শাস্ত্রোক্ত পুংসবন-বিধান যথানির্দ্দেশ সম্পন্ন করাইবেন।

* ইহাকেই পেঁচোয় পাওয়া কহে।

পুংসন ক্রিয়াতে যেরূপ শাস্ত্র-অনুশাসনে ক্রিয়াক্রম বিহিত হইয়াছে, তদনুরূপ সেই ক্রিয়া অনুষ্ঠান সময়ে লক্ষ্মণা প্রভৃতি ঔষধসমূহের প্রয়োগও যথারীতি করিবার বিধান আয়ুর্ব্বেদে আছে। গর্ভাধানের পূর্ব্বে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই এক মাস কাল ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতে হইবে, ইহাই সুশ্রুত আচার্য্যের উপদেশ।

শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপরিউক্ত ক্রিয়ার পরিণামে কি ইষ্ট লাভ হইয়া থাকে?—

সৎপুত্র "এবং জাতা রূপবন্তো মহাসত্ত্বাশ্চিরায়ুষঃ।
ভবন্তি ঋণমোক্তারঃ সৎপুত্রাঃ পুত্রিণে হিতাঃ॥"—(২ অ° শারীর°)

বিধিপূর্ব্বক গর্ভোৎপাদন-ফলে সন্তান প্রীতিকর অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন, রজ ও তমোগুণ-বিরহিত, শুদ্ধসত্ত্বগুণান্বিত, দীর্ঘ আয়ুযুক্ত ও পিতৃপুরুষগণের ঋণমোক্তা, সুতরাং প্রকৃত সৎ-পুত্র-পদবাচ্য হয়। সংসারে এইরূপ পুত্রই মানবের ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণ-বিধায়ক হইয়া থাকে।

পিতা ও মাতা যথেচ্ছাচারসম্পন্ন হইলে ত কোন কথাই নাই, কিন্তু স্থলবিশেষে শান্ত-স্বভাব দম্পতির পুত্রও বিকৃতিপ্রাপ্ত হয় কেন?

"আহারাচারচেষ্টাভির্যাদৃশীভিঃ সমন্বিতৌ।
স্ত্রীপুংসৌ সমুপেয়াতাং তয়োঃ পুত্রোঽপি তাদৃশঃ॥"—(২অ° শারীর°)

গর্ভাধানকালে পিতা ও মাতা যেরূপ আহার, আচার ও কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সন্তানও ঠিক সেইরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

এই জন্যই পিতা ও মাতার সংযম ও শুদ্ধাচার অবলম্বন করিতে ধর্ম্ম ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের এত অনুশাসন। তাই এ বিষয়ে সুশ্রুত আরও বলিতেছেন;—

কুপুত্র "দেবতাব্রাহ্মণপরাঃ শৌচাচারহিতে রতাঃ।
মহাগুণান্ প্রসূয়ন্তে বিপরীতাস্তু নির্গুণান্॥"—(৩অ° শারীর°)

যাঁহাদের দেবতা ও ব্রাহ্মণে ভক্তি আছে এবং যাঁহারা কায়শুদ্ধি, মনঃশুদ্ধি, সদাচার ও পরহিতে অনুরক্ত, তাঁহাদের সন্তান মহাগুণসম্পন্ন হইয়া থাকে; আর ইহার অন্যথা ঘটিলেই নির্গুণ, দুঃশীল পুত্রের জন্ম হইয়া থাকে।

জীবপ্রবাহ যে অনাদি, তাহাও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে;—

জন্মান্তর "কর্ম্মণা নোদিতো যেন তদাপ্নোতি পুনর্ভবে।
অভ্যস্তাঃ পূর্ব্বদেহে যে তানেব ভজতে গুণান্॥"—(২ অ° শারীর°)

জীব স্বীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের বিধান অনুসারে পুনর্জ্জন্মে অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ, মূক, পণ্ডিত, মূর্খ বা জাতিস্মর প্রভৃতি হইয়া থাকে। ফলতঃ পূর্ব্বজন্মে প্রাণী যে যে প্রকৃতির অনুশীলন করিয়া আসিয়াছে, পরজন্মেও সেই সকল গুণই তাহাকে আশ্রয় করে।

এই জন্যই মনুষ্যের প্রতি সদনুষ্ঠান করিতে ও সদা সাধুসঙ্গে নিরত থাকিতে আর্য্যশাস্ত্রের এত উপদেশ।

দৌহৃদকে প্রচলিত কথায় দোহদ বা সাধ বলে। যখন গর্ভের চারি মাস বয়ঃক্রম হয়, তখনই তাহাতে চেতনার সঞ্চার হইয়া থাকে। অচিন্তনীয় ঐশ্বরিক শক্তিপ্রভাবে গর্ভস্থ ভ্রূণের অভিপ্রায় অনুসারে এই সময়ে গর্ভিণীর নানাবিষয়ক অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহাই দৌহৃদ বা দোহদ। দৌহৃদ পূর্ণ না হইলে কি হয়?—

দৌহৃদ "সা প্রাপ্তদৌহৃদা পুত্রং প্রজায়েত গুণান্বিতম্।
অলব্ধদৌহৃদা গর্ভে লভেতাত্মনি বা ভয়ম্॥"—(৩অ° শারীর°)

গর্ভিণীর দৌহৃদ পূর্ণ হইলে সন্তান পূর্ণাঙ্গ ও সদ্‌গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে, আর তাহার অন্যথায় সন্তানের কোন অঙ্গের বা স্বভাবের বিকৃতি অথবা গর্ভিণীর নিজেরও ঐরূপ বিকার-বিশেষ সংঘটিত হইতে পারে। এই জন্যই গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার বিধান বিহিত হইয়াছে।

যদি রাজদর্শনে গর্ভিণীর অভিলাষ হয়, তাহা হইলে ভাগ্যবান্ ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন নৃপতি সদৃশ পুত্রের জন্ম হইয়া থাকে। এইরূপ গর্ভাবস্থায় রমণীর বস্ত্রালঙ্কারে ইচ্ছা হইলে বস্ত্র ও অলঙ্কার-প্রিয়, তাপসাশ্রম দর্শনেচ্ছু হইলে ধর্ম্মশীল ও শান্তস্বভাব এবং ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর দর্শনে ইচ্ছা হইলে হিংসা ও ক্রূরাচারপরায়ণ পুত্রের জন্ম হইয়া থাকে।

গর্ভিণীকে কখন্ সূতিকাগৃহে প্রবেশ করাইতে হইবে?—

সূতিকাগৃহে প্রবেশ "নবমে মাসি সূতিকাগারমেনাং প্রাবেশয়েৎ প্রশস্তে তিথ্যাদৌ॥"
—(১০ম অ° শারীর°)

তিথি ও নক্ষত্র প্রভৃতি শুভশংসী দেখিয়া নবম মাসে গর্ভিণীকে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করাইবে।

ভূমিষ্ঠ হইবার পরে বালকের নামকরণ-বিধানে সুশ্রুত বলেন,—

নামকরণ "ততো দশমেঽহনি মাতাপিতরৌ কৃতমঙ্গলকৌতুকৌ স্বস্তিবাচনং কৃত্বা নাম কুর্য্যাতাং যদভিপ্রেতং নক্ষত্রনাম বা॥"—(১০ অ° শারীর°)

শিশু যখন দশ দিনের হইবে, পিতা ও মাতা বংশানুক্রম বিধান অনুসারে যথাবিধ মঙ্গল আচারের অনুষ্ঠান করিয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক নিজেদের অভিলাষ অনুসারে বা জন্মনক্ষত্রের নির্দ্দেশে জ্যোতিঃশাস্ত্রের অনুশাসনে শিশুর নামকরণ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন।

ক্রমে ক্রমে বালক যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে, তখন পিতা কি করিবেন?—

বিদ্যাশিক্ষা "শক্তিমন্তঞ্চৈনং জ্ঞাত্বা যথাবর্ণং বিদ্যাং গ্রাহয়েৎ॥"
—(১০ অ° শারীর°)

বালক যখন ক্রমে কোন বিষয়ের অভ্যাস করণে সমর্থ হইবে, সেই সময়ে (অর্থাৎ জন্ম সময় হইতে শিশুর পঞ্চম বর্ষে) পিতা তাহাকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিধানে বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত করাইবেন।

বিদ্যাভ্যাস সমাপ্তি প্রাপ্ত হইলে পুত্র যখন ক্রমে যুবক ও শক্তিসম্পন্ন হইবে, তখন ;—

বিবাহ "অথাস্মৈ পঞ্চবিংশতিবর্ষায় দ্বাদশবার্ষিকীং পত্নীমাবহেৎ পিত্র্যধর্ম্মার্থকামপ্রজাঃ প্রাপস্যতীতি।"—(১০অ° শারীর°)

বিদ্যাশিক্ষার পরে পিতা যখন দেখিবেন, পুত্রের পঞ্চবিংশতিতম বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে, তখন তাহার সহিত দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দিবেন; কারণ, এই বয়সেই সন্তানগণ স্বীয় পিতৃঋণ, ধর্ম্মানুষ্ঠান, অর্থ উপার্জ্জন, বিষয় উপভোগ ও সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হইয়া থাকে।

পুরুষের পঞ্চবিংশতি ও স্ত্রীর দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমেই যে সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও দীর্ঘজীবী সন্তানের উৎপাদনের সমর্থতা জন্মিয়া থাকে, এই প্রমাণে সুশ্রুত তাহা স্পষ্ট দেখাইয়াছেন; অধিকন্তু আরও বলিয়াছেন ;—

* "ঊনদ্বাদশবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরং জীবেজ্জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥"

—(১০ম অ° শারীর°)

অপূর্ণ পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পুরুষ ও অপ্রাপ্ত দ্বাদশ বৎসরবয়স্কা স্ত্রীর যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে হয় ত গর্ভেই মৃত হয়, আর যদি বা জীবিত অবস্থায় প্রসূত হয়, তাহা হইলেও দীর্ঘজীবী হয় না, অথবা জীবিত থাকিলেও চিরজীবন ক্ষীণবলই থাকে।

স্ত্রীলোকের সন্তান উৎপাদনের বয়ঃপ্রসঙ্গে সুশ্রুত আরও বলেন ;—

"রসাদেব স্ত্রিয়া রক্তং রজঃসংজ্ঞং প্রবর্ত্ততে।
তদ্বর্ষাদ্দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্॥"—(১৪অ° সূত্র°)

আরও,—

"তদ্বর্ষাদ্দ্বাদশাৎ কালে বর্ত্তমানমসৃক্ পুনঃ।
জরাপক্বশরীরাণাং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্॥"—(৩অ° শারীর°)

---

* তিন শত বৎসরের প্রাচীনতম হস্তলিখিত গ্রন্থে আমরা "ঊনদ্বাদশ" এই পাঠই প্রাপ্ত হইয়াছি। সুশ্রুতের যে সকল হস্তলিখিত পুস্তক দেখা গিয়াছে, তাহার তিনখানিতেই মূলে ও ডল্লনের টীকায় এই পাঠই আছে। এ পর্য্যন্ত সুশ্রুতের যত মুদ্রাঙ্কণ হইয়াছে, তাহাতে "ঊনষোড়শ" পাঠ দেখা যায়। কোন কোন হস্তলিপিতেও "ঊনষোড়শ" পাঠ আছে। কিন্তু সুশ্রুতের সর্ব্বত্রই যখন দেখা যায়, "দ্বাদশবর্ষীয় স্ত্রীর সহিত পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক পুরুষের বিবাহ হওয়া বিধেয়"—তখন এই স্থলে "ঊনদ্বাদশ" পাঠই অধিক সমীচীন। কারণ, স্বাভাবিক রজঃপ্রবর্ত্তনই স্ত্রীলোকের যৌবন ও গর্ভ-ধারণকাল অবধারিত করিয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের রজঃ রসধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহা দ্বাদশ বর্ষ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে; তৎপরে দেহের জরানিবন্ধন ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বিবাহের বয়ঃক্রম নির্দ্দেশে,—

"ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।"

ধর্ম্মশাস্ত্রের এই প্রমাণেও কন্যার বিবাহের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত পাওয়া যায়; তবে পুত্রের বয়সের পরিমাণ আরও একটু বাড়িয়া গেল।

যাহা হউক, এই সকল প্রমাণপরম্পরায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই শরীরের নীরোগতা ও মানসিক প্রসন্নতা যে সর্ব্বথা সৎ পুত্র লাভের প্রধান প্রয়োজন, তাহা সুশ্রুতে সবিশেষ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

১০। সুশ্রুত-প্রণেতা কি ছিলেন?

আমরা এই প্রবন্ধে সুশ্রুত গ্রন্থে ধর্ম্মভাবের যে বিকাশ আছে, তাহা অতি সংক্ষেপে দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। তবে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে এ বিষয়ে কত দূর সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। সুশ্রুত-প্রণেতা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন?—বর্ত্তমানে কেহ কেহ তাহাতে একরূপ স্থিরনিশ্চয় হইয়াছেন যে, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক আচার্য্য নাগার্জ্জুনই * বর্ত্তমান সুশ্রুতের সংস্কর্ত্তা বা প্রণেতা। সুশ্রুতের প্রসিদ্ধ টীকাকার ডল্লনাচার্য্য সন্দেহপ্রায় বলিয়া গিয়াছেন—নাগার্জ্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা। তাহাতেই এই অভিমতের উদ্ভব হইয়াছে। বিশেষতঃ সুশ্রুতের এক স্থানে "সুভূতি গৌতম" উল্লিখিত হইয়াছেন, এই প্রমাণবলে নাগার্জ্জুনই সুশ্রুতের প্রণেতা নিশ্চিত হইবেন, ইহাই কাহারও কাহারও অভিমত। ও দিকে কিন্তু সুশ্রুতের যে অন্য প্রতিসংস্কর্ত্তা ছিলেন না, প্রাচীন টীকাকারদিগের মধ্যে যে এইরূপ অভিমত ছিল, ডল্লন নিজেই স্বগ্রন্থেও তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্ত সুশ্রুতসংহিতার অন্যতম টীকাকার। তিনিও সুশ্রুতের বাস্তবিক প্রতিসংস্কর্ত্তা কেহ ছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিয়াই গিয়াছেন। সংহিতাগ্রন্থে চারি প্রকার সূত্রের মধ্যে প্রতিসংস্কর্ত্তার সূত্র অন্যতম, ডল্লনের আত্মমত পোষণের ইহাই প্রমাণ যাঁহারা মনে করেন,—চক্রপাণি, জতূকর্ণের ও গ্রন্থান্তরের

---

* আয়ুর্ব্বেদের উত্তরকালীন সংগ্রহকারবৃন্দ ও চক্রপাণি প্রভৃতি আচার্য্য নাগার্জ্জুন রসায়নবেত্তা ছিলেন, ইহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা নাগার্জ্জুনকে "মুনীন্দ্র" আখ্যায়ও সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন। নাগার্জ্জুন বহু গ্রন্থের প্রণেতা; কিন্তু রসায়নবেত্তা নাগার্জ্জুন ও বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জ্জুন এক ব্যক্তি কি না—তাহার নিশ্চায়ক প্রমাণ কি? যদি এক নাগার্জ্জুন হয়েন, তাহাতে আপত্তিই বা কি? যাহা হউক, আমরা নাগার্জ্জুন নামধেয় গ্রন্থকার-প্রণীত "যোগসার" নামক গ্রন্থে মাধবকর, চক্রপাণি (চক্র) ও বঙ্গসেনের প্রমাণও সংগ্রহ দেখিতে পাইয়াছি। ইনি আবার কোন্ নাগার্জ্জুন?

প্রমাণ নিবদ্ধ করিয়া কেবল ঐ প্রমাণই যে এ বিষয়ে নিশ্চয়ত্বজ্ঞাপক নহে, তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। চক্রপাণি, জতুকর্ণ প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমানে দুর্ল্লভপ্রায় ভেলসংহিতা * দেখিবার সুবিধা পাইয়া তাহাতেও আমরা চক্রপাণির পরিপোষক প্রমাণই প্রাপ্ত হইয়াছি। অথচ জতুকর্ণ বা ভেলের গ্রন্থ যে প্রতিসংস্কৃত হয় নাই, প্রত্যুত বিলুপ্তই হইয়া গিয়াছে, এ কথা সকলেই জানেন। পূর্ব্বাচার্য্যগণের নাম গ্রন্থমধ্যে থাকিলেই তাহা প্রতিসংস্কৃত বা অন্যের কৃত, এইরূপ নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। † তান্ত্রিক বা পৌরাণিক দেবতার সমুল্লেখ দেখিয়াও গ্রন্থের অর্ব্বাচীনতা প্রতিপন্ন হয় না। ‡ অধিকন্তু অগ্নিবেশকৃত সংহিতায়, "চরক" ও চরকসংহিতার অংশবিশেষের "দৃঢ়বল" প্রতিসংস্কর্ত্তা, চরক গ্রন্থেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুশ্রুতের ঐরূপ কোন প্রতিসংস্কর্ত্তা থাকিলে, গ্রন্থমধ্যে চরকের ন্যায় তাহারও সমুল্লেখ নিশ্চয়ই থাকিত।

আয়ুর্ব্বেদে ব্রহ্মসংহিতা ও অশ্বিনীকুমারসংহিতা প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুশ্রুত, অগ্নিবেশ, ভেল বা চরক কত কালের, তাহা বলিতে পারি না। তবে ইঁহারা যখন নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তখন যে তাঁহাদিগের হইতে প্রাচীনতম কালে ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি বর্ত্তমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ করা যাইতে পারে না। খুব সম্ভব, প্রাচীনতম সংহিতার শ্লোকপরম্পরাও উত্তরকালীন সুশ্রুত, অগ্নিবেশ ও ভেল প্রভৃতি

---

* "অথাতঃ পুরুষনিচয়ং শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।
তত্র ভেল আত্রেয়মিদমুবাচ। * *
অত্রোবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ।" * * (শারীরে ভেলসংহিতা)

† "তত্র ধান্বন্তরীয়াণামধিকারঃ ক্রিয়াবিধৌ।" (চিকিৎসা, চরকে)
"ধান্বন্তরং পিবেৎ সর্পিঃ প্রাজাপত্যমথাপি বা।"
"সুকুমারং বলাতৈলং তৈলং শৈরিষমেব বা।
ধান্বন্তরং চাপি ঘৃতং পায়য়েদ্বাতশোণিতম্।" * *
"কিং অঙ্গস্য গর্ভস্য প্রথমং সংভবতি হস্তং পাদাবিতি * *
ইতি শৌনকঃ।"
"কথং গর্ভো মাতুরুদরে তিষ্ঠতীতি শৌনকঃ।"—(ভেলসংহিতা)

‡ "যস্মিন্ যস্মিন্ বিকারে তু যোগোঽয়ং সংপ্রযুজ্যতে।
তং তং নিহন্তি বৈ রোগং দেবারীন্ কেশবো যথা।"—(ভেলসংহিতা)

প্রসিদ্ধ সুশ্রুতসংহিতার ইংরাজি অনুবাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ভিষগ্রত্ন মহোদয় সবিদ্যা-প্রণোদিত হইয়া বহু অর্থব্যয়ে সুদূর তাঞ্জোর রাজকীয় লাইব্রেরীর আদর্শ গ্রন্থ অবলম্বনপূর্ব্বক ভেল-সংহিতার যে প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেই আমরা ভেলসংহিতা দেখিতে পাইয়াছি। এই জন্য কুঞ্জবাবুর নিকটে বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি।

স্ব স্ব গ্রন্থে সমুদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি শ্লোক এ স্থলে দেখাইতেছি ;—

সুশ্রুতে আছে,—

"রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জ্ঞঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ॥"—(১৪ অ° সূত্র°)

ভেলসংহিতায়ও দেখিতে পাই ;—

"রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদস্ততোঽস্থি চ।
অস্থ্নো মজ্জা ততঃ শুক্রং শুক্রাদ্‌গর্ভস্য সম্ভবঃ॥"
(১১ অ° সূত্র°)

ভেল ও চরকের পরস্পর একতার এত প্রাচুর্য্য আছে যে, তাহার সমুল্লেখে প্রবন্ধান্তর সঙ্কলিত হইয়া পড়ে। এইরূপ ঐক্য দেখিয়া প্রাচীনতম সংহিতার অস্তিত্বই অনুমিত হয়।

"সুভূতি গৌতম" নাম দেখিয়া ভগবান্ বুদ্ধদেবের শিষ্য সুভূতিই যে নিশ্চয় হইবেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ কি ? এইরূপ বলাকে অনুমানই বলিতে পারা যায়, প্রকৃত প্রমাণ নহে। বিশেষতঃ গৌতম নাম বংশপরিচায়ক, সুতরাং শাক্যসিংহের বহু পূর্ব্বকাল হইতেই উহা বর্ত্তমান ও প্রসিদ্ধ ছিল।

সুশ্রুতের গুরু ভগবান্ অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরি, আত্রেয় পুনর্ব্বসুর ন্যায় মহর্ষি ভরদ্বাজেরই অন্যতম শিষ্য ছিলেন, পৌরাণিক প্রমাণান্তরে আমরা তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি ;—

"তস্য গেহে সমুৎপন্নো দেবো ধন্বন্তরিস্তদা।
কাশিরাজো মহারাজঃ সর্ব্বরোগপ্রণাশনঃ॥
আয়ুর্ব্বেদং ভরদ্বাজাৎ প্রাপ্যেহ সভিষগ্‌জিতম্।
তমষ্টধা পুনর্ব্বস্য শিষ্যেভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ॥"—(২৯ অ° হরিবংশে)

কাশীরাজ ধন্বের গৃহে ভগবান্ ধন্বন্তরি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মহামুনি ভরদ্বাজের নিকটে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন এবং অতঃপর তাহা শল্য প্রভৃতি আট ভাগে বিভাগ করিয়া শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

এই প্রমাণ দ্বারা আত্রেয়-সংপ্রদায় ও ধন্বন্তরি-সংপ্রদায়েরও মেলন প্রতিপন্ন হয়, চরক, সুশ্রুত বা ভেলে তাহা দেখা যায়।

প্রাচীন গ্রন্থ মাত্রেই নানারূপ পাঠের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে, উহা প্রধানতঃ অনবধানপ্রসূত ভ্রম হেতুই আপতিত হইয়া থাকে। বৈদ্যক গ্রন্থসমূহে, সুতরাং সুশ্রুত-সংহিতাতেও সেইরূপ ব্যতিক্রম কিছু যে না ঘটিয়াছে, এরূপ নহে। আমরা সুশ্রুতের এইরূপ পাঠ-পরিবর্ত্তনের দিঙ্‌মাত্র "সুশ্রুতের আদর্শ" * নামক প্রবন্ধে প্রকটিত করিয়াছি।

---

* সাহিত্যসংহিতা, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ সাল।

যাহা হউক, ঐরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়াই একেবারে অপরকে সংস্কর্ত্তা বা প্রণেতা বলিয়া গণ্য করা সমীচীন কি ?

অষ্টাঙ্গহৃদয়-প্রণেতা বাগ্‌ভট আচার্য্য, সুশ্রুত ও চরক সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, "আয়ুর্ব্বেদে আর্ষ গ্রন্থ ও ঋষিররহস্য" * নামক প্রবন্ধে আমরা তৎসম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। বাহুল্য-ভয়ে এ স্থলে আর তাহা উল্লিখিত হইল না।

বুদ্ধদেব সূর্য্যবংশীয় রাজর্ষির পুত্র ছিলেন। তিনি জননির্ব্বিশেষে সকলকেই নির্ব্বাণ কামনায় বৈদিক বর্ণাশ্রম আচারের বহির্দ্দেশে নিয়া গিয়াছিলেন, যাহাতে সকলেই একবারে মুক্তি-পথে উপনীত হইয়া পুনরাবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করিতে সমর্থ হইতে পারে। কিন্তু সংসারের সকল লোকই কি ভগবান্ বুদ্ধদেবের ন্যায় কামিনী ও কাঞ্চনের হেয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতে পারিয়াছিল ? সুতরাং দুর্ব্বার কালস্রোতে পড়িয়াই অতঃপর তথাগত বুদ্ধদেবের উচ্চতম আদর্শ নির্ম্মল ধর্ম্মেও ঘুণ প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

সুশ্রুত-সংহিতার সর্ব্বত্রই আমরা সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের অনুশাসনই দেখিতে পাইতেছি, এই প্রবন্ধেও তাহা সম্যক্ সমর্থিত হইয়াছে। সুশ্রুতের কোথায়ও ভগবান্ বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের গন্ধও অনুভূত হয় না ; সুতরাং সুশ্রুত-সংহিতা যে ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের সুযোগ্য পুত্র শ্রুতর্ষি সুশ্রুত কর্ত্তৃক প্রণীত, এই সুপ্রাচীন বৈদ্য অভিজ্ঞানের অন্যথা কিরূপে সমীচীন হইতে পারে ? অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীমথুরানাথ মজুমদার

---

* প্রভাত, ৫ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩২০ সাল

বাঁশে লিখিত ঠিকুজী*

চট্টগ্রামে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম স্থান পান নাই। তন্ত্র-মতের যথাসম্ভব উন্নতি হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলিত জ্যোতিষ এক সময়ে তন্ত্রের এক অঙ্গ-মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। ফলিত জ্যোতিষের গণনায় লোক আশ্চর্য্যান্বিত হয়। হস্ত-রেখা, কপাল এবং নখ দেখিয়া জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা যদি কেহ বলেন, তাহা হইলে পণ্ডিতগণও বিস্মিত হয়েন। সাধারণ লোক যে তাহাতে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? গণিত জ্যোতিষ অর্থাৎ জাতকের লগ্ন, গ্রহ, নক্ষত্র দ্বারা গণনা করিয়া তাহার ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ গণনাও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার আত্মজীবনীতে এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, এক জন পণ্ডিত কুষ্ঠী ও ঠিকুজী প্রস্তুত করিয়া যত টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটি করিয়া তাহা পারেন নাই। এখনও এখানে জ্যোতিষ শাস্ত্রের যথেষ্ট সম্ভ্রম আছে। শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ব্যাকরণ, স্থায় ও স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষ পড়িবার নিয়ম আছে। ইহাতে পণ্ডিত মহাশয়েরা ঠিকুজী ও কুষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করেন। ইহা ছাড়া কোন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান হইলে, ঠিকুজী বা কুষ্ঠী প্রস্তুত করিবার জন্ম যখন লগ্নাচার্য্যকে আহ্বান করা হয়, সেই সঙ্গে দুই তিন জন অধ্যাপকও নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। লগ্নাচার্য্যের গণনার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার-ভার তাঁহাদের। সুতরাং অধ্যাপকগণের জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা করিতে হয়। ভদ্র লোকদিগের যেখানে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি এত শ্রদ্ধা, সেখানে নিম্নতর শ্রেণীর মধ্যে যে ইহার প্রতিপত্তি হইবে, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। ক্রমে ক্রমে ইহা মুসলমান ও বৌদ্ধদিগের মধ্যেও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। দরিদ্র মুসলমান ও পার্ব্বত্য মগগণও সেই জন্ম আপন আপন সন্তানের জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত করাইতেন এবং এখনও অনেকে করান। দরিদ্রদিগের বাক্স-পেটেরা নাই। তাহারা বংশ-নির্ম্মিত ঘরে বাস করে। সুতরাং সে নিমিত্ত তাহাদের জন্ম বংশে খোদিত ঠিকুজীর প্রথা হইয়াছিল। চারি অঙ্গুল পরিমিত এক বংশখণ্ডে জাতকের জন্মলিপি বা ঠিকুজী প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিল। ইহাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিবার পদ্ধতি সৃষ্টি হইল। বংশ-খণ্ডখানি হাঁড়ী বা কলসীর মধ্যে অন্য দ্রব্যের সঙ্গে রাখা যাইতে পারে; আবার গৃহদাহের সময় অনায়াসে উদ্ধার হইতে পারে। বংশনির্ম্মিত গৃহে অগ্নিদাহের ভয় অধিক; আবার এক সময়ে ঐ জেলায় গৃহদাহের ভয় অধিক ছিল। আমি প্রথমে যে ঠিকুজীটি দেখি, তাহা এত সুন্দর যে, প্রথমে উহা হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। যে ঠিকুজী বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হইতেছে, উহা দেখিতে তত সুন্দর না হইলেও, না বলিয়া দিলে হঠাৎ বংশনির্ম্মিত

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বলিয়া কাহারও উপলব্ধি হইবে না। এই ঠিকুজীতে জাতকের নাম, তাহার পিতা-মাতার নাম, যে আচার্য্য ঠিকুজী প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাঁহার নাম এবং জাতক কোন্ মানে, মাসে, বারে ও লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিথি, নক্ষত্র, গ্রহ ইত্যাদি সমুদয় প্রয়োজনীয় কথা আছে। এই ঠিকুজীখানি একটি ধুপী কন্যার এবং ৭১ বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের সাহায্যে ইহার যে অর্থ করিয়াছি, তাহা নিম্নে দিলাম। ন্যায়ভূষণ মহাশয় বলেন যে, সাধারণতঃ কোষ্ঠী বা ঠিকুজীতে অঙ্ক দ্বারা তিথি নক্ষত্র ইত্যাদি লেখা হয় না। এই অঙ্ক সঙ্কেত দ্বারা লগ্নাচার্য্য অল্প স্থানে অনেক কথা লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন। একটি লৌহশলাকা দ্বারা বংশখণ্ডের উপর ঠিকুজীর কথা খোদা হইয়াছে। প্রথম অক্ষরে লেখা আছে যে, ১৭৭২ শকে ২৪শে শ্রাবণ কৃষ্ণ পক্ষে, চতুর্থী তিথিতে রাত্র ১৯শ দণ্ড ১০পল গতে মিথুন লগ্নে শ্রীপোতন্ ধুপীর কন্যা শ্রীমতী রাজেশ্বরী, তাহার মাতা চন্দ্রার গর্ভে মীন রাশিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বকলম দস্তখত ২নং শান্তিরাম আচার্য্য। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, সেখানে একাধিক শান্তিরাম আচার্য্য ছিলেন এবং শান্তিরাম ঠিকুজী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজ হাতে বাঁশের উপর খোদেন নাই। বং দং অর্থে বকলম দস্তখত।

"শ্রীহরি স্মরণম্

শকে ১৭৭২ শ্রাবণস্য ২৪ দিবসে ৩ বাসরে কৃষ্ণপক্ষে ½ যস্তিথৌ রাত্র ১৯।১০ গতে মিথুন লগ্নে শ্রীপোতন ধোবীর কন্যা ২৬২ মিনরাশি মাতা চন্দ্রার গর্ভে শ্রীরাজেশ্বরীর জং পীং ব দা ২ শান্তিরাম।

৩ ৬ল		২ ৯
৪ ১		
৮ ৫		

৩	২১
১৮	৩৪
১২	১৪
৪৭	২৫

৬ ৪	৩	৫ ৭
২		৭
১ ৪	৬	৫ ৩

প্রথম ক্ষেত্রের অর্থ যে, জাতকের জন্মকালীন বৃষ রাশিতে মঙ্গল (৩) ছিল এবং মিথুন রাশিতে শুক্র (৬) ছিল; কর্কট রাশিতে বুধ ও রবি (৪, ১), সিংহ রাশিতে রাহু ও বৃহস্পতি (৮, ৫), কুম্ভরাশিতে কেতু (৯) এবং মীন রাশিতে চন্দ্র (২) ছিল।

দ্বিতীয়টি জাতাহ। তাহার অর্থ ন্যায়ভূষণ মহাশয় এইরূপ করিয়াছেন। জাতকের মঙ্গল বারে (৩) জন্ম হইয়াছিল। সে দিন তিথি কৃষ্ণা তৃতীয়া (১৮) ছিল। ঐ দিবস কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া ১২ দণ্ড ৪৭ পল স্থিতি ছিল। ঐ দিনের নক্ষত্র ছিল পূর্ব্বভাদ্রপদ (২৫) এবং ঐ নক্ষত্রের স্থিতি ছিল ৩৪শ দণ্ড ১৪ পল। জাতকের জন্ম মাসের ২৪শ তারিখে হইয়াছিল। তৃতীয়টিও একটি ক্ষেত্র; উহার অর্থ নিম্নে দেওয়া গেল।

মেষ রাশির অধিপতি মঙ্গল (৩), বৃষের অধিপতি শুক্র (৬), মিথুনের অধিপতি বুধ (৪), কর্কটের অধিপতি চন্দ্র (২), সিংহের অধিপতি রবি (১), কন্যার অধিপতি বুধ (৪), তুলার অধিপতি শুক্র (৬), বৃশ্চিকের অধিপতি মঙ্গল (৩), ধনুর অধিপতি বৃহস্পতি (৫), মকর ও কুম্ভের অধিপতি শনি (৭), মীনের অধিপতি বৃহস্পতি (৫)।

চট্টগ্রামে বৈষ্ণব ধর্ম্ম স্থান পান নাই, কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এখান হইতেও চারি জন পার্ষদ ভক্ত পাইয়াছিলেন। ইহাঁরা ভক্তগণের মধ্যে অতি উচ্চ ছিলেন। এই চারি জন যেমন ভাগবত, আবার সেইরূপ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা (১) শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, (২) শ্রীল বাসুদেব দত্ত, (৩) শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ও (৪) পণ্ডিত গদাধর মিশ্র। এই মহাত্মগণের সম্বন্ধে আমি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায় লিখিয়াছি। তাঁহাদের সম্বন্ধে জানিবার জন্য শ্রীল বিদ্যানিধির বংশধরগণের বর্ত্তমান বাসস্থান মেখল ও দত্ত ঠাকুরদিগের বাসস্থান ছনহরায় গিয়াছিলাম। বিদ্যানিধিবংশীয়গণ সকলেই বিদ্বান্। তাঁহা হইতে বর্ত্তমান ১৩ পুরুষ সকলেই শাস্ত্র ও ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থভাণ্ডারে অনেক হাতে লেখা পুথি, তালপাতায়, শোলায় ও কাগজে লেখা আছে। ঐ সকল দেখিতে দেখিতে একখানা তালপাতার পুথি পাইয়াছিলাম। পুথিখানি বহু কাল পূর্ব্বে কেহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু পুথিতে কিছু লিখেন নাই। ইহা দেখিলে কি প্রণালীতে পূর্ব্বে তালপাতার পুথি প্রস্তুত হইত, তাহা বুঝা যাইবে; সেই জন্য বিদ্যানিধিবংশীয় পূজনীয় শ্রীল হরকুমার স্মৃতিতীর্থের নিকট হইতে লইয়া ইহা পাঠাইতেছি। শুনিলাম, তালপাতার পুথি প্রস্তুতের নিয়ম এই যে, পাতাগুলি প্রথমে জলে সিদ্ধ করিতে হয়। তাহার পর মহিষের রক্তদ্বারা এক প্রকার কালি প্রস্তুত করিয়া উহা লেখা হইত।

শ্রীরঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী

পানিহাটী—রাঘব পণ্ডিতের মদনমোহন বিগ্রহ

পানিহাটী—রাঘব পণ্ডিতের সমাধি-বেদী ও মাধবী-কুঞ্জ
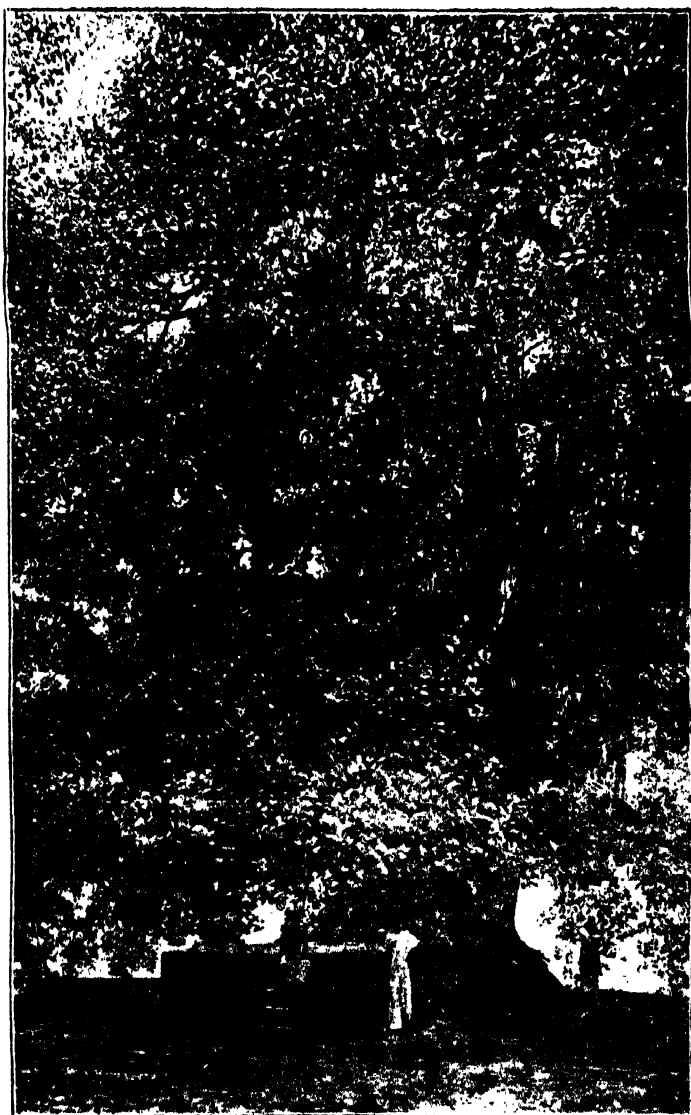
পানিহাটী—রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ডমহোৎসব ক্ষেত্র
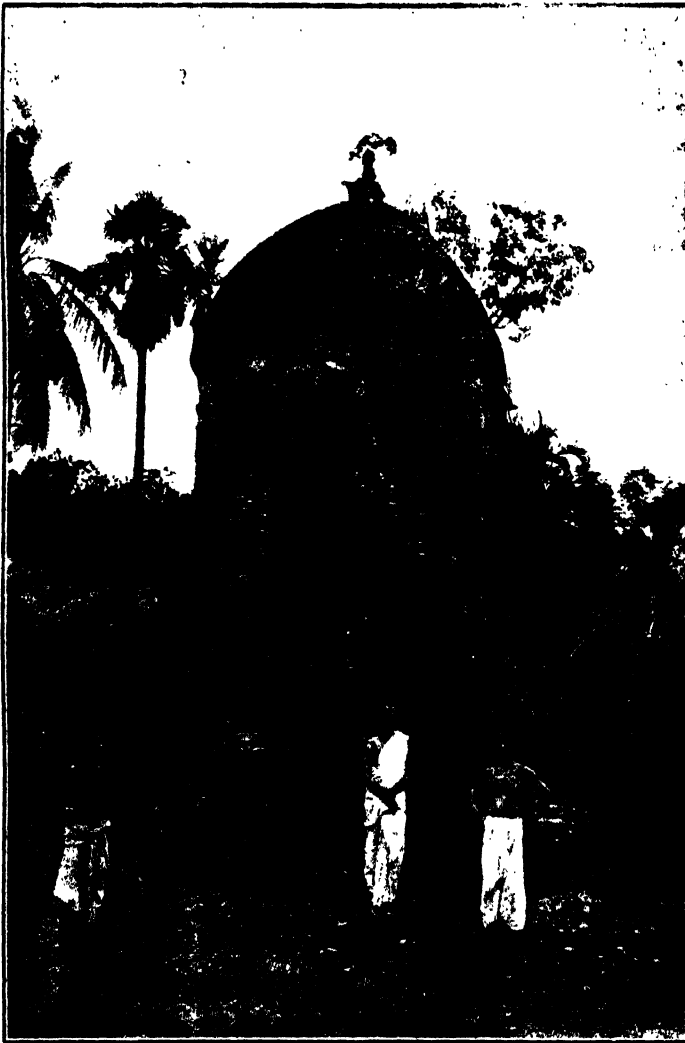
পানিহাটী—মদনমোহনের দোলমঞ্চ

দশম মাসিক অধিবেশন

২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, ৬ই জুন ১৯১৫, অপরাহ্ণ ৬৷৹টা

আলোচ্য বিষয়—১। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি,—(ক) কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (খ) কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, (গ) সদস্য-নির্ব্বাচন। ২। মেদিনীপুর, মানভূম ও মীরাটে শাখা-পরিষৎ স্থাপন-সংবাদ জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন—(ক) বীরভূম চাঁদপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত কন্দর্পনারায়ণ মজুমদার-প্রদত্ত বরাহমূর্ত্তি, (খ) মুর্শিদাবাদ ঝিল্লী নামোপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঘটক-প্রমুখ ব্যক্তি-গণের প্রদত্ত বরাহমূর্ত্তি, (গ) বীরভূম সোণারকুণ্ডুনিবাসী শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র দাস বিশ্বাস-প্রমুখ ব্যক্তিগণের প্রদত্ত হস্তিমূর্ত্তি। ৪। প্রবন্ধপাঠ,—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত "গুপ্তবলভী-সংবৎ"। ৫। শোকপ্রকাশ,—অম্বুজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ ডি

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন
„ নবকৃষ্ণ রায় মীরাট)
„ নিবারণ চন্দ্র ঘ
„ শশধর বিদ্যাভূষণ (যশোহর)
„ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
„ মিঃ পি এন্ দত্ত
„ মধুসূদন দাস মোহান্ত (বর্দ্ধমান)
„ শুদ্ধানন্দ স্বামী
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ বলাইচাঁদ মল্লিক
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত
„ আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ
„ কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত
„ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত
„ জানকীনাথ গুপ্ত
„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ সত্যেন্দ্রনাথ রায়
„ রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী
„ হরপ্রসাদ মজুমদার
„ সুরেন্দ্রনাথ সরকার
„ কুমুদবন্ধু দাশগুপ্ত
„ মন্মথনাথ রায়
„ ননীগোপাল রায়
„ বামাচরণ মজুমদার
„ বসন্তরঞ্জন রায়
„ অমৃতলাল দত্ত
„ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ গিরিশচন্দ্র দত্ত
„ নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত
„ সুরেন্দ্রনাথ রায়
„ খগেন্দ্রনাথ বসু
„ ভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
„ গিরিজাকুমার বসু
„ কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী (হেতমপুর)
„ ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়
„ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
„ ডাঃ প্রভাসনাথ পাল
„ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ পুলিনবিহারী দত্ত
„ কুমুদচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত
„ কামিনীকুমার সেনগুপ্ত

শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ ডাঃ কুঞ্জবিহারী মণ্ডল
„ তারকনাথ ভট্টাচার্য্য
„ অমৃতগোপাল বসু
„ বিধুভূষণ দত্ত
„ বিধুভূষণ সেন
„ রামকমল সিংহ
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ ভোলানাথ কোঁচ
„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
„ ভুবনমোহন রায়
„ মহেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
„ ললিতমোহন দাশগুপ্ত
„ অনন্তকুমার সেনগুপ্ত

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
„ বাণীনাথ নন্দী
} সহকারী সম্পাদক।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত হইল। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীচন্দ্রনাথ কবিরত্ন সাতক্ষীরা হাউস, কাশীপুর।
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় জমিদার, কালীনগর, যশোহর।
„	„	শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ প্রধান শিক্ষক, কালীনগর, যশোহর।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	„	শ্রীপ্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ, ৬৩ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীঅবনীকুমার সেন এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার, চিকান্দী, ফরিদপুর।
,,	,,	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেন বি এল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ফরিদপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীগণপতি সরকার বিস্তারত্ন, ৬৯ বেলেঘাটা মেন রোড।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ ৩ ভালুকপাড়া লেন।
,,	,,	ডাঃ শ্রীকুঞ্জলাল সাহা পাবনা।
শ্রীরঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	মৌলবী নসরৎ আলী সব্ ডেপুটী কালেক্টর, ফরিদপুর।
শ্রীকালীচরণ মিত্র	,,	শ্রীজীবনধন চক্রবর্ত্তী ৩৩ ঘোষের লেন।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত কলিকাতা বজেট আফিস, ১০ আতাবাগান লেন, গোয়াবাগান।
,,	,,	শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অবসরপ্রাপ্ত ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, পুরুলিয়া।
,,	,,	রায় বাহাদুর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বল্লভ ২৬ গ্যালিফ ষ্ট্রীট।
শ্রীরামকমল সিংহ	,,	শ্রীভবেশচন্দ্র দাস বিশ্বাস সোনারকুণ্ড, বীরভূম।
,,	,,	শ্রীকন্দর্পনারায়ণ মজুমদার চাঁদপাড়া, বীরভূম।
,,	,,	শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী খুলনাবাজার, খুলনা।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	শ্রীবিধুভূষণ সেন ৩এ হরিমোহন বসুর লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	কবিরাজ শ্রীহরপ্রসাদ মজুমদার ১১ হরিমোহন বসুর লেন।
"	"	কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্রলাল সেন কবিরত্ন ১৫৫।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহারাণচন্দ্র দে রসিকপুর, দুমকা।
"	"	শ্রীযদুনাথ দে বরহি, রাজনগর পোঃ, দ্বারভাঙ্গা।
"	"	শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক হেডমাষ্টার, যুগবাড়িয়া ডে নাইট স্কুল। সোদপুর, ২৪ পরগণা।
"	"	শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক ২২।১ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় সাতক্ষীরা, খুলনা।
"	"	শ্রীঅমূল্যধন চট্টোপাধ্যায় Dyer's Solan Brewery, P. O. (K. S. Ry.)
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীহরেন্দ্রমোহন লাহিড়ী এম্ এস্ সি, ৭৭ ল্যান্সডাউন রোড, বালীগঞ্জ।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	ডাঃ শ্রীঅম্বিকাচরণ মজুমদার এল্ এম্ এস্ ৮৯।১ গ্রে ষ্ট্রীট।

নিম্নলিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার শর্ম্মা	ঈশ্বরের স্বরূপ।
" কুলদাচরণ সরকার	নবীনা।
" কিরণচাঁদ দরবেশ	সঙ্গীত-সুধা।
" মোহিনীমোহন বসু	মায়ের আহ্বান।
" জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী।
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়	ধূলিকণা।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রলাল মিত্র	চন্দ্রকলা নাটক, দ্রৌপদী হরণ, পরিচয় ও পুষ্পাঞ্জলি, বিবাহ-সঙ্কট, হিন্দু-বিবাহ, মানস-কুসুম, জুবিলী, সাহিত্য ও সমাজ, শান্তিকানন, মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের জীবনচরিত।
„ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	আহুতি।
„ সতীশচন্দ্র সরকার	শান্তি।
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	গীতাপাঠ,
	রেখাক্ষরবর্ণমালা (১ম খণ্ড)
	ঐ
	ঐ
	ঐ
	ঐ
	ঐ
Supdt. Govt Printing India,	(1) Publication of the Department of Education 1911—14.
„ Govt Press, Madras,	(2) Descriptive Catalogue of Sanskrit MSS. in the Oriental M S Library Madras, Vol. 18.
Officer in charge, Bengal Sectt. Book Depot	(3) Annual Report of the Expert Officers of the Department of Agriculture, Bengal. For the year ending June 1914.
Asst. Secy, Marine Depot.	(4) Annual Reports of the Health Officers of the Ports of Calcutta & Chittagong.
Officer in charge, Bengal Sect. Book Depot	(5) Resolution on the Working of the District Boards in Bengal, during 1913-14.
Supdt. Govt. Printing, India.	(6) Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, for March 1915.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রলাল মিত্র	(7) Brahma Dharma.
	(8) Arther Blanc.
	(9) Popular Mineralogy.
	(10) Rudiments of Vegetable Physiology.
	(11) Stray Thoughts of Spiritualism.

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বীরভূমে প্রাপ্ত বরাহমূর্ত্তি ও হস্তিমূর্ত্তি, মুরশিদাবাদে প্রাপ্ত বরাহমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—মূর্ত্তিগুলি শিল্পকার্য্য হিসাবে অতি উৎকৃষ্ট। বরাহ-মূর্ত্তির হিরণ্যাখ্য দৈত্য অর্দ্ধনাগ-মূর্ত্তিতে প্রস্তুত। যাঁহারা এই সকল মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যথারীতি ধন্যবাদ জানান হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার গুপ্তবলভী-সংবৎ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—অমূল্য বাবু গুপ্তবলভী-সংবৎ সম্বন্ধে স্বপক্ষে বিপক্ষে যেখানে যাহা কিছু আলোচনা হইয়াছে, সে সমস্তের সারভাগ সঙ্কলন করিয়া তাহার বিচার করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এত সাবধানতা সহকারে যে প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, একবার শুনিয়া তাহার সমালোচনা করা যায় না। তবে তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়া এই প্রবন্ধ রচনা করিয়া ইহাতে যেরূপ গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ করিতে হয়। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—এত সংগ্রহ যে প্রবন্ধে আছে, তাহা না পড়িয়া কিছু বলা যায় না। অতএব আমিও অমূল্য বাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ করিতেছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন যে, মীরাটের বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন, মেদিনীপুরের বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ এবং মানভূমের সাহিত্য-সমিতিকে যথাক্রমে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মীরাট-শাখা, মেদিনীপুর-শাখা ও মানভূম-শাখা বলিয়া গণ্য করা হইল। এই তিনটি লইয়া সাহিত্য-পরিষদের সর্ব্বশুদ্ধ ১৫টি শাখা স্থাপিত হইল।

মীরাটের শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় মহাশয় বলিলেন,—মীরাট-শাখার সহকারী সভাপতিরূপে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমরা সেখানে যে কয় জন প্রবাসী বাঙ্গালী আছি, সকলে মিলিয়া এই সাহিত্য-সম্মিলনের সাহায্যে সরস্বতী পূজা, দুর্গোৎসব ও দোল করিয়া থাকি। বীণা লাইব্রেরী নামে একটি লাইব্রেরীও করিয়াছি এবং আমোদ আহ্লাদের জন্য সেইখানে একটি থিয়েটারও করিয়াছি। এখন আমরা সাহিত্য-পরিষদের সাহায্যে বাঙ্গালা সাহিত্যেরও কিছু কিছু আলোচনা করিতে পারিব। আপনারা আমাদিগকে সাহায্য করিবেন, আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন এবং তজ্জন্য আমরা ধন্যবাদ করিতেছি।

তৎপরে অম্বুজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করা হইল এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ করা হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

বিশেষ অধিবেশন

গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, ৬ই জুন ১৯১৫, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টায় সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে কবিবর ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের তৈলচিত্র-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

কবি কৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসের ৬ই তারিখে একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হয়। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় ইহার সম্পাদক ছিলেন। পরে "নন্দিনী" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ মহাশয় ঐ সমিতির সম্পাদক হইয়াছিলেন। কবির বাসভূমি খুলনা জেলার সেনহাটী গ্রামে তাঁহার ভিটাবাড়ীতে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের জন্য সেখানকার গ্রামবাসীরা একটি স্মৃতিসমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। উভয় স্মৃতিসমিতি শেষে একপরামর্শ হইয়া কাজ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই উভয় সমিতি উভয় স্থানে কবির স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে সকল ব্যবস্থা করেন, কলিকাতা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মহলা-নবীশ মহাশয় তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিবেন বলিয়া স্থির হয়।

এই দিন সভাগৃহে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সেনহাটীনিবাসী কবির বহু আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত ছিলেন। (দশম মাসিক অধিবেশনের বিবরণে সকলের নামাদি দেওয়া হইল)।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে, কৃষ্ণচন্দ্র-স্মৃতিসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মহলানবীশ মহাশয় সংক্ষেপে এখানকার ও সেনহাটীর স্মৃতিসমিতির যে কার্য্য-বিবরণ পাঠ করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

"১৩১৩ বঙ্গাব্দের ২৯শে পৌষ তারিখে কৃষ্ণচন্দ্র অস্তমিত হওয়ার পর সেনহাটী-নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন, মুন্সী শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত দাশগুপ্ত বি এ প্রমুখ মহোদয়গণের ঐকান্তিক যত্নে গ্রামে একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত দাশগুপ্ত বি এ মহাশয় ঐ সমিতির সম্পাদকের ভার গ্রহণ করেন। তাহার পর ধীরে ধীরে শুধু সেনহাটী-বাসিগণের নিকট সাহায্য লইয়া ভৈরবের কূলে মজুমদার-কবির বসতবাটীর সীমানায় একটি

স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত করিবার উদ্দেশ্যে—১০´×১০´×১½´ খোয়া ইত্যাদি ও ১০´×১০´×১´ গাঁথনি=১০ ফিট্ দীর্ঘ, ১০ ফিট্ প্রস্থ ও ২½ ফিট্ উচ্চ ভিত্তির উপর ৭½´×৭½´×১´ পরিমিত একটি ও তাহার উপর ৫´×৫´×১´ পরিমিত একটি ইষ্টক-বেদিকা প্রস্তুত করা হয়। স্থানীয় সংগৃহীত অর্থ এই কার্য্যেই খরচ হইয়া যায়। এই ভাবে ১৩১৮ সাল পর্য্যন্ত কাটিয়া যায়। ১৩১৮ সনের চৈত্র মাসে আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে কবিবর ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্মৃতি-স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থিত করি এবং আমার প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ১৩১৯ সনের ৬ই আশ্বিন তারিখে পরিষদের অধীনে নিম্নলিখিত ব্যক্তি-গণকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত হয় ;—

১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ (নন্দিনীর সম্পাদক, শিবপুর, হাওড়া)
২। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ।
৪। ,, ,, হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ।
৫। ,, ,, ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬। ,, ,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ।
৭। ,, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদক, বঙ্গদর্শন)।
৮। কবিরাজ ,, দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী—সম্পাদক।
৯। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ, বি এল্।
১০। মৌলবী মঞ্জুরান হাফেজ সাহেব (নড়াইল)।
১১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি।
১২। ডাক্তার ,, বনোয়ারীলাল চৌধুরী ডি এস্ সি।
১৩। কবিরাজ ,, যামিনীভূষণ রায় এম্ এ, এম্ বি।
১৪। ,, ,, হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরত্ন।
১৫। ,, চিত্তসুখ সান্যাল বি ই।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় সমিতির সম্পাদক মনোনীত হন।

১৩১৯ বঙ্গাব্দের ৮ই পৌষ তারিখে স্মৃতি-সমিতির প্রথম অধিবেশনে সমিতি সেনহাটী-বাসিগণের সহিত একযোগে (১) পরিষৎ মন্দিরে তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা, (২) সেনহাটী গ্রামে স্মৃতি-স্তম্ভ স্থাপন—এই দুই কার্য্যভার গ্রহণ করেন। স্বর্গগত ৺শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তৈল-চিত্রের সম্পূর্ণ ব্যয় প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। সমিতি সেনহাটীবাসিগণ কর্তৃক আরব্ধ ভিত্তির উপর মর্ম্মর-মণ্ডিত স্তম্ভ প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিতে প্রস্তুত হন। এই ভাবে ১৩২১ সালের আষাঢ় পর্য্যন্ত কাটিয়া যায়। শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ সেন শাস্ত্রী মহাশয় এই সময়ের মধ্যে বিশেষ কোনও কার্য্য করিতে সমর্থ হন না। অতঃপর ১৩২১ সনের ৮ই শ্রাবণ তিনি সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করায় সমিতি আমার উপর এই কার্য্যভার অর্পণ করেন।

আমি ১৩২১ সনের আশ্বিন মাসে স্থানীয় জনসাধারণের সহিত পরামর্শ করতঃ কার্য্য আরম্ভ করিবার আশায় সেনহাটী গমন করি। তথায় গিয়া এক সমস্যায় পতিত হই। পরিষৎকে কার্য্যে দ্রুত অগ্রসর হইতে না দেখিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার রায় এম্ এ প্রমুখ সেনহাটীর কয়েকটি যুবক নিজেরাই যে কোনও প্রকারে স্তম্ভ শেষ করিবার মতলব করেন। আমি যাওয়ার পর পরিষদের হাতে কাজ দেওয়া যাইবে, কি নিজেরাই শেষ করিয়া ফেলিলে ভাল হইবে—ইহা লইয়া গ্রামে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। অতঃপর ১৪ই আশ্বিন তারিখে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভায় পরিষদের হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করাই স্থিরীকৃত হয়।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আমি অর্থ সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করি। কিন্তু চারি দিক্ হইতেই উদ্যোগী গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ দেশের দুরবস্থায় আমাদিগকে কিছু দিনের জন্য বিলম্ব করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে থাকেন। আমরাও ঐ প্রকার অনুরোধ কার্য্যতঃ সঙ্গত বিবেচনা করি, অথচ ধীরে ধীরে যতটা পারা যায়, কার্য্য করিতে থাকি। এই ভাবে এই আট মাস কাটিয়া গেল। যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে দেশের অবস্থা ক্রমেই অধিকতর শোচনীয় হইতেছে; কবে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে, ভগবান্ই জানেন। আমার কিন্তু আর বিলম্ব না করিয়া যেরূপেই হউক, কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফেলাই সঙ্গত বোধ হয়। তাই আজ আমরা এই পরিষৎ মন্দিরে কবিবরের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত করিয়া স্মৃতিস্থাপনা-কার্য্যে সহায়তা করিবার নিমিত্ত আপনাদিগকে আবাহন করিয়াছি। যাঁহার প্রদত্ত অর্থে এই তৈলচিত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে, তিনি আজ ইহ জগতে নাই। আমরা সকলে মিলিয়া আজ সেই শৈলেশচন্দ্রের স্বর্গগত আত্মার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এখনও স্তম্ভ নির্ম্মাণ-কার্য্য বাকী রহিয়াছে। আবার ইতিমধ্যে কবিবরের অর্দ্ধমূর্ত্তি সংস্করণ ও তাঁহার নামে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব আসিয়াছে। আলিপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত করুণাকুমার দত্ত গুপ্ত এম্ এ, বি ই মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক মূর্ত্তি ও স্তম্ভের যে নক্‌সা ও জায় পাঠাইয়াছেন, তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৬০৬৲ টাকার হিসাব পাওয়া যায়। শুধু স্তম্ভে সর্ব্ব সমেত ৬০০৲ টাকা খরচ হইবে। কাজেই এই কার্য্যের নিমিত্ত আমাদিগকে ২০০০৲ দুই সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিতে হইবে। সেনহাটী গ্রাম হইতে এ পর্য্যন্ত ১২২৲ টাকা আদায় হইয়াছে; তাহার ১০৮৲ ব্যয় হইয়াছে ও ১৪৲ হাতে আছে। বাহির হইতে ৩২॥৹ পাইয়াছি, উহার মধ্যে পত্রাদিতে, যাতায়াতে ও ছাপার খরচ, কাগজ, খাতার খরচ ইত্যাদিতে ২৬৷৴১০ আজ পর্য্যন্ত খরচ হইয়াছে, বাকী ৬৶১০ আমার নিকট আছে। দেশের জনসাধারণের এই কার্য্যে তাঁহারাই সাহায্য করিবেন; আমি তাঁহাদের সেবক মাত্র। সাধারণের সহায়তা ব্যতীত আমাদের দ্বারা এ কার্য্য হওয়া অসম্ভব। বঙ্গের বিভিন্ন জেলার কয়েক স্থানে আমরা চাঁদা আদায়ের নিমিত্ত প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছি, অনেক স্থানে আমার নিজের যাইতে হইবে। এই সাত কোটী নরনারীর বঙ্গদেশে কবির স্মৃতি রক্ষার নিমিত্ত ২০০০৲ টাকা

সংগ্রহ করা একটা বেশী কিছুই নয়। আশা ও প্রার্থনা করি, মহাশয়গণ মুক্তহস্ত হইয়া এই প্রার্থিত কার্য্যে সাধ্যমত সাহায্য করিবেন ও অপরের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে ইতস্ততঃ বোধ করিবেন না।

অতঃপর আশুবাবু কবি কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা এই স্থানে উদ্ধৃত হইল ;—

আজ আমরা সকলে তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সমবেত হইয়াছি ; কিন্তু যিনি নিজে সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়া স্মৃতি-সমিতিকে এই তৈলচিত্র প্রদান করিয়া গিয়াছেন, আজ সেই স্বর্গীয় শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমাদের মধ্যে নাই, এ দুঃখ—এ অভাব কিছুতেই দূর হইবার নহে। অগ্রজপ্রতিম শৈলেশচন্দ্র কবিবরের স্মৃতিস্থাপন-কার্য্যে একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার স্বর্গগত শান্ত আত্মা আজ আমাদের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ উপভোগ করতঃ আমাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যে মঙ্গলাচরণ করুন, আমরা সকলে এই প্রার্থনা করি। তার পর যিনি বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া স্বর্গীয় কবির জীবন-চরিত প্রণয়ন করিয়াছেন, আমাদের স্মৃতি-সমিতির অন্যতম উদ্যোগী সদস্য সেই শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুপস্থিতির নিমিত্তও আমার মনে একটা অভাব বোধ হইতেছে। তিনি আমেরিকায় আছেন বলিয়া আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেও পারি নাই এবং সে জন্য আমি দুঃখিত।

আজ আমরা যে মহাপুরুষের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে আসিয়াছি, তিনি বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট পরিচিত, বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গের হিন্দু-মুসলমান তাঁহার নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী। ১২৬৭ বঙ্গাব্দে "সদ্ভাবশতক" প্রকাশিত হয়। সভাপতি মহাশয় ছাত্র-জীবনে সম্ভবতঃ ১২৬৮ বঙ্গাব্দে সদ্ভাবশতক পাঠ করেন। আজিও ঐ গ্রন্থের আদর্শ কবিতাবলী তাঁহার কণ্ঠস্থ আছে—এ কথা তিনি অস্বীকার করিবেন না। এইরূপ বঙ্গদেশে এমন লোক নাই, যিনি সদ্ভাবশতকের নীতি দ্বারা নৈতিক বল লাভ না করিয়াছেন এবং জীবন-গঠনে সাহায্য না পাইয়াছেন। আজিও অর্দ্ধাধিক বঙ্গবাসী কথায় কথায় কৃষ্ণচন্দ্রের কবিতা আদর্শস্বরূপ আবৃত্তি করিয়া গৌরব বোধ করেন। বঙ্গবাসীর পক্ষ হইতে এই কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আজ আমরা তাঁহার স্মৃতি স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। স্মৃতিরক্ষার কথা মনে হইলেই আমার কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের কথা মনে জাগে, তাঁহার বড় দুঃখের উক্তি—"সত্যই আমরা সেই জাতি, যাহারা চিতায় দেয় মঠ"—"থাকিতে দিলাম না এক কই, মরিলে দিব সাত কই"—"থাকিতে দিলাম না ভাত-কাপড়, মরিলে কবির দানসাগর" ; কথাগুলি বড়ই মূল্যবান্। মধুসূদন দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কবি কৃষ্ণচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় অপূর্ণ উদরে দিন কাটিয়াছে, এ সকল স্মৃতির দাহন সহস্র সৌধ দ্বারাও আবৃত করিয়া রাখা যায় না। তথাপি অনুতপ্ত হৃদয়কে তৃপ্ত করিবার জন্য এবং ভবিষ্যদ্বংশধরগণের নিমিত্ত একটা মহৎ আদর্শের ও দেশমাহাত্ম্যের গৌরব-স্মৃতি রক্ষণের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আমাদের মহাত্মাগণের স্মৃতি রক্ষা

করিতেই হয়। বর্ত্তমানের সহিত অতীত মিশ্রিত করিয়া ভবিষ্যৎ গঠনের নিমিত্ত অতীতের ইতিহাস ও নিদর্শন বহু মূল্য বহন করে। তাই আমরা স্মৃতিস্থাপনের পক্ষপাতী। নতুবা কবির স্মৃতি তিনি নিজেই সংরক্ষণ করিয়া যান, তাহার নিমিত্ত অপরের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক কবিবরের জীবন-চরিত প্রণীত হইয়াছে। তিনি নিজেও "রা সের ইতিবৃত্ত" অর্থাৎ রামচন্দ্র দাসের (কবিবরের বাল্যকালের গুপ্ত নাম) জীবনচরিত নাম দিয়া প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত আপন জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সময় অভাবে আজ তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে আমি বিশেষ আলোচনা না করিলেও বিশেষ কোনও দোষ হইবে না। যাঁহারা কবিবরকে না জানেন, তাঁহারা উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয় পড়িলেই তাঁহাকে জানিতে পারিবেন। ১২৪৪।৪৫ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে তদানীন্তন যশোহর (বর্ত্তমান খুলনা) জেলার অন্তর্গত সেনহাটী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৩১৩ বঙ্গাব্দে ২৯শে পৌষ তারিখে উনসপ্ততিবর্ষ বয়সে জ্বর রোগে সেনহাটীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। যে যশোহর জেলা মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু ও শিশিরকুমারের জন্মস্থান, সেই যশোহর জেলা কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মে পবিত্রিত। যশোহর প্রাচীনকাল হইতে কবিত্ব-গৌরবে গৌরবান্বিত। আজিও কবি মানকুমারী যশোহরের কবিত্ব-মান সংরক্ষণ করিতেছেন। সেনহাটী গ্রামকেও কবিত্বের ও প্রতিভার উর্ব্বর ক্ষেত্র বলিতে পারা যায়। কাব্যকুঞ্জ-কোকিল কৃষ্ণচন্দ্রের পরেও এই গ্রামের "বালকবন্ধু" ও "সখা"-প্রবর্ত্তক প্রমদাচরণকে মনে পড়ে। প্রমদাচরণের প্রতিভা ও সাহিত্য-সাধনার বলে "সখা" বঙ্গের বালক-জীবনে কত কার্য্য করিয়াছে, তাহা আপনারা অনেকেই জানেন। "সখা" মরিয়া যাওয়ার পর বঙ্গদেশের বালকদের ভাগ্যে আর তেমন "সখা" আজ পর্য্যন্ত মিলে নাই। অল্প বয়সে লোকান্তরিত না হইলে প্রমদাচরণের দ্বারা বঙ্গভাষা অনেক রত্ন সংগ্রহ করিতে পারিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বনামধন্য ৺ত্রিগুণাচরণ সেন, স্বর্গীয় পণ্ডিতরত্ন হরিনাথ বেদান্তবাগীশ ও পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু এই সেনহাটী গ্রামেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পরেই সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সেন গুপ্ত এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের কবি-প্রতিভা ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের গভীর গবেষণাপূর্ণ কঠোর সাহিত্য-সাধনার কথা মনে পড়ে। ইহাঁদেরই সহিত শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিতে হইবে। "সখা"র পরে "সাথী" তাহার স্থান অধিকার করে। এই "সাথী" বর্ত্তমান সভায় উপস্থিত ভুবনমোহনের সম্পত্তি। "সখা ও সাথী" কিছু দিন একত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার পর উহাদের মৃত্যু হইলে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন মহাশয় সখার স্মৃতিস্বরূপ "সখাপ্রেস" ও ভুবনমোহন সাথীর স্মৃতিস্বরূপ "সাথীপ্রেস" সংরক্ষিত করেন। এখনও ঐ দুইটি প্রথম শ্রেণীর ছাপাখানা সখা ও সাথীর এবং তৎসহ সেনহাটীর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ইহাঁদের পরেই আমাদের বাল্যাবস্থা। আমাদের বাল্যকালেও আমরা কয়েক জন সাহিত্য-রসের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। আমরা পাঠ্যাবস্থায় শিক্ষার নিমিত্ত হাতে লিখিয়া ভাই-বোন, একতা, স্রোত প্রভৃতি নামের মাসিক পত্রিকা চালাইতাম। ভাই-বোন্ ও একতা ছাপাও হইয়াছিল।

যাহা হউক, এই সময়ে অনেকের মধ্যেই সাহিত্য-রসের ও কবি-প্রতিভার উৎস জাগিয়া উঠে। তন্মধ্যে আমার পরলোকগত বন্ধু ৺সতীভূষণ সেনের কথা মনে পড়িলেই আমার চক্ষে জল আসে। সতীভূষণ অল্প বয়সেই "মুকুল" নামে একখানি কবিতাগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশিত করেন। তারপর অনেক আশা প্রাণে লইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। আমাদের দলের মধ্যে সুপরিচিত গল্পলেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন গুপ্ত, বগুড়ার উকীল ও তত্রস্থ সাহিত্য-পরিষৎ-শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত এখন সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত। আমাদের পরবর্ত্তিগণের মধ্যেও কয়েক জনকে আবার এই রসাস্বাদন করিতে দেখিতে পাইতেছি। আমার সম্পাদিত "নন্দিনী"তে পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সেন গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ অজিৎকুমার, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন গুপ্ত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রবোধচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন মুন্সী মহাশয়ের পুত্র শচীন্দ্রনাথ কবিতা ও গল্পাদি লিখিয়া থাকে।

এই কবিত্বস্মৃতির উপযুক্ত ভূমি সেনহাটীতে ভৈরব নদের তীরে কবিবরের নিজ বসত বাটীতে বিকসিত কামিনী-কুসুম তরুতলের অদূরে আমরা বাঙ্গালী জাতির প্রাণস্বরূপ বঙ্গের দ্বিতীয় স্বভাব-কবি (প্রথম ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত) স্বভাবের প্রতিপালিত, সংসারে অনাসক্ত, আজীবন সতত ধ্যানাগ্রমনা কৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত করিবার সংকল্প করিয়াছি। এই তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা তাহারই আনুসঙ্গিক কার্য্যমাত্র।

কবিবর কৃষ্ণচন্দ্রের কাব্য-জীবন সম্বন্ধে তাঁহার জীবনীতে আলোচনা করা হইয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার স্থান কোথায়, তদ্বিষয়ে আজ আমার আলোচনা করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই; কারণ, নিশ্চয়ই আমাপেক্ষা অনেক অধিক ক্ষমতাবান্ উপস্থিত সুধীগণ তদ্বিষয়ে সমালোচনা করিবেন, তথাপি না বলিলে চলে না—আমাদের বর্ত্তমান সমস্যায় জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে যথার্থ উপযুক্ত মূল্যবান্ অনেক উপকরণ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বঙ্গের পর্ণ-কুটীরের খাঁটী স্বদেশী কবি ছিলেন। তাঁহার কবিতা সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী জাতির স্বাভাবিকতায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি হাফেজ ও অন্যান্য সুফী কবিগণের অনুকরণ অনুসরণে বাহ্যজ্ঞানহীন ধ্যানীর ন্যায় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন; তাই সাধারণ অনভিজ্ঞগণ তাঁহাকে উন্মাদ বলিত। প্রকৃতির সরল শান্ত শিশুর অন্তর বাহির একই ছিল। বাহিরেও তিনি সর্ব্বপ্রকার অপ্রার্থিতের অত্যাচার হইতে স্বাধীন ছিলেন; অন্তরেও সেই একই ব্যবস্থা। তিনি নিজে সম্পূর্ণরূপে বিলাসিতা-বর্জ্জিত ছিলেন—তাঁহার লেখনীও জলন্ত অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে,—

"হে বিলাসী ভোগসুখ-অভিলাষী নর,
ভুলেছ কি দেহ তব নিতান্ত নশ্বর ?
পরিণাম ভস্ম অঙ্গে কেন বিলেপন,
কেন বেশ-ভূষা তার সৌষ্ঠব সাধন ?

কালের কঠোর হিয়া রূপে মুগ্ধ নয়।
শোভাধার পূর্ণ শশী রাহুগ্রস্ত হয়।"

বর্ত্তমান যুগে আমাদিগের কর্ম্মক্ষেত্রে বিলাসিতা বর্জ্জন না করিলে আমরা কোনও কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিব না। কবির আদর্শ উক্তি সতত চক্ষের সম্মুখে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রাখিয়া দৈববাণীরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়।

তার পর কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হওয়ার সময়ে অবসাদ উপস্থিত হইতে পারে। যাতনার নিষ্পেষণে ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা। কর্ম্মী! ঐ শুন, তোমার উন্মাদ কবি কৃষ্ণচন্দ্র তোমাকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিতেছেন,—

"কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ?
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ?
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে?
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?"

তার পর স্বকার্য্য সাধিতে যদি জীবনের আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে চিত্ত প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে। কর্ম্মী! তাই তোমার জাতীয় জীবনের স্বভাব-কবি উন্মত্ত আবেগে বলিতেছেন,—

"ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।
* * * *
প্রস্তুত সর্ব্বদা আছি তোমার কারণ,
এস সুখে তোমায় করিব আলিঙ্গন।"

এইরূপ কত কি বলিব? সদ্ভাবশতকের প্রতি পৃষ্ঠা এইরূপ অমূল্য উপদেশ ও আদর্শে পরিপূর্ণ। জাতীয় জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে এত বড় সহায়ক কবি জগতে অতি অল্প দেশেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র যেমন আদর্শ-কবি, তেমনি আদর্শ-চরিত্রের লোক ছিলেন। একাধারে তেমন সত্যনিষ্ঠা, চিত্তের স্বাধীনতা, আত্মাবস্থায় তৃপ্তি, বিলাসবিহীনতা, অনাড়ম্বর, পরোপকার-ব্রত, বিষয়ে অনাসক্তি, অসহ্য বাহ্যিক যাতনায় চিত্তের প্রসন্নতা ও ঈশ্বরাসক্তি, সর্ব্বজীবে সম প্রেম, স্বার্থত্যাগ, শারীরিক ও মানসিক সহিষ্ণুতা, সময়ের মূল্যজ্ঞান বোধ হয় জগতে অতি অল্প জীবনেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এরূপ মহাপুরুষ যে দেশে জন্মে, সে দেশ পবিত্র হয়, ধন্য হয়। দুঃখের বিষয়, জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে সকলে পাগল জ্ঞান করিয়া যে জ্ঞানে তিনি অজ্ঞান ছিলেন, তাহার সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করে নাই। এখন তাহার নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইতেছে। পল্লীগ্রামে দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া দীনহীন কাঙ্গালের ন্যায় অনাদরে অনশনে অজ্ঞাতে তাঁহাকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অবস্থান্তরের মধ্যে অবস্থিতি করিলে, আত্মপ্রকাশ করিবার বাসনা তাঁহার থাকিলে, তিনি বোধ হয়, অনেকের উপরে আসন পাইতেন।

কৃষ্ণচন্দ্র সম্ভাবশতক, রা-সের ইতিবৃত্ত, মোহভোগ ও কৈবল্যতত্ত্ব—এই চারিখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন, তদ্ব্যতীত (৫) নলোদয়ের বঙ্গানুবাদ, (৬) রাবণবধ নাটক, (৭) সৎপ্রেক্ষণ (দৃশ্যকাব্য), (৮) সংস্কৃত গদ্য-পদ্য স্থাপনাবিধি, (৯) অনুবাদিত স্তোত্র, (১০) সংস্কৃত ব্যাকরণ, (১১) ভারতেশ্বরীর নিকট প্রার্থনীয়া রাজনীতি, (১২) বিবিধ সঙ্গীত, (১৩) সংস্কৃতে রচিত চম্পুকাব্যম্, (১৪) ছাত্রনীতি ও সঙ্গীতবীথিকা প্রভৃতি অপ্রকাশিত গ্রন্থ আছে। ঐ সকল গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশ করিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে ভাল হয়; নতুবা উহার বিনাশের সহিত বঙ্গের অনেক রত্ন বিলুপ্ত হইবে। তিনি যথাক্রমে ঢাকাপ্রকাশ, বিজ্ঞাপনী ও দ্বৈভাষিকী নামক পত্রিকা সম্পাদকের কার্য্য করেন। আমি তাঁহার দ্বৈভাষিকী কয়েক খণ্ড, রা-সের ইতিবৃত্ত ও কৈবল্যতত্ত্ব—তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়া অদ্য পরিষদের হস্তে সমর্পণ করিলাম। আপনারা যে কেহ ঐ সকল গ্রন্থ না পড়িয়াছেন, তাঁহারা পড়িয়া দেখিতে পারেন।

এই বার ইন্দুবাবুর লিখিত কবিবরের জীবনীতে উল্লিখিত হয় নাই, এইরূপ দুই একটি কথা সংক্ষেপে বলিয়াই অদ্যকার সংক্ষিপ্ত সভায় আপনাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। আমা অপেক্ষা তাঁহাকে অনেক অধিক জানেন, এরূপ অনেকেই এখানে উপস্থিত আছেন; তাঁহারা কবিবরের বিষয়ে অনেক নূতন কথা বলিবেন।

কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে যশোহর হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সেনহাটী আসেন। আমিও ঐ বৎসর ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া সেনহাটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হই। তদবধি সাত বৎসর আমি কৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করিয়াছি। তিনি একাধারে কবি ও সাধক ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি আজীবন শিশুর ন্যায় সরল ছিল। শেষ জীবনে তিনি অতিরিক্ত মদ্য পান করিতেন, তাহাতে প্রায় কোনও সময়েই তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না—কিন্তু সুরা কোনও দিন তাঁহার অন্তর্জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য জন্মাইতে পারে নাই। তিনি কালীবাড়ী পড়িয়া থাকিতেন। পরিধানে ছিন্ন মলিন ছোট কাপড়—মুখে হাসি ও শ্যামাবিষয়ক গান, এই ভাবে দেখিতে দেখিতে সময় সময় তাঁহাকে ধ্যানস্থ বলিয়া বোধ হইত। আমরা তদবস্থায় কালী-মাতাকে প্রণাম করতঃ তাঁহাকে প্রণাম করিতাম। তিনি নিজে রচনা করিয়া প্রায় সময়ই নূতন নূতন গান গাহিতেন, কেহই পাগল ভাবিয়া তাহা লক্ষ্য করিত না। গীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সকল গান লুপ্ত হইয়া যাইত। মজুমদার মহাশয়ের নিজেরও এ বিষয়ে কোনও লক্ষ্য ছিল না। তখন ঐ সকল গানের মূল্য বুঝিতাম না—বুঝিলে লিখিয়া রাখিলে কাজ হইত। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমি কিছু দিনের নিমিত্ত মজুমদার মহাশয়ের নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িয়াছিলাম। তাঁহার বাড়ীতে গিয়া পড়িতাম। তিনি তখন চক্ষে দেখিতেন না। টীকা টীপ্পনী সমেত মুগ্ধবোধ মুখে মুখে পড়াইতেন। তখনও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ-খানি আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত মূল ও টীকা সম্পূর্ণ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। যেমন পারসী ভাষায়, তেমনি সংস্কৃতে তাঁহার অসীম জ্ঞান ছিল। ইংরাজী ভাষা তিনি অতি সামান্যই শিখিয়া-

ছিলেন। তিনি ছোট ছোট কাগজের খণ্ডে অনবরত কি লিখিয়া ফেলিয়া দিতেন; কেহই তাহা সংগ্রহ বা গ্রাহ্য করিত না। কলম মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিয়া (মুটকলমা) কাগজখানি একেবারে চক্ষের সম্মুখে নিয়া বড় বড় অক্ষরে লিখিতেন। তখন তত বুঝিতাম না। বুঝিলে ঐ সকল সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম। শুনিয়াছিলাম, ঐ সময়ে তিনি "নীতিশতক" নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ও কেহ তাঁহার ঘর হইতে উহার পাণ্ডুলিপি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তার পর সে বিষয়ে আর কিছুই শুনি নাই। তিনি আমাদিগকে সন্তানের ন্যায় আদর করিতেন। হাতে পয়সা হইলে কোনও কোনও দিন স্কুল ছুটীর পূর্ব্বে মেঠাই কিনিয়া লইয়া রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া থাকিতেন ও ছাত্রগণকে উহা বিতরণ করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিতেন। কন্যার বয়স প্রায় ১৬ বৎসর। বিবাহের চেষ্টার বিষয়ে কথা উঠিলে তিনি বলিলেন,—"যিনি কন্যা দিয়াছেন—তিনি বিবাহ দিবেন। আমার মাথাব্যথা নাই।" এরূপ লোককে গৃহস্থ মাত্রেই পাগলই বলে। কিন্তু এই পাগলের প্রতি বিষয়েই ঈশ্বরের প্রতি এইরূপ বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল। যে দিন তাঁহার মুখ হইতে ঐরূপ কথা বাহির হইল, তাহার অল্প দিন পরেই একজন আশাতীত সুপাত্র উপযাচক ভাবে আসিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিলেন। মাতৃশ্রাদ্ধের সময়ে জীবিত মৎস্য বাড়ী আনা হইয়াছিল। অহিংসা পরমো ধর্ম্মের সাধক তাহা টের পাইয়া সকল মাছ নদীতে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন। ফলে চাকর-বাকরেরা সেগুলি সরাইয়া ফেলিয়া বলিল,—নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। চৈত্র মাস—ধান দুর্ম্মূল্য। একজন আত্মীয় আসিয়া বলিলেন—"মজুমদার মহাশয়, আমার খাবার ধান নাই, আপনার গোলা হইতে কিছু ধান দিন, শ্রাবণ ভাদ্র মাসে আমি ধান পাইলে শোধ দিব।" নিরাপত্তিতে মজুমদার কবি হুকুম দিলেন, ধানের গোলা হইতে যাহা দরকার, নেও। আত্মীয় ইচ্ছামত ধান লইয়া চলিয়া গেলেন। মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী বাড়ী ছিলেন না। বাড়ী আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন—কি খাবেন? যে ধান আছে, তাহাতে কুলাইবে না। দুর্ম্মূল্যের সময় টাকা দিয়া কিনিতে হইবে, পরে সস্তার সময় আত্মীয় ধান শোধ করিবেন! বাজারে জিনিষ কিনিতে গিয়াছেন। গোপাল বেহারা কাঁঠালের দর বলিল ⁄১০; মজুমদার মহাশয় ⁄১০ দিলেন। গোপাল ৫১০ ফিরাইয়া দিয়া বলিল, 'ইহার উচিত দাম ⁄০।' মজুমদার কবি গালাগালি দিয়া বলিলেন,—"তুই মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর—তোর জিনিষ নিব না।" আর কোনও দিন তাহার নিকট কোনও জিনিষ কিনিতেন না। এইরূপ কত কি বলিব? আমাদের কবি কৃষ্ণচন্দ্র এইরূপ এক ভাবের পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বভাব-কবি ও জাতীয় কবি। তদ্ভিন্ন তিনি ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। যদি তিনি গুপ্ত না থাকিয়া প্রকাশিত হইতেন—তাহা হইলে জগতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহিত একাসনে তাঁহার স্থান হইত। এখন আমরা তাঁহার স্মৃতিরক্ষা-কার্য্যে কৃতকার্য্য হইলে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিব।"

এই প্রবন্ধ পাঠের পর আশু বাবু কবির রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ এবং তাঁহার সম্পাদিত সংস্কৃত-বাঙ্গালায় দোভাষী মাসিকপত্রের কয়েকখানি সংখ্যা এবং রা-সের ইতিবৃত্ত নামে কবির

স্বলিখিত একখানি মুদ্রিত আত্মজীবন-চরিত সাহিত্য-পরিষৎকে উপহার দান করেন। কবি রামচন্দ্র দাস—এই গুপ্ত নামে এই জীবন-চরিতখানি লিখিয়া নামের আরও সংক্ষেপ করিয়া রা-সের ইতিবৃত্ত নামে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে কবির প্রৌঢ়-জীবনের ঘটনা পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে।

বহু ধন্যবাদ জানাইয়া আশু বাবুর এই সকল দুষ্প্রাপ্য উপহার গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় সভাস্থ অন্য সকলকে কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে স্ব স্ব বক্তব্য বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

"মালঞ্চ"-সম্পাদক ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—আজ আমরা যাঁহার স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি, আমি তাঁহার স্বগ্রামবাসী এবং জ্ঞাতি। তিনি কবি ছিলেন, শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন, ভক্ত কবি ছিলেন, সাধক কবি ছিলেন। তাঁহার কবিতায় তাঁহার সেই সমস্ত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি যে কবিতাগুলি লিখিয়া গিয়াছেন, সেগুলি খাঁটী বাঙ্গালা কবিতা, খাঁটী বাঙ্গালীর কবিতা। আমার অপেক্ষা তাঁহার কবিত্ব বুঝেন, তাঁহার কবিত্ব বুঝাইয়া দিতে পারেন, এমন বহু ব্যক্তি আজ এইখানে উপস্থিত আছেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্বময় জীবনের কথা তাঁহার গ্রামের বাহিরে ফুটিয়া উঠে নাই, গ্রামের বাহিরেও তাহা কেউ জানে না। কৃষ্ণচন্দ্রের হাব-ভাবে, চাল-চলনে, আচার-ব্যবহারে লোকে তাঁহাকে পাগল বলিত। বাস্তবিকও তিনি কতকটা পাগলের মতই ছিলেন। সাধক কবি মাত্রই অতীন্দ্রিয় ভাবে বিভোর থাকেন, কাজেই তাঁহাদের পাগল বলা চলে। কবির ও সাধকের এইরূপ পাগলামির ভাব অনেকেই বুঝিতে পারেন। কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের একটা বিশেষত্ব এই যে, সর্ব্বদাই তাঁহাকে একটা কোন ভাবে বিভোর থাকিতে দেখা যাইত। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্পর্কে গুরুজন ছিলেন বলিয়া আমরা দূর হইতে লক্ষ্য করিতাম যে, তিনি যেন আমাদের কেহ নন, বাহিরের কেউ। তাঁহার কথায় বার্ত্তায়, ভাবে ভঙ্গীতে এই ভাবটা বেশ অনুভব করা যাইত। তাঁহার এই পাগল ভাবের আর একটা বিশেষত্ব ছিল যে, সকল মানুষের দোষ-গুণেরই একটা বিশেষত্ব থাকে, আমাদের মত বুদ্ধিমানেরা সেগুলাকে মানিয়ে নিয়ে চলে, আর কবি কৃষ্ণচন্দ্রের ধাতের লোকেরা সেগুলাকে মানিয়ে নিয়ে চলিতে চাহেন না বা পারেন না। তাঁহার সরলতা, নির্ভীকতা, সাধুতা, দৃঢ়তা এমন ছিল যে, লোকে তাহাকে অত্যন্ত অধিক মনে করিয়া সেইগুলির জন্যই পাগল বলিত। দু-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া উচিত,—তিনি মলিন বস্ত্রে, খালি পায়ে থাকিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। ঐ বেশে কোথাও যাইতে বিরক্ত হইতেন না। তাঁহাকে পরিস্কার কাপড় পরিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনেই পরে না।

২। যশোহর স্কুলে তিনি পণ্ডিতী করিতেন। স্কুলের কাছেই বাসা ছিল। খাইতে খাইতে স্কুল বসিবার ঘণ্টা বাজিতেছে শুনিয়া সেই উচ্ছিষ্ট হাতেই ছুটিয়া গিয়া ক্লাসে পড়াইতে বসিতেন।

৩। তাঁহার মত ছিল, ষোল বৎসরের কমে মেয়ের বিবাহ দিবেন না। ইতিমধ্যে পাত্র

পাওয়া গেল, কিন্তু কেহই সাহস করিয়া তাঁহাকে বলিতে পারিল না। শেষে অন্য বাড়ীতে গোপনে আয়োজন করিয়া গায়ে হলুদ দেওয়া হয়। তখন তিনি জানিতে পারিয়া মহা রাগ করেন, কিন্তু তখন আর উপায় নাই দেখিয়া বিবাহ দিতে বাধ্য হন।

৪। বাজারে গিয়া দ্রব্যাদির দর করিতেন না, ফাউ নিতেন না। বাড়ী আসিয়া দ্রব্যাদি দরের উপর গণনায় বেশী হইলে তাহা লইয়া গিয়া ফেরত দিয়া আসিতেন।

৫। তাঁহার পৌত্রের অন্নপ্রাশনের সময় তাঁহাকে আয়োজন করিতে বলিলে তিনি বলিলেন, টাকা নাই, দিব না। শিশুর মাতামহ খরচ-পত্র দিতে চাহিল। কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন,—দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন দেওয়ার নিয়ম নাই। আমার পৌত্রের অন্নপ্রাশনের খরচ তারা দিবে কেন? আমিই বা তাহাদের কাছে লইব কেন? অবশেষে জোর করিয়া আয়োজন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, তবে এ কাজ যখন আমার নয়, তাহাদের, তখন তাহারা আমার বাড়ীর ভাড়া দিক। এ ভাড়া আদায় হইয়াছিল কি না, জানি না। কিন্তু এমনই তাঁহার সততা, নির্ভীকতা, দৃঢ়তা। আর সেগুলা এইরূপ উৎকট ছিল বলিয়াই লোকে তাঁহাকে পাগল বলিত। তিনি দারিদ্র্যের কষ্ট অনুভব করিতেন না। তিনি এই পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবীটা সর্ব্বপ্রকারে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন। পৃথিবীর কিছুতেই তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিত না।

ভূতপূর্ব্ব সখা ও সাথীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় মহাশয় বলিলেন,—কবি কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার, কালীপ্রসন্ন বাবু সবই বলিয়াছেন। আমার বিশেষ কিছুই বলিবার নাই। আমরা যখনই তাঁহাকে দেখিয়াছি, ভাবে বিভোর থাকিতে দেখিয়াছি, কখনও তিনি আত্মপ্রকাশ করিতেন না। তিনি নিরহঙ্কার পুরুষ ছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ এই পল্লী-কবির স্মৃতি রক্ষার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা সে জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু দাস গুপ্ত বি এ (প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্) মহাশয় বলিলেন,—আমিও তাঁহার জ্ঞাতি, স্বগ্রামবাসী। তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিবার, কালীপ্রসন্ন বাবু সকলি বলিয়াছেন। আমি তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিও না। আমরা তাঁহার জ্ঞাতি হইলেও তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য কোন চেষ্টা করি নাই। সাহিত্য-পরিষৎ এই কার্য্যের ভার নিয়াছেন, এ জন্য আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। সাহিত্য-পরিষদের এই চেষ্টায় আমাদেরও লজ্জা রক্ষা হইল। সেনহাটিতেও যে চেষ্টা হইতেছে, সাহিত্য-পরিষৎ পশ্চাতে না দাঁড়াইলে সে চেষ্টার ফল কি হইত, তাহা বলিতে পারি না। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মণ্ডল মহাশয় বলিলেন,—কবি কৃষ্ণচন্দ্র যশোহর স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার যেমন সহজেই রাগ হইত, আবার তেমনি অতি সহজেই ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেন। তাঁহার সততায় এবং ধর্ম্মভীরুতায় বাজারে কেহ তাঁহাকে ঠকাইত না। বেশ-ভূষার অভাব তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। আমি তাঁহার ছাত্র ছিলাম। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় বলিলেন,—পূর্ব্বের বক্তারা তাঁহার জ্ঞাতি-কুটুম্ব ও ছাত্র; আমি তাঁহার স্বদেশবাসী। এ জন্য গৌরব অনুভব করি। তাঁহার গ্রামের

৬।৭ মাইল দূরে আমার বাড়ী হইলেও আমি কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। বাল্যকাল হইতে তাঁহার গুণগ্রামের কথা শুনিয়া আসিতেছি। গল্প-প্রবাদের মত তাঁহার চরিত্র-মহিমা চলিয়া আসিতেছে। আমাদের অঞ্চলে তাঁহার কথা কাহাকেও চেষ্টা করিয়া শুনিতে হয় না। আমরা যখন পড়িতাম, তখন সাধু চরিত্রের মহত্ব দেখাইবার জন্য শিক্ষকেরা তাঁহার কবিতা সজীব করিয়া তুলিতেন। তাঁহার কবিত্ব খাঁটী বাঙ্গালী পণ্ডিতের কবিত্ব; তিনি সভাপণ্ডিত, দ্বারপণ্ডিত বা বৈঠকখানার কবিদের মত কবি ছিলেন না। তাঁহার জীবন তাঁহার কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে কালের ও এ কালের শিক্ষিতের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, এমন কবি কৃষ্ণচন্দ্রের মত আর নাই। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—অমরা যখন মাইনর ছাত্রবৃত্তি পড়ি, তখন সদ্ভাবশতক পড়িতাম। অবসর পাইলে ইহাঁর কবিতা পড়িতে ভাল লাগিত। আমরা পড়িতাম, আর আমাদের পরিবারের স্ত্রীলোকেরা এবং বৃদ্ধেরা অত্যন্ত আদরের সহিত শুনিতেন। অনেক কবিতা এখনও আমাদের মুখস্থ আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এরূপ কবির জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার উপযুক্ত হয় নাই। তথাপি একেবারে কিছু না হওয়ার অপেক্ষা কিছুও করা ভাল। এই তৈল-চিত্রখানি আমাদের পরম আদরের বস্তু হইবে। এখন এই পর্য্যন্তই হউক, পরে আরও বিশেষ ব্যবস্থা হইতে পারে।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেন মহাশয় বলিলেন,—কবিবর কৃষ্ণচন্দ্রের শব্দ প্রয়োগ বড়ই সার্থক। শাস্ত্রে পড়িয়াছি, একটি শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ হইলে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে অভীষ্ট দান করে। আমার বিশ্বাস, কবিবরের কবিতা দ্বারা অনেকে মানুষ হইয়াছেন। এই বৈদ্য কবির স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ কেবল যে সেনহাটীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন, তাহা নহে, বৈদ্য জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

যশোহরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—কবি কৃষ্ণচন্দ্র দয়ার আধার, দেবতার মত মানুষ ছিলেন। এক দিন ট্রেণে তাঁহার সহিত আসিতেছিলাম। গাড়ীতেই জ্বরে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি। সারা রাস্তা তিনি আমার সেবা করিয়াছিলেন। শেষে আমার গন্তব্য স্থানে আমার সহিত নামিয়া দুই দিন থাকিয়া আমার সেবা শুশ্রূষা করিয়া সে যাত্রা আমাকে রোগমুক্ত করেন। সদ্ভাবশতকে উচ্চ ভাব আছে বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের উচ্চতা তাহাতে ফুটিয়াছে কি না, সন্দেহ।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—কবি কৃষ্ণচন্দ্র যখন ঢাকায় ছিলেন, সেখানে তাঁহার কথা শুনিয়াছি। আমি তাঁহার ব্যক্তিগত কিছু জানি না। তবে কবির স্মৃতি কাব্যে আদর। একজন খাঁটী বাঙ্গালী কবির স্মৃতি রক্ষার্থ আজ আমরা যে এই বিদেশী ভাবের অনুষ্ঠান করিয়াছি, ইহা আমাদের বিদেশী সংস্রবের মনুষ্যত্ব শিক্ষার ফল। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিবার জন্যই কলম ধরিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গেই সে চেষ্টা যেন লোপ হইয়াছে। তাঁহার কবিতাগুলিতে বঙ্গভাষা ধন্য ও গৌরবান্বিত।

মিরাট শাখার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় মহাশয় বলিলেন,—আমি সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে—বিশেষতঃ একজন মহাকবির স্মৃতিরক্ষার সভায় উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। কবি কৃষ্ণচন্দ্র যশোহরের নয়, খুলনার নয়, তিনি সমস্ত বাঙ্গালা দেশের—সমস্ত বাঙ্গালীর কবি। খগেন্দ্র বাবু যেমন বলিয়াছেন, তেমনি আমারও বাল্য-জীবনে সদ্ভাবশতকের প্রভাব খুব বেশী হইয়াছিল। এখন ঘটনাচক্রে মাতৃভূমি হইতে আমাকে বহু দূরে থাকিতে হয়। কিন্তু এখনও আমি তাঁহাকে কবি বলিয়া পূজা করি। তিনি বৈদ্য কবি নহেন, তিনি বাঙ্গালার কবি, তিনি সেনহাটীর কবি নহেন, তিনি সমস্ত বাঙ্গালার কবি। আমাদের এইরূপ সব সঙ্কীর্ণ ভাব ত্যাগ করা উচিত। বহু দূরের প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের পক্ষ হইতে আমি এ ভাব আপনাদিগকে জানাইতেছি। আমার এ দেশে আসা ঘটে না। সাহিত্য পরিষৎ দেখা ঘটে না। আমি আজ কৃতার্থ হইয়াছি। আমি যেন তীর্থযাত্রায় আসিয়া অভীষ্ট দর্শন করিয়াছি। আপনাদের ন্যায় একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবীদিগকে দেখিয়া ধন্য হইলাম। আমরা প্রবাসে থাকিয়া কয়জন বাঙ্গালী মাতৃভাষার আলোচনার একটি ক্ষুদ্র আয়োজন করিয়াছি। মিরাটে সেই ক্ষুদ্র সাহিত্য-সম্মিলনকে আপনারা সাহিত্য-পরিষদের শাখা করিয়া লইয়াছেন। আমরা ধন্য হইয়াছি। মিরাটবাসীর পক্ষ হইতে সে জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। কয়েকটিমাত্র বাঙ্গালী জীবন ভ্রাতৃস্নেহ হারাইয়া বহু দূরে পড়িয়া আছে, আপনারা আমাদিগকে ভুলিয়া থাকিবেন না। আমরাও কিছু কিছু চেষ্টা করিতেছি, আপনারা আমাদিগকে সাহায্য করিতে ভুলিবেন না। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন,—আমরা ভুলিয়া থাকিব না। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের লিখিত "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রবাসী ভ্রাতৃবর্গকে আমাদের অতি নিকটে আনিয়া দিয়াছে। প্রবাসী ভ্রাতৃবর্গ সর্ব্বত্রই মাতৃভাষার আলোচনা করিতেছেন, কাজেই আর তাঁহাদিগকে দূরে ফেলিয়া রাখিতে পারিব না।

অতঃপর শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—কবি কৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃতিসভার নিমিত্ত আধ ঘণ্টামাত্র সময় ছিল। তাঁহার ন্যায় কবির কথা আধ ঘণ্টার মধ্যে শেষ হইতে পারে নাই, তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম। বালককাল হইতে তাঁহার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে আমি তাঁহাকে এমন করিয়া খাটো করিতে পারি না। এখনও যদি কবির সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকে, বলিতে পারেন। আমি আজ তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি। সদ্ভাবশতকের কবিকে আমি গুরুর ন্যায় পূজা করি এবং এখনও পূজা করিতেছি। তাঁহার অনেক কবিতা এখনও আমার মুখস্থ আছে। তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট আর অনেক কথাই শুনা গেল। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার এই চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ধন্য হইলেন। সেনহাটীরও দুঃখ করিবার কিছুই নাই। ধীরে ধীরে চেষ্টা করুন, সফল হইবেন। ইহার জন্য ঢাক-ঢোল লইয়া ছুটিতে হইবে না। স্মৃতি স্থাপনের এটিকেট মাত্র

দুই হাজার টাকা। আলিপুরের ইঞ্জিনিয়ার করুণাবাবু এবং কবির এতগুলি কৃতবিদ্য আত্মীয় একত্র চেষ্টা করিলে এই সামান্য টাকা উঠাইতে কষ্ট পাইতে হইবে না। শীঘ্র না হউক, লজ্জার কথা নয়; ধীরে ধীরে উঠাইবার চেষ্টা করা হউক।

অতঃপর শাস্ত্রী মহাশয় কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া বলিলেন,—যাঁহার অনুগ্রহে ছবিখানি আজ এখানে প্রতিষ্ঠা করিলাম, সেই শৈলেশচন্দ্র আজ আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। তিনি এখন ধন্যবাদের অতীত।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া দশম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যারম্ভ করা হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

৺পিয়ারীচাঁদ মিত্রের শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে

বিশেষ অধিবেশন

৬ই শ্রাবণ, ১৩২১

সভাপতি—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু

গত ৬ই শ্রাবণ বুধবার ৺পিয়ারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের শততম জন্মদিন উপলক্ষ্যে পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের সমর্থনে প্রবীণ নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—আজ যে মহাত্মার শততম জন্মের দিনে সভা হইতেছে, তাঁহার প্রতি আমার প্রভূত সম্মান ও শ্রদ্ধা থাকিলেও আমাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও সভাপতি হইলে শোভন হইত। সেরূপ কেহই উপস্থিত না থাকায় অশোভন হইলেও সভার আদেশ আমার শিরোধার্য্য।

তৎপরে সুকবি, হুগলীর জজ শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম এ, সি এস মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পড়া হইল।

শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আপনার ১লা শ্রাবণ তারিখের কার্ড ও ২রা শ্রাবণ তারিখের পত্র একত্রে প্রাপ্ত হইলাম। টেকচাঁদ ঠাকুর মহাশয় যে বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠনকর্ত্তৃগণের মধ্যে একজন বিশেষ

ভাবে অগ্রণী ছিলেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই এবং তাঁহার শততম জন্মদিনের স্মৃতি সমারোহে রক্ষিতব্য ও অনুষ্ঠেয়। এ সভায় যোগদান করা আমি একটি কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণনা করি। বঙ্গসাহিত্য টেকচাঁদ ঠাকুরের নিকট যে প্রকার বিশেষভাবে ঋণী, তাহার জন্য ত বটেই, অধিকন্তু টেকচাঁদ ঠাকুরের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সহিত আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের ও সেই সূত্রে আমার নিজের যে প্রকার ঘনিষ্ঠ ও প্রীতিমূলক সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে এই অনুষ্ঠানে যোগদান আমি একটি পবিত্র কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি এখন কঠিন পীড়ায় শয্যাগ্রস্ত। বহু বর্ষ পূর্ব্বে, টেকচাঁদ ঠাকুরের জীবিতকালে, আর একবার অন্য প্রকারের কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলাম। তখন যে প্রকার স্নেহের সহিত, সেই ব্যাধি হইতে মুক্তিকল্পে টেকচাঁদ ঠাকুর কায়মনোবাক্যে যত্ন ও আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, প্রতি দিন রুগ্নশয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া স্বীয় সুকোমল করস্পর্শে রোগের যন্ত্রণা অপনোদনের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতেন, তাহা স্মরণ করিলে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র জন্মভূমির যে মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন, তদ্ব্যতিরিক্ত মানব-জীবনের অন্যান্য পথও তাঁহার প্রগাঢ় চিন্তাশক্তির দ্বারা আলোকিত ও উজ্জ্বল করিয়াছেন। জীবে দয়া তাঁহার মানসিক বৃত্তির মধ্যে একটি অতি সুকোমল ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ বৃত্তি ছিল। অনাবিল ও অশ্লীলতা দোষ-পরিশূন্য হাস্যরস, যাহা প্রাতঃসূর্য্য-চুম্বিত সরসী-লহরীর ন্যায় বিমল কান্তি বিচ্ছুরিত করে, যাহার প্রত্যেক হিল্লোলে তরঙ্গায়িত মুক্তাহার গড়াইয়া যায়, এবম্বিধ বৈঠকী হাস্যরস তাঁহার পূর্ব্বে কেহ অবতারণা করিতে সক্ষম ছিলেন কি না, বলিতে পারি না। তাঁহার লিখিত পুস্তকে তাহার কতক আভাষ পাওয়া গেলেও তাঁহার কথোপকথনেই ইহার মাধুর্য্য প্রকটিত ও মনোরঞ্জনে বিশেষভাবে সমর্থ হইত। সামাজিক সভাস্থলে তিনি নানাবিধ পারদর্শিতায়, বিশেষতঃ সময়োপযোগী হাস্য-রসের অবতারণায় একচ্ছত্রী সম্রাট্‌রূপে অধিরাজমান হইতেন। এ সব কথা কিছু বিস্তৃত করিয়া বলিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু এখন আমি সম্পূর্ণ অপারগ, বড় অনু-তাপের বিষয়। সভাক্ষেত্রে আমার অনুপস্থিতি মার্জ্জনা করিবেন ও সেই অনুপস্থিতির কারণ জানিয়া আমাকে কথঞ্চিৎ সহানুভূতি প্রদান করিবেন।

বশংবদ

শ্রীবরদাচরণ মিত্র

পরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় সভার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—যাঁহারা বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের গদ্যের ভাষা গড়িয়া গিয়াছেন, ৺পিয়ারীচাঁদ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। টেকচাঁদ ঠাকুর নাম লইয়া তিনি যে কয়খানি বহি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে পণ্ডিতী বাঙ্গালার সংস্কার করিবার পথ পাওয়া গিয়াছিল। তিনি ১২২১ সালের এই এমন দিনে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। আজ তাঁহার শততম জন্মদিন। বাঙ্গালী সাহিত্যিকের শততম জন্মদিনে উৎসব বোধ হয় এই প্রথম। বন্ধুবর হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র

রায় মহাশয় এ বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দেন। তাই সাহিত্য-পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশনরূপে এই সভা অদ্য আহূত হইয়াছে। যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের রসে সে কালের সাহিত্যে পিয়ারীচাঁদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, এ কালের সাহিত্যে সেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের রস-রচনায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ রহস্যপটু অমৃতলালকে আজ আমরা সভাপতিরূপে পাইয়াছি। তাঁহার দ্বারা সভার কার্য্য বেশ ভালরূপেই চলিবে, এরূপ আশা করিতে পারি।

পিয়ারীচাঁদ বাঙ্গালা ১২২১ সালের ৮ই শ্রাবণ তারিখে এবং ইংরাজী ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুলাই তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন, আর ইংরাজী ১৮৮৩ সালে ২৩শে নবেম্বর তারিখে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

তাহার পর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ ডি মহাশয় বলিলেন,—৺পিয়ারীচাঁদ মিত্র বাঙ্গালা সাহিত্য গঠন-কালে একজন অগ্রণী ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার স্থান চিরদিনই অনেক উচ্চে থাকিবে। এ দিকে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে, সাহিত্যক্ষেত্রে, প্রেততত্ত্বের আলোচনায় সকল দিকেই গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। সকল সভা-সমিতিতে তাঁহার যোগ ছিল, সকল সমাজেই তিনি বেশ ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিতেন। তাহার ফল তাঁহার রচনায় পাওয়া যায়। তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতি গ্রন্থে নানা সমাজের সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। আজ পিয়ারীচাঁদের শত বর্ষের জন্মদিনে বড় একটা উৎসব না করিয়া ইহাঁদের মত লোকের জন্মোৎসব বছরে বছরে করিলে ভাল হয়। কারণ, উৎসব হউক আর না হউক, ইহাঁদের কীর্ত্তি চিরস্থায়ী।

পরে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিলেন,—পূর্ব্বকালের স্বদেশভক্তগণের মধ্যে টেকচাঁদ অন্যতম। তিনি শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে নহে, সর্ব্বক্ষেত্রেই বরেণ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্য কাজের কথা ছাড়িয়া, তিনি কেবলমাত্র সাহিত্যের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথা ঘোষিত হইবার সময় আসিয়াছে। আলালের ভাষায় তিনি ঘরের কথা লইয়া দেশের ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন। মৌলিক বাঙ্গালা উপন্যাস সৃষ্টিই তাঁহার মহৎ কার্য্য। তাঁহার সাহিত্য-সেবা-প্রণালী পরতন্ত্রমূলক নহে, তাহা স্বতন্ত্র। "আলালী" ভাষা সম্বন্ধে তখনকার কলিকাতা রিভিউ তাঁহাকে dite!ier বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। বহু বর্ষ পরে ঐ মন্তব্য ব্যর্থ হইয়াছে। আবার পিয়ারীচাঁদ হইতেই স্বদেশীয় ভাবের সূত্রপাত। সেই জন্যই তিনি বরণীয়। তাঁহাতে স্বদেশী স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট। তিনিই স্বদেশী সাহিত্যের গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য বিদেশী গন্ধভরা। সাহিত্যে মহাপুরুষ পিয়ারীচাঁদের ইঙ্গিত মানিয়া চলিলে ভাল হয়। বিদেশী ভাবে অনুপ্রাণিত সাহিত্যে কি উপকার হইবে? আসুন, সকলে মিলিয়া পিয়ারীচাঁদকে স্মরণ করিয়া বলি,—"তোমারি চরণ করিয়া শরণ, চলিব তোমারি পথে।"

অতঃপর শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম এ ৺পিয়ারীচাঁদ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত চতুর্দ্দশপদী কবিতা পাঠ করিলেন,—

'সাগর'-সম্ভূত রত্নে ভূষিত যে বেশ,
হেরিয়া প্রসন্ন নহে হৃদয় তোমার,
কল্পনা-কাননে তাই করিয়া প্রবেশ,
গাঁথিলে স্বভাব-জাত কুসুমের হার।
জননীর পদাম্বুজে করিলে প্রদান,
'মধুরে মধুর' হ'ল অপূর্ব্ব মিলন,
হাসিল সুধীন্দ্র কত আনন্দিত প্রাণ
সাহিত্যে দেখিয়া পুন নবীন কিরণ।
রত্ন সম্ভব বিভা, গন্ধ পরিমল
একাধারে বিরাজিত দেখাতে ভাষায়
তব পরে হ'য়েছিল সাধনা সফল
অপার্থিব বঙ্কিমের দিব্য প্রতিভায়
প্রণমি পিয়ারীচাঁদ বঙ্গের দুলাল,
তব স্থান অতি উচ্চে রবে চিরকাল।

(নায়ক—৭ই শ্রাবণ, ১৩২১ সাল)

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন,—টেকচাঁদ ১০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পর কত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। শত বর্ষ পরে ১৯১৪ সালে জন্মাইলে, তিনি অত বড় হইতে পারিতেন না। সাহিত্যক্ষেত্রে, ধর্ম্মক্ষেত্রে, সমাজক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। সমসাময়িক হিন্দুকলেজের অন্যান্য কৃতবিদ্য ছাত্রগণের ন্যায় তাঁহার ধর্ম্মমতে, আচর-ব্যবহারে, ভাবে ভাষায় কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ৺রাজনারায়ণ বসুর জীবনচরিত পাঠে জানা যায়, নূতন ইংরাজী শিক্ষার প্লাবনে অনেক ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পিয়ারীচাঁদ ভাসেন নাই। বিদেশী ভাব তাঁহাকে কিছুমাত্র টলায় নাই। তাঁহার ১৮৮১ সালে মুদ্রিত on the soul নামক পুস্তিকার ভূমিকা পড়িলে বুঝা যায়, ইংরাজি-শিক্ষিত হইয়াও ভগবানে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি ২১ বৎসর কাল প্রেততত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, যোগ ও প্রেততত্ত্বের শিক্ষা এক। মায়ার্স ও লজের মতে পিয়ারীচাঁদের প্রেততত্ত্বের আলোচনা আলেয়ার পশ্চাতে দৌড়ান মাত্র নহে। সম্প্রতি ইউরোপে mysticismএর আলোচনায় পিয়ারীচাঁদের সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া দাঁড়াইতেছে। কর্ণেল অলকটের সম্বর্দ্ধনা-সভায় পঠিত প্রবন্ধে হিন্দু-শাস্ত্রের উপর তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছিল। সাহিত্যে তাঁহার অনুকরণ করা যেমন মঙ্গল-কর, ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা-ভক্তির অনুসরণ করাও উচিত।

এই সময় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভায় আগমন করায় সভাপতি মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি বলিলেন,—আজ পিয়ারীচাঁদের শততম জন্মোৎসব। সে

কালে আশীর্ব্বাদ ছিল, "স জীবে শরদঃ শতং" পিয়ারীচাঁদ ঐহিক জীবনে শত শরৎ জীবিত ছিলেন না, কিন্তু কীর্ত্তি-জীবনে তাঁহার আয়ু বোধ হয় শত শত শরৎ অতিক্রম করিয়া যাইবে। আত্মীয়দের কাছে তিনি গত হইলেও আমাদের কাছে তিনি গত নহেন, কারণ, আমরা আলালের ঘরের দুলালের চির-সঙ্গ লাভ করিতেছি। হীরেন্দ্রবাবু বহু শাস্ত্রবিৎ বলিয়া যে দিক্‌টা ধরিয়া পিয়ারীচাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইলেন, সেটা অতি উচ্চ দিক্। পিয়ারীচাঁদ নানা দিকে যথেষ্ট কাজ করিয়া যথেষ্ট কৃতকার্য্য হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে ৺বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্তের সমসাময়িক বলিলেও চলে। ঈশ্বরচন্দ্র আর অক্ষয়-কুমার ভাবগুলিকে সংস্কৃত পরিচ্ছদে অর্থাৎ পোষাকী পরিচ্ছদে সাজাইতেন, আর পিয়ারীচাঁদ সকল সময় পোষাক পরিয়া কাজ চলে না বুঝিয়া আটপৌরে পোষাকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাঁদের ভাষার তুলনায় বিবাদ চিরকালই থাকিবে। বঙ্কিমের ভাষা, আলালী ভাষা ভাঙ্গিয়াই গঠিত হয়। আলালী ভাষার কাছে অদ্যকার সভাপতি মহাশয়েরও ঋণ, বোধ হয়, বঙ্কিমের অপেক্ষাও বেশী। বিদ্যাসাগরী ভাষা আর আলালী ভাষা যেন আমাদের ভাষাজননীর দুই হাতের দুই বাইশঙ্খ। মার অঙ্গে শোভাসম্পাদনে কেহ কম-বেশী নহে। চাঁদকে চন্দ্র বলিয়া ডাকিলে সাড়া পাওয়া দুষ্কর। আইবুড়ভাত বা আইবড়ভাত অব্যূঢ়ান্ন ও আয়ুর্বৃদ্ধান্ন হওয়ার জিনিষটাকে চেনা দায়। অব্যূঢ়ান্ন তবু কতক পদে আছে। আয়ুর্বৃদ্ধান্ন ত একেবারে অবোধ্য। এক কথায় পিয়ারীচাঁদ মোটা অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরাইয়া ভাষা-জননীকে সাজাইতে ভালবাসিতেন। শেষ কথা, সাহিত্য-পরিষৎ এক জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের শততম জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া মহৎ কাজ করিয়াছেন। মৃত সাহিত্যিকগণের স্মরণ-দিনগুলির প্রতি পরিষদে দৃষ্টি রাখা উচিত।

ইহার কিছু পূর্ব্বে মাননীয় ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় আসিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া পিয়ারীচাঁদ সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন। মাননীয় দেবপ্রসাদ বাবু বলিলেন,—পিয়ারীচাঁদের সকল দিকের গুণাবলী স্মরণ করিলে, তাঁহাকে মহর্ষি বলিতে পারা যায়। আজ কায়স্থ মহর্ষির জন্মোৎসব সভায় কায়স্থ সভাপতি হইয়াছেন, কায়স্থ বিদ্বানেরা ভাবব্যাখ্যাতা হইয়াছেন, আমিও কায়স্থ বলিয়া বড় গৌরব অনুভব করিতেছি। আমরা জীবিতের সম্বর্দ্ধনা করিতে পারি না। মৃতের প্রতি সম্মান দেখাইতে আমরা বড়ই ব্যস্ত। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাত্মাগণের মৃতাহে সভাসমিতি অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু শততম জন্মোৎসব এই প্রথম। মৃত মহাত্মাদিগকে স্মরণ করিবার জন্য নূতন পথ খুলিয়া দেওয়ার পরিষৎকে ধন্যবাদ করিতে হয়। এমন উৎসব হয়ও কম, হইবেও কম। কিন্তু এই উৎসবের একটি স্বতন্ত্র গাম্ভীর্য্য আছে। ৺পিয়ারীচাঁদ আমাদের আত্মীয়। তাঁহাকে বিশেষভাবে আমরা জানিতাম। তিনি কাজের লোক ছিলেন, অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির সহিত তুলনায় তাঁহার কাজের কথা মনে করিলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা বেশী হয়। আবার কাজে ও কথায় তিনি এক ছিলেন। পিয়ারীচাঁদ Colasworthy grant

সঙ্গে মিলিয়া কলিকাতা পশুক্লেশ-নিবারিণী সভা স্থাপন করেন। তখন অনেকের ধারণা ছিল, মদ না খাইলে শিক্ষিত, সভ্য ও বড়লোক হওয়া যায় না। এই মন্দ ধারণার উচ্ছেদের জন্য তিনি মাদক-নিবারিণী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সভা প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্ব্বে প্যারীচাঁদ "মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়" নামক পুস্তিকা রচনা করেন। পিয়ারীচাঁদের সমাজ সংস্কারের কশাঘাত বড় কড়াই ছিল। আলালের ঘরের দুলাল ছাপা হইবার পর হইতে ক্রমশঃ দুলালেরা গা ঢাকা দিয়াছেন, যাঁহারা আছেন, তাঁহারা নিজেদের ঘরে দুলালী করেন মাত্র, কিন্তু আলালেরা একবারে লোপ পাইয়াছেন। তাঁহার পর ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোমের মুখে আর একবার সমাজকে কশাঘাত করিয়াছিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—পিয়ারীচাঁদ আমাদের নিকট আত্মীয় ছিলেন বলিয়া তাঁহার অনেক কথা জানা শুনা আছে: পিতামহের কাছে উপদেশ পাইয়াছিলাম, অর্থ-ব্যবহারে ও স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে ব্যক্তি খাঁটি, সেই ত মানুষ। এই কথার জীবন্ত উদাহরণ পাইয়াছিলাম পিয়ারীচাঁদ মিত্রে। এই বলিয়া রাজকৃষ্ণ বাবু পিয়ারীচাঁদের ন্যায়পরতা, সততা, ভদ্রতা, দয়া, মমতা, ভৃত্য-বৎসলতা, ধর্ম্মবিশ্বাস ও সকল ধর্ম্মে শ্রদ্ধা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সম্বন্ধে কতগুলি গল্প শুনাইলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—এত ক্ষণ যিনিই যত কথা বলিলেন, তিনি পিয়ারীচাঁদের কথাই বলিলেন, টেকচাঁদের কথা বলা ঠিক হয় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে টেকচাঁদের আলালের ঘরের দুলাল একটা বেদী। এই বেদী হইতে অনেক যজ্ঞ হইয়াছে—যাহার ফলে আজ বাঙ্গালায় রস্ত ধরে না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতী বাঙ্গলার কেতাবগুলি দেখিয়া তখনকার চীফ জষ্টিস্ সার এডওয়ার্ড রায়ান বলিয়াছিলেন—'কথায় কথায় ভাষা না শেখালে কি ফল হবে, কিন্তু তেমন পুথি কোথা'। আলালের ঘরের দুলালের ভাবটা Fielding থেকে লওয়া। সমাজপতি মহাশয় যে বলিয়াছেন, তাঁহার সবটাই স্বদেশী ছিল, তাহা নয়, তাঁহার উপকরণ দেশী হইলেও ধরণটা বিদেশী। বিদ্যাসাগরী দল বলেন, পূর্ব্বে ভাষায় প্রাদেশিকতা ছিল, উদাহরণ—'কবিকঙ্কণ', 'মনসামঙ্গল'। ভারতচন্দ্রে প্রাদেশিকতা কম, তাই সেটা বেশী চলে। মালদহ থেকে শ্রীহট্ট, ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত সমানে চলিবে, এমন ভাষাই আবশ্যক। 'বোধোদয়', 'কথামালা' সমস্ত স্কুলে না চলিলে শ্রীহট্টের ভাষা যে আমাদের সঙ্গে এক, কেহ তাহা বলিত না। নানা প্রদেশের ভাষার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে বঙ্কিমের প্রতিভাবলে বেশী। বঙ্কিমের মনীষা একটা সামঞ্জস্য আনিয়া দিয়াছিল। পিয়ারীচাঁদের আর সব কাজ চাপা পড়িয়া যাইলেও তিনি চিরজাগরূক থাকিবেন টেকচাঁদরূপে। টেকচাঁদের সাহিত্যের ধরণটা দেশের মুখ চাহিয়া, পরিষৎ বজায় করুন, ইহা আমারও অনুরোধ।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন,—পিয়ারীচাঁদকে শেষজীবনে প্রেত-তত্ত্বের আলোচনায় নিযুক্ত দেখিয়াছি। তাঁহাদের সিঁয়াসের বৈঠকে আসন কাঁপিত, এলাচ,

সন্দেশ আসিত, আমি সে আসন ধরিয়াছিলাম। পিয়ারীচাঁদের নানা কাজ সময়ে লোকে ভুলিয়া যাইতে পারে, তাঁহার আলালের ঘরের দুলালকে কেহ কখনও ভুলিবে না। উহা সাহিত্যে যে প্রতিক্রিয়া আনিয়াছিল, সেটা স্থায়ী। 'আলালের' পূর্ব্বে ভাষা-জননী কেতাবের পাতায় পাতায় বদ্ধ থাকিতেন; অভিধান, ব্যাকরণ ভিন্ন তাহা খুলা যাইত না, পিয়ারীচাঁদ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি হুগলী জেলার লোক, চিরদিন কলিকাতায় বাস করিতেন বলিয়া কলিকাতার ভাষাই তাঁহার আদর্শ হইল। কলিকাতাতেই পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলন-স্থান হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার ও বঙ্কিমের চেষ্টায় কলিকাতার ভাষাই সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠ হইল। কিন্তু এখন সিলেটী চাটগেঁয়ের ন্যায় কলিকাতার ভাষার প্রাদেশিকতাটুকুও বর্জ্জনের সময় আসিয়াছে, এ কথাও আমি অবশ্য বলিব।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—বাঁচিয়া থাকিতে আমাদের দেশের লোক সম্বর্দ্ধনা করে না—তা না করুক, করিবে, যখন জাগিবে, তখন করিবে। আমরা যত দিন বাঁচিয়া থাকি, তত দিন মতামত, দলাদলি আর স্বার্থ লইয়া ঝগড়া করিতেই দিন যায়। কে কি করিতেছে না করিতেছে, তাহা দেখিবার অবসর থাকে না। মরিয়া গেলে তাহার কাজগুলা, কথাগুলা কুড়াইয়া আনিয়া দেখিতে বসি, তাহার মধ্যে কি রত্ন আছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে এক রকম সাদাসিদে সভ্যতা ছিল,—আমরা দাসীকে ঝি বলি, কন্তা বলি, অমুকের মা বলিয়া ডাকি, চাকরের নাম ধরিয়া ডাকি, কিন্তু কখন বেয়ারা, খানসামা, নওকর, বান্দা প্রভৃতি বলি নাই। আহার ব্যবহারে কখন তাহাদের দাসত্ব অনুভব করাই নাই, এ রকম ছোটকে বড় করার ভাব আর কোন সভ্যতায় নাই। আলালের ঘরের দুলালের ভাষা আমাদের টেঁকের জিনিস, টেঁকেই টাকা, আর টাকাই চাঁদ, টেকচাঁদ আমাদের ভাষার যেটুকুর দাম আছে, তাহাই দিয়া গিয়াছেন। আমরা সাধু ভাষা শিখাইতে গিয়া আদর করিয়া ছেলেদের মাথা খাইতেছি। পিয়ারীচাঁদ যে আদর্শভাষা গড়িব বলিয়া তাল ঠুকিয়া একটা কিছু করিতে বসিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি বৈঠকী ভাষায় একটা গল্প বলিয়াছেন মাত্র এবং সে ভাষা বড় কাজে লাগিবে, ইহাই তিনি বুঝিতেন। পিয়ারীচাঁদ সম্বন্ধে এত কথা বলা হইয়াছে যে, আমার আর নূতন বলিবার কিছু নাই। এ রকম স্মৃতি-স্মরণীয় ব্যক্তির কীর্ত্তিকথা, রাজকৃষ্ণবাবুর ন্যায় গল্পের মত বলিতে পারিলেই ভাল হয়। লোকটার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ান হয়। আজ নূতন ধরণের অনুষ্ঠান করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ ধন্য হইলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী
সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-প্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

—•—

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

—•—

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ।৵০ দশ আনা মাত্র।

উল্লিখিত তিনখানি গ্রন্থের প্রকাশক—শ্রীঅনুকুলচন্দ্র ঘোষ

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (বঙ্গানুবাদ)

টীকা ও পরিশিষ্ট সমেত। সাধারণের পক্ষে—৩৲, সদস্য পক্ষে—২॥০, মূল্যের বিশেষ বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

প্রকাশক—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকৃত সুন্দর কে ?

এ প্রশ্নের উত্তরে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যিনি নিত্য **কেশরঞ্জন** ব্যবহারে স্নান করেন। স্নানান্তে মুখে যে মধুর সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, তাহা দর্পণ-সাক্ষাতেই প্রথম প্রমাণিত হয়। রমণীর মধ্যে প্রকৃত সুন্দরী কে ?—যিনি স্বীয় আগুলফ-লম্বিত কেশগুচ্ছ নিত্য কেশরঞ্জন-পরিসিক্ত করিয়া বেণীরচনা করেন। ইহাতে যে কেবল বেণীর সৌন্দর্য্য বাড়ে, এরূপ নহে—মুখের কমনীয়তাও বৃদ্ধি পায়। "কেশরঞ্জন" শুধু বিলাসভোগের উপকরণ নহে,—মস্তিষ্কের উষ্ণতা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, বিষণ্ণতা, নিদ্রাহীনতা দূরীকরণে ইহাই একমাত্র শক্তিসম্পন্ন কেশতৈল।

এক শিশি ১৲ এক টাকা, মশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা, মাশুলাদি ।।৵০ এগার আনা। ডজন ৯, নয় টাকা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

কুচিকিৎসাই জীবনের মহাভ্রান্তি।

কুচিকিৎসাই জীবনের মহাভ্রান্তি। যখন ইন্দ্রিয়-শক্তির প্রখর বেগ দমন করিতে না পারিয়া, আপনি যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা-বশে দুশ্চিকিৎস্য উপদংশ-বিষ আপনার সুস্থদেহে সঞ্চারিত করেন, তখনই আপনার প্রথম ভ্রম ঘটে। তার পর যখন আপনি লজ্জাবশে রোগটী চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন, কিম্বা বিরুদ্ধ-চিকিৎসা দ্বারা তাহার বৃদ্ধির বেগ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন, তখন আপনি দ্বিতীয় ভ্রমে পতিত হন। উপদংশ রোগ অতি ভীষণ। অনির্দ্দিষ্ট চিকিৎসায় ইহা কখনও আরাম হয় না। শরীরমধ্যস্থ বিষ উপযুক্ত ঔষধের সাহায্যে বিদূরিত করিতে হয়। বাজারের অনেক ঔষধে পারদ-ঘটিত উপাদান থাকে। এরূপ ঔষধ ব্যবহার করা অতি বিপজ্জনক। ইহাতে আবার পারদ-বিষ শরীরে সঞ্জাত হইয়া, স্ফোটক, সর্ব্বাঙ্গে চাকা চাকা দাগ, কষ্টকর ক্ষত, শারীরিক দুর্ব্বলতা, মৃদু-জ্বর, অনিদ্রা, অক্ষুধা, মনের বিমর্ষভাব প্রভৃতি কষ্টকর উপসর্গ আনয়ন করে। যদি প্রথম হইতেই উপদংশ রোগের একমাত্র প্রতিকারক ঔষধ "অমৃতবল্লী-কষায়" সেবন করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে এই ভীষণ উপদংশের কবল হইতে অতি সহজে আত্মরক্ষা করিতে পারেন।

মূল্য প্রতি শিশি—১।।০ দেড় টাকা। ডাকমাশুলাদি—।।৵০ এগার আনা।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

অশ্বান

বা

"অশ্বগন্ধা-এলিকসার"

এই ঔষধ প্রাচীন ঋষিগণের বহু প্রশংসিত ; অশ্বগন্ধা রসায়নের উপাদানসমূহ হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত। ইহা সুস্বাদু, অত্যন্ত তেজস্কর, বলবৃদ্ধিকর ও স্ফূর্ত্তিকর, সর্ব্বপ্রকার স্নায়বিক, মানসিক ও শারীরিক দৌর্ব্বল্য, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, বার্দ্ধক্যজনিত ক্ষীণতা, মস্তকঘূর্ণন, কার্য্যে অমনোযোগিতা ও সর্ব্বপ্রকার মানসিক বিকারে ইহা সেবনে আশ্চর্য্য ফল দর্শে।

মূল্য—প্রতি বোতল ১৷৷০ দেড় টাকা।

"চিরেতার এসেন্স"

চিরেতার সার উৎকৃষ্ট পিত্তনাশক। ইহা সকল প্রকার জ্বরের পর ব্যবহৃত হইতে পারে। কুইনাইন সেবনের পর কিছু দিন নিয়ম করিয়া চিরেতার সার পান করিলে কুইনাইনজনিত দোষ-সকল দূর হইয়া শরীরে বল হয় এবং সহসা ম্যালেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে না। ইহা সেবন করিলে ব্রণ ও কৃমি জন্মাইতে পারে না, চক্ষু ও হস্ত-পদাদির জ্বালা, গা বমি বমি ও পিত্তাধিক্য শান্তি হয়।

মূল্য—৪ আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

"এলিক্সার পেপেয়িন্"

যাঁহাদের পেপ্সিন্ ওয়াইন্ সেবনে আপত্তি আছে ও যে সকল দুর্ব্বল রোগীর সহজে পরিপাক হয় না, তাঁহাদের জন্য পেপে ফলের নির্য্যাস হইতে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। অম্ল, অজীর্ণ, পেটফাঁপা ও অজীর্ণজনিত বুক কন্‌কনানি প্রভৃতি রোগে বিশেষ ফলদায়ক। অল্পবয়স্ক বালক ও দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে প্রশস্ত।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড্
কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলীর মূল্য কমাইয়া সাধারণের ও সদস্যগণের জন্য অধিকাংশ স্থলে 'অর্দ্ধেক' ও 'সিকি' করিয়া দেওয়া হইল।

		সাধারণপক্ষে পূর্ব্বমূল্য	সাধারণপক্ষে বর্ত্তমান মূল্য	সদস্যপক্ষে বর্ত্তমান মূল্য
১।	কৃত্তিবাসী রামায়ণ (অযোধ্যা ও উত্তরকাণ্ড)	১৲	॥০	।০
২।	বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	১॥০	৸০	।৶০
৩।	ছুটিখানের মহাভারত	১৲	॥০	।০
৪।	রাসায়নিক পরিভাষা	।৶০	৶০	৴১০
৫।	কাশীপরিক্রমা	৸০	।৶০	৶০
৬।	নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ	৶০	৵০	৴০
৭।	কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল	।০	৵০	৴০
৮।	নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজপরিক্রমা	১৲	॥০	।০
৯।	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	৵০	৴০	৴১০
১০।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	৫৲	২৲	১॥০
১১।	শতপথ-ব্রাহ্মণ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)	৫॥০	২৸০	১।৶০
১২।	পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু (সচিত্র)	।০	৵০	৴০
১৩।	পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর (সচিত্র)	।০	৵০	৴০
১৪।	বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয় (সচিত্র)	।৶০	৶০	৴১০
১৫।	বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা (১ম ও ২য় খণ্ড)	২॥০	১।০	॥৶০
১৬।	বাঙ্গালা ভাষা (ব্যাকরণ)	১।০	॥৵০	।৴০
১৭।	বাঙ্গালা ভাষা (২য় ভাগ) (১, ২, ৩ খণ্ড) শব্দকোষ	৪॥০	২।০	১৶০
১৮।	মহিলা-ব্রতকথা	।৶০	৶০	৵০
১৯।	কল্কিপুরাণ	১।০	॥৵০	।৴০
২০।	প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	১৲	॥০	।০

পুস্তক পাইবার ঠিকানা,—২৪৩।১ নং অপার সারকুলার রোড,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, কলিকাতা।

সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী

১। **কবি হেমচন্দ্র (সচিত্র)**—বঙ্গের সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কৃত কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের সমালোচনা। প্রবীণ ও প্রাচীন সমালোচকের এই নূতন গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে পরম আগ্রহে গৃহীত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ৮৩, মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

২। **বিদ্যাপতির পদাবলী**—সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। এই গ্রন্থ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের ব্যয়ে ও নগেন্দ্র বাবুর সম্পাদকতায় পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধে কবির জীবনী, কালনির্ণয়, পাঠনির্ণয়, পদনির্ব্বাচন, আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ের বহু গবেষণার মীমাংসা আছে। এতদ্ভিন্ন রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ৮৪০টি পদ, হরগৌরী-বিষয়ক ৪৪টি পদ, গঙ্গাবিষয়ক ৩টি পদ, নানাবিষয়ক প্রহেলিকার ২০টি পদ ইহাতে আছে। পত্রাঙ্ক ৫৫২ ; মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা। পরিষদের সদস্যপক্ষে ৩৲ তিন টাকা।

৩। **গৌরপদতরঙ্গিণী**—সম্পাদক পণ্ডিত জগবন্ধু ভদ্র।—এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এ সকল পদ বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্ত্তৃগণের রচিত। অনেক পদ নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ১৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী বৃহৎ ভূমিকায় ঐ সকল পদকর্ত্তাদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ ভূমিকায় বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্ঘণ্ট আছে। পত্রাঙ্ক ৫৬৮, মূল্য ২৲ দুই টাকা, কিছু দিনের জন্ত সকলকেই ১৲ টাকা মূল্যে দেওয়া হইবে।

৫৪। **বাঙ্গালা শব্দকোষ**—(৪র্থ খণ্ড)। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্‌এ, বিদ্যানিধির সঙ্কলিত। মূল্য—সদস্য পক্ষে—৷৵৹ আনা, সাধারণ পক্ষে—১৲ এক টাকা।

৫৫। **মৃগলুব্ধ-সংবাদ**—শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত প্রাচীন বঙ্গভাষায় অপূর্ব্ব গ্রন্থ। মূল্য সাধারণপক্ষে ।৹ আনা, শাখা-সভার সদস্যপক্ষে ৶১৹, পরিষদের সদস্যপক্ষে ৶৹ আনা।

৫৬। **বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা (৩য় খণ্ড)**—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস রায় বাহাদুর, সি আই ই কর্ত্তৃক অনূদিত। মূল্য পরিষদের সদস্যগণের পক্ষে ॥৹ আনা ও সাধারণের পক্ষে ১৲ টাকা। **ঐ ৪র্থ খণ্ড।** মূল্য—সদস্য পক্ষে ।৵৹, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ॥৹, সাধারণ পক্ষে ॥৵৹ আনা।

৫৭। **সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুম**—স্বর্গীয় কৃষ্ণানন্দ ব্যাস-সংগৃহীত। ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রালোচনা ও নানা প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত নানা সুরের প্রাচীন গান-সংগ্রহ। আকার বৃহৎ, ডিমাই ৪ পেজী, ৭০৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৫৲ টাকা।

৫৮। **প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ১ম ও ২য় ভাগ**—শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল করিম সঙ্কলিত। মূল্য সদস্যপক্ষে যথাক্রমে ।৴৹ পাঁচ আনা ও ।৹ চারি আনা মাত্র। সাধারণ-পক্ষে ॥৵৹ আনা ও ॥৹ আনা।

৫৯। **সত্যনারায়ণের পুঁথি**—(শ্রীকবিবল্লভ-প্রণীত)—শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল-করিম সম্পাদিত। মূল্য—সদস্য পক্ষে ৵৹, সাখা-সভার সদস্যপক্ষে ৵১৹, সাধারণ পক্ষে ৶৹।

৬০। **মৃগ-লুব্ধ**—দ্বিজ রতিদেব-বিরচিত। শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল করিম-সম্পাদিত। মূল্য—সদস্য পক্ষে ৶৹, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ।৹, সাধারণ পক্ষে ।৴৹ আনা।

৬১। **জ্যোতিষ-দর্পণ**—শ্রীহট্ট, এম্ সি কলেজের অধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বিএ প্রণীত। ইহাতে জ্যোতিষের কঠিন বিষয় সকল অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মূল্য—সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১।৹ আনা।

৬২। **দুর্গামঙ্গল**—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত। মূল্য—সদস্য পক্ষে ॥৹, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ॥৵৹, সাধারণ পক্ষে ১৲ টাকা।

রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য

এই গ্রন্থখানি ভারত-শাস্ত্র-পীটকান্তর্গত এবং লালগোলার রাজা বাহাদুরের সাহায্যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রের চতুঃসূত্রী মত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থে প্রথমতঃ সূত্রের নীচে সূত্রের পদগুলির বিশ্লেষণ ও সরল অর্থ দেওয়া হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত টীকায় ভাষ্যানুযায়ী সূত্রার্থ বিবৃত করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে ভাষ্যের অর্থগুলি জটিল বোধ হওয়াতে শ্রুত-প্রকাশিকা নামক প্রাচীন গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। টীকা ও অনুবাদ সহ বঙ্গাক্ষরে ইতিপূর্ব্বে এ ভাষ্য বাহির হয় নাই। এ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

মূল্য—১ম খণ্ড ২॥৹, ২য় খণ্ড ৩।৴৹, ৩য় খণ্ড ৩৲, ৪র্থ খণ্ড ২॥৹ টাকা।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ভাগবত চতুষ্পাঠী, ভবানীপুর।

চণ্ডীদাসের পদাবলী

"বীরভূমবাসি"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয় এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইহাতে বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এত নূতন পদ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত আর কোন সংগ্রহে নাই। বিদ্যাপতি মৈথিল কবি, কিন্তু চণ্ডীদাস খাঁটী বাঙ্গালী কবি। এত দিন পরে সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় নীলরতন বাবুর যত্ন-সঞ্চিত কবি চণ্ডীদাসের আট শতাধিক পদাবলী একত্র প্রকাশিত হইল। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা-মাধুর্য্য-রসলোলুপ ভক্তজন পরিষদের প্রকাশিত সহস্রাধিক পদাবলী-পরিপূর্ণ বিদ্যাপতির পদাবলী পাইয়া যেমন তৃপ্ত ও কৃতার্থ হইয়াছেন, এই নবপ্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও তদ্রূপ পরিতৃপ্ত হইবেন। মূল্য—সদস্য পক্ষে ২৲, শাখা-পরিষদের সদস্য পক্ষে ২॥০, সাধারণ পক্ষে—৩৲।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিকাল-নির্ণয়*

অনুসন্ধিৎসুগণের ঔৎসুক্যাতিশয্য এবং 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ বাঙ্গালা বর্ণমালার অল্প কয়েকটি অক্ষরের পরিবৃত্তি-অনুক্রমে পূর্ণতা লাভ লক্ষ্য করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

"কৃষ্ণকীর্ত্তন" চণ্ডীদাস-বিরচিত একখানি নবাবিষ্কৃত গ্রন্থ। বিগত ১৩১৬ সালের শীত-ঋতুতে আমরা পুথিখানির সন্ধান পাই। ১৩১৮ সনে পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে উহা প্রদর্শিত হয়। পুথিখানি খণ্ডিত, শেষ অংশ পাওয়া যায় নাই। কাজেই উহার বয়স কত, নিশ্চয় করিয়া বলা দুরূহ। তবে যে কেহ দেখিয়াছেন, তাঁহাকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইয়াছে, পুথি সুপ্রাচীন। যাঁহারা ২।১০ খানি হস্তলিখিত পুথি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, অথবা যাঁহারা ভারতীয় প্রাচীন লেখতত্ত্বের সহিত পরিচয় মাত্র রাখেন, তাঁহারা সকলেই পুথির লেখা সার্দ্ধ তিন শত বর্ষেরও পূর্ব্বের অনুমান করেন। কেহ কেহ এমনও প্রশ্ন করেন, উহা কি চণ্ডীদাসের হস্তাক্ষর? যাহা হউক, এক্ষণে আমরা লেখতত্ত্বের সাহায্যে আলোচ্য পুথিখানির লিপিকাল নিরূপণে প্রয়াস পাইব এবং তাহাই সমীচীন।

খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর পূর্ব্বেই বাঙ্গালা বর্ণমালা প্রায় পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে, দেখিতে পাই। অবশ্য গঠনকার্য্য যে সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া চলিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেবল দুই চারিটি অক্ষরের বর্ত্তমান আকার পাইতে আরও তিন শত বর্ষ অতীত হইয়াছিল; অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তে আধুনিক বর্ণমালা সম্পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠে।

বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে[১] আধুনিক বর্ণমালার কৈশোরাবস্থা বলা চলে। আলোচনার সুবিধার্থে নিম্নে উহার অক্ষরমালার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

ই—ইকারে বৃত্তদ্বয় মিলিত।

উ—উকারের ঊর্দ্ধভাগ কিঞ্চিৎ বক্র।

ক—ক'তে সূক্ষ্ম কোণের অভাব।

গ—গকারের মাত্রা ও দক্ষিণের সরলরেখা মিলিত হইয়া এক সমকোণের সৃষ্টি করিয়াছে।

চ—চ'র আকৃতি নাগরী এবং অধোদেশে শূন্যগর্ভ ত্রিভুজটি বামভাগে।

জ—জ কতকটা ইংরাজি ৫এর মত।

ড—ড উকারের অনুরূপ।

ণ—ণ মাত্রাহীন, গঠন অসম্পূর্ণ।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৯শ, ৫ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১ Epigraphia Indica, Vol. I, p. 307.

দ—দ'র পৃষ্ঠদেশ ককুদাকার, গঠন অসম্পূর্ণ।

ধ—ধ'র স্কন্ধে বাড়িটি নাই।

ন—ন'র পুঁটুলিটিকে মাত্রার সমান্তরাল একটি রেখা লম্বের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে।

প—প'র গঠন অসম্পূর্ণ।

ল—ল কতকটা আধুনিক দেবনাগর ত'র সদৃশ।

হ—হ'র গঠনক্রিয়া এখনও শেষ হয় নাই। উহার বামোর্দ্ধভাগে একটি গ্রন্থি এবং মাত্রার অভাব।

নিম্নলিখিত অক্ষর কয়টি অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট।

অ—অ'র কাকপদচিহ্ন অংশটিকে একটি বক্ররেখা মাত্রার সহিত সংযুক্ত করিয়াছে।

ও—ওকারের গঠন সম্পূর্ণ।

খ—খ প্রায় সম্পূর্ণ, কেবল অধোদেশে একটা সূক্ষ্ম কোণের অভাব।

ঘ, ছ—ঘ ও ছ'র গঠন প্রায় সম্পূর্ণ।

ঝ—ঝ'র বামোর্দ্ধাংশ মুছিয়া ফেলিলেই উহার আধুনিক আকার পাওয়া যায়।

ঞ—ঞ'র গঠনও প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

ট—ট কৃষ্ণদ্বারিকা মন্দিরের খোদিত লিপির অনুরূপ।

ত, থ—ত, থ'র আকার অনেকটা সম্পূর্ণ।

ফ—ফ প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভ—ভও প্রায় সম্পূর্ণ।

ম—ম'র অধোদেশে কেবল একটি সূক্ষ্ম কোণের অভাব।

ব—ব'তে একটি অর্দ্ধবৃত্তাকার রেখা লম্বের সহিত সংযুক্ত।

শ—শ'র বামাঙ্গ অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে; দুইটি গ্রন্থির অভাব ও একটি খাঁজ অধিক।

ষ—ষ'র আকারও প্রায় সম্পূর্ণ, কেবল অধোদেশে একটি সূক্ষ্ম কোণের অভাব।

স—দেওপাড়া প্রশস্তিতে স'র চরম পরিণতি।

অতঃপর 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এর এক একটি অক্ষর লইয়া প্রাচীন তাম্রশাসন ও প্রশস্তির অক্ষরের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব।

অ—অকারের দুইটি রূপ পাওয়া যায়। একটি আধুনিক রূপ,[১] অপরটি বিনায়কপালের লিপির[২] অনুরূপ; তুল°—'অনেক', কৃষ্ণকীর্ত্তন, পত্র ১৭৬, পৃষ্ঠা ২, পংক্তি ৬; 'অনুমতী' ২০৪।২।৫; 'অসম্বতী' ২০৫।২।১।

---

১ আধুনিক রূপের জন্য কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে উদ্ধার করিয়া দেখান নিষ্প্রয়োজন।

২ Indian Antiquary, Vol. xxvi, p. 140.

ই—তর্পণদীঘির তাম্রশাসনে[১] ইকারের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন রূপ দৃষ্ট হয়; তুল°—'ইব' পং ১৩ এবং "ইহ" পংক্তি ৫৫।

কেম্ব্রিজস্থ হস্তলিখিত পুঁথি ও দেওপাড়ার প্রশস্তিতে উহার মধ্যবর্ত্তী রূপ দেখা যায়।

বোধগয়াস্থ অশোকচল্লের খোদিতলিপিতে[২] ইকারের ঈষৎ অপুষ্ট আধুনিক রূপ প্রথম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উ—কমৌলি শাসনে[৩] উকারের প্রাচীন রূপ পাওয়া যায়।

তর্পণদীঘির তাম্রশাসন ও কেম্ব্রিজস্থ হস্তলিখিত পুথিতে উকারের মধ্যবর্ত্তী রূপ।

শান্তিদেবকৃত 'বোধিচর্য্যাবতার'এর হস্তলিখিত পুথিতে উকারের আধুনিক রূপ সর্ব্বপ্রথম দেখা যায়। পুথির উপকরণ তালপত্র। লিপিকাল বিক্রম-সংবৎ ১৪৯২ (খৃ° অ° ১৪৩৫)। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। কিন্তু 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ সর্ব্বত্রই শিখাহীন প্রাচীন রূপই পরিদৃষ্ট হয়; তুল°—'উল্লাসিত' ১৭৬।২।২; 'উপাএ' ১৭৬।২।৬; এটি অনেকটা গুজরাটের চালুক্যবংশীয় প্রথম ভীমদেবের (রাধানপুরের) তাম্রশাসনের[৪] অক্ষরানুরূপ।

ক—ক'র দ্বিবিধ রূপ। এক তর্পণদীঘির তাম্রশাসনের অক্ষরানুরূপ, তুল°—'করিল' ৯৯।১।৫; 'করে' ৯৯।১।৬; ইহার সহিত দেওপাড়া প্রশস্তির ক'র কতকটা সাদৃশ্য আছে। অপর আধুনিক রূপ বা আধুনিক রূপেরই পূর্ব্বাবস্থা। আকৃতি [ক-চিহ্ন] এইরূপ, তুল°—'কাহাঞি' ৯৯।১।৫, 'বিকল' ৯৯।১।৬।

গ—অনেকটা দেওপাড়া প্রশস্তির অক্ষরানুরূপ।

ঘ—উদয় বর্ম্মার লিপির অক্ষরানুরূপ।

চ—দেওপাড়া প্রশস্তি, মান্দা খোদিতলিপি, কমৌলি তাম্রশাসন, তর্পণদীঘিশাসন, দিনাজপুরের স্তম্ভলিপি[৫] প্রভৃতিতে আমরা চ'র প্রাচীন রূপ দেখিতে পাই।

ঢাকার খোদিতলিপি, বোধগয়াস্থ অশোকচল্লের খোদিতলিপি, গয়াস্থ গদাধর-মন্দিরের উৎকীর্ণ লিপিতে[৬] চ'র মধ্যবর্ত্তী রূপগুলি পাওয়া যায়।

কেম্ব্রিজস্থ পুথিতে উহার আকারগত কোন পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না।

'বোধিচর্য্যাবতার'এ তৎপরবর্ত্তী রূপ পাওয়া যায়।

---

১ Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XLIV, part I, p, 11; E. I., Vol. XII, p. 6.

২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ।

৩ E. I., Vol. II, p. 350.

৪ E. I. Vol. VI, p. 242.

৫ J. & P. A. S. B., New series, Vol. VI, p. 619.

৬ Mem. A. S. B., Vol. V, p. 78.

'কৃষ্ণকীর্ত্তন' পুঁথিতে তাহারও পরবর্ত্তী রূপ পাই, তুল°—'চাহে', 'চারি' ও 'চমকিত' ১৭৭।২।১; প্রাচীন ও মধ্যবর্ত্তী রূপও বিরল নহে। প্রাচীন রূপের দৃষ্টান্ত, 'ঘাচিআঁ' ৯৩।১।২, 'চিহ্নি' ৯৪।১।৩; মধ্যবর্ত্তী রূপের 'চিন্তিআঁ' ৯৫।১।১, 'উচিত' ১০০।২।১।

চকারের চরম পরিণতি মুসলমান-বিজয়ের অনেক পরে সংঘটিত হয় অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তভাগে বলা যাইতে পারে।

ছ—ছকার অনেকটা পরমার মহাকুমার উদয়বর্ম্মার লিপির[১] অক্ষরানুরূপ। আর এই রূপের ছ'রই ব্যবহার 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ অধিক, তুল° 'মিছাই' ১০১।২।৩, 'ছাড়ায়িল' ১০১।২।৬; ৮৫৫ শকের সুবর্ণবর্ষের লিপির[২] অক্ষরানুরূপ ছ কয়েক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়, তুল°—'কিছ' ১৭৬।২।৭, 'পুছিঞাঁ' ২০৪।২।৩; ছ'র আধুনিক রূপ ৬৬।২।১।

জ—জ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত বোধগয়ার শিলালিপির অক্ষরানুরূপ।

ট—ট অনেকটা মূলরাজের লিপির[৩] অক্ষরানুরূপ, কেবল মাথার আঁকুড়িটি বেশী। অন্ত প্রকার ট, তুল° 'কপাট', 'বাট' ২০৫।১।২।

ড—ড অনেকটা চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় ভীমদেবের লিপির[৪] অক্ষরানুরূপ, তুল°—'ডালত' ১৭৬।২।২; অধিকাংশ স্থলেই ড'র আধুনিক রূপ।

ঢ—ঢ ৪৩৫ সম্বতের নেপাল-লিপির সহিত সাদৃশ্য আছে।

ণ—ণকারের প্রাচীন, মধ্যবর্ত্তী ও আধুনিক ত্রিবিধ রূপই 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ পাওয়া যায়। ণ'র প্রাচীন রূপ আধুনিক ল; তুল°—'সুণী' ১৭৬।২।১, 'প্রাণ' ১৭৬।২।২; মধ্যবর্ত্তী রূপ (পেটকাটা) তুল°—'পরাণে' ৯২।১।৩, 'সখিগণ' ৯২।২।৪; আধুনিক রূপে কেবল শিখার অভাব।

ত—ত বোধগয়ার শিলালিপির অক্ষরানুরূপ।

থ—থ অনেকটা দেওপাড়া-প্রশস্তির অক্ষরানুরূপ।

দ—দকারের মধ্যবর্ত্তী রূপের নিদর্শন বর্ত্তমান।

ধ—ধ'র প্রাচীন রূপ, তুল°—'ধর' ১৭৬।২।৭, 'মধুকর' ২০৪।১।৭।

প—প'র ত্রিবিধ আকার পাওয়া যায়। যথা,— ণ, য, প

য—য'তে প্রাচীন নিদর্শন আছে।

র—মান্দা খোদিতলিপিতে র'র প্রাচীন রূপ। কমৌলি ও তর্পণদীঘির শাসন, ঢাকায় লক্ষ্মণসেনের খোদিতলিপি, বোধগয়ায় অশোকচল্লের খোদিতলিপিতে আধুনিক ত্রিভুজাকার রূপ। কেম্ব্রিজস্থ হস্তলিখিত পুঁথিতে বিন্দুহীন আধুনিক রূপ।

১ I. A., Vol. XVI, p. 254.
২ Sangli plates, I. A., Vol. XII. p. 249.
৩ Kadi plates, I. A., Vol. VI, p. 191.
৪ Kadi plates, I. A., Vol. VI, p. 194.

'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ অসমীয়া র'র সদৃশ ব'র পেটকাটা রূপ। ইহাই আধুনিক র'র অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী রূপ।

ল—মান্দা খোদিতলিপিতে ল'র প্রাচীন ও আধুনিক দ্বিবিধ রূপই পাওয়া যায়।

কমৌলি শাসনে ল'র ১২শ শতাব্দীর রূপ। উহা কতকটা নাগরী তকারের ন্যায়। ঢাকার খোদিতলিপি, বোধগয়াস্থ অশোকচল্লের লিপি এবং গয়াস্থ গদাধর-মন্দিরের খোদিত লিপির সহিত কতকটা সাদৃশ্য আছে।

কেম্ব্রিজস্থ হস্তলিখিত পুথিতে উহার আধুনিক রূপ। প্রাচীনেরা এখনও ঐরূপ ল'র ব্যবহার করেন। বেশীর ভাগ উহার নিম্নে একটি বিন্দু থাকে।

'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ ল'র দুইরূপ আকারই পাওয়া যায়। এক ণকারের অনুরূপ; আর এইটির ব্যবহারই অধিক। অপর আধুনিক রূপ, ১৭৬।২।১,২,৩,৪ ; ২০৪।২।৭।

শ—কমৌলি ও তর্পণদীঘির শাসনে শ'র প্রাচীন রূপ।

কেম্ব্রিজস্থ হস্তলিখিত পুথিতে উহার মধ্যবর্ত্তী রূপ।

'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ উহার চরম পরিণতি প্রথম পরিলক্ষিত হয়।

হ—কমৌলি ও তর্পণদীঘি শাসনে হ'র প্রাচীন রূপ পাওয়া যায়।

মধ্যবর্ত্তী রূপ যথাক্রমে দেওপাড়া প্রশস্তি, মান্দা খোদিতলিপি, বোধগয়াস্থ অশোকচল্লের লিপি, গদাধর মন্দিরের উৎকীর্ণ লিপি এবং কেম্ব্রিজস্থ হস্তলিখিত পুথিতে।

পরবর্ত্তী রূপ বোধিচর্য্যাবতার পুথিতে দেখিতে পাই। তখন হ'র গঠন সম্পূর্ণ হয় নাই।

ইহার অনতিকাল পরেই হ'র চরম পরিণতি সংঘটিত হইয়া থাকিবে এবং সেই পূর্ণাবয়ব হ আমরা প্রথম 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ দেখি।

ঋ-ফলার ন্যায় উকারের চিহ্নও পুথির প্রাচীনত্বের অন্যতম নিদর্শন।

সংখ্যাবাচক তিন, পাঁচ ও আটে প্রাচীন রূপ বিদ্যমান।

নীচের তালিকায় দেখা যায়, 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ এক একটি যুক্তাক্ষর দুই বা ততোধিক অক্ষরের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাও পুথির প্রাচীনত্বের পরিচায়ক।

অক্ষর-সাদৃশ্য

ঈ, ক্কু, গ্‌গ, ন্দ, ক্ক, ন্দ, ন্ধ	প্রায় একরূপ।
উ, ড, ড়	একরূপ।
ও, তু, ত্ত	একরূপ।
কু, হু	অনেকটা একরূপ।
খ, দ্ব	অনেকটা একরূপ।
রু, ব্ব	অনেকটা একরূপ।

ক্র, হ্র	একরূপ।
চ, ঠ	একরূপ।
ণ, ল	একরূপ।
ম্ম, হু, দ্ধ, ম্র, ম	অনেকটা একরূপ।
ষ, হৃ, ষ	একরূপ।
দৃ, ভৃ	প্রায় একরূপ ১৯।৮।২।২০১।১
ন্দ, ম্র	একরূপ।
মু, ষ, ষু, স্থ	প্রায় একরূপ।
ষ, য়	একরূপ।
সু, স্ব, স্ম	প্রায় একরূপ।

১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'বোধিচর্য্যাবতার'এর পুথিতে আমরা চকারের মধ্যবর্ত্তী রূপ, ণকারের প্রাচীন রূপ, লকার ও হকারের মধ্যবর্ত্তী রূপ দেখিতে পাই। 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ চ ও ণ'র প্রাচীন, মধ্যবর্ত্তী এবং আধুনিক এই ত্রিবিধ রূপ, ল'র মধ্যবর্ত্তী ও আধুনিক রূপ এবং হ'র আধুনিক রূপ দেখিয়া, প্রথমোল্লিখিত পুথি লিখিত হইবার অব্যবহিত পরে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' লিখিত হইয়া থাকিবে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। দুইখানি পুথির লিপিকালের ব্যবধান ২৫।৩০ বর্ষের অধিক মনে হয় না। ইতিপূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি, খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে আধুনিক বাঙ্গালা বর্ণমালার গঠন সম্পূর্ণ হয়। আলোচ্য পুথিতে উ, ঙ, ঢ ও ধ'র প্রাচীন ও মধ্যবর্ত্তী রূপ, গ, ঘ, ছ, ট, থ, র ও ল'র মধ্যবর্ত্তী ও আধুনিক রূপ, অ, ক ও ড'র প্রাচীন ও আধুনিক রূপ এবং ত, শ, হ প্রভৃতি কয়েকটি অক্ষরের আধুনিক রূপের যুগপৎ সমাবেশ দেখিয়া উহার লিখন ১৫শ শতাব্দীর অন্তে বা তন্নিকটবর্ত্তী সময়ে সম্পাদিত হয়, নিঃসংশয়ে এরূপ নির্দ্ধারিত হইতে পারে। বর্ত্তমানে চণ্ডীদাসের কাল ১৪শ শতাব্দীর শেষ হইতে ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ধরা হয়। তাহা হইলে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এর এই পুথিখানি কবির স্বহস্ত-লিখিত না হইলেও উহা তাঁহার জীবিতকালে লিপিবদ্ধ হয়, এরূপ বলিবার পক্ষে কোন বাধা নাই এবং এই পুথিখানি বঙ্গাক্ষরে লিখিত প্রাচীনতম বাঙ্গালা গ্রন্থ বলিয়াও গৃহীত হইতে পারে।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন*

ইহা সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার মাধবাচার্য্য কর্তৃক সংগৃহীত পঞ্চদশ প্রকার দর্শনের অন্যতম। ইহার প্রতিপাদক গ্রন্থগুলি প্রায়শঃ অমুদ্রিত রহিয়াছে ও ইহা কাশ্মীর প্রদেশেই একপ্রকার আবদ্ধ; এ জন্য ইহা বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত নহে। বসুগুপ্ত, কল্লট প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা; ভট্টোৎপল, অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি আচার্য্যগণ ইহার প্রথয়িতা। এই দর্শনশাস্ত্র বেদমূলক নহে, ইহার ব্যাখ্যাতৃগণ কচিৎ উপনিষদ্‌বাক্য উদ্ধৃত করিলেও বৈদিক মতের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। তথাপি ইঁহারা কতকগুলি বিশেষ তন্ত্রের বচনের সহিত এই দর্শনের মত সংবাদিত করিয়া ইহার শাস্ত্রীয়তা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই দর্শনের মূল অন্বেষণ করিলে যদিও ইহাকে অবৈদিক দর্শন বলিতে হয়, তথাপি ইহাকে অশাস্ত্রীয় বলা যায় না। শৈবদর্শন হইতে এই মতের উৎপত্তি হইয়াছে। শৈবদর্শনসমূহের মধ্যে পাশুপত মত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; ইহা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শৈবদর্শন বিস্তারিত হইয়াছে। কাশ্মীরদেশপ্রচলিত শৈব মতই কালক্রমে পরিণতি লাভ করিয়া প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন নাম লাভ করে। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রতিষ্ঠাতৃগণ প্রচলিত শৈবদর্শনের সমস্ত প্রকার পরিভাষা, শ্রেণীবিভাগ, তত্ত্বসংখ্যা প্রভৃতি অধিকাংশ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু মূল কথা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার অভিমত প্রচার করিয়াছেন। অতএব প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের মূল পাশুপত দর্শন।

পাশুপতদর্শন অতি প্রাচীন। মহাভারত-রচনার সময়ে এই দর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত ও শাস্ত্রানুযায়ী বলিয়া আদৃত হইত। মহাভারতের নারায়ণীয় পর্ব্বের একটি শ্লোক হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। সেই শ্লোকটি এই,—

> সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।
> আত্মপ্রমাণান্যেতানি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ ॥(১)

সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র, বেদ, পাশুপত—এই সকল স্বতঃসিদ্ধ, কুতর্ক দ্বারা এই সকল মত নষ্ট করা উচিত নহে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, পাশুপত মতের সে সময় কিরূপ গৌরব ছিল। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রানুসারে তাঁহার ভাষ্যে বেদ ভিন্ন এই সকল

---

* উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে পঠিত।

(১) অধুনা প্রচলিত মহাভারতে এই শ্লোকের শেষ দুই চরণের বিভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়। যথা,—

> জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ।

যাহা হউক, এ পাঠেও পাশুপত মতের গৌরবের ন্যূনতা হয় না। কেন না, ইহাতেও পাশুপত শাস্ত্রকে বেদাদির সহিত সমশ্রেণীস্থ জ্ঞানপ্রতিপাদক শাস্ত্র বলা হইতেছে।

মতের প্রামাণ্য প্রথমে খণ্ডন করেন। তৎপরবর্ত্তী রামানুজ, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণব ভাষ্যকারগণ পাঞ্চরাত্র মতের সমর্থন করিলেও পাশুপতদর্শনের অপ্রামাণ্য বিষয়ে শঙ্করাচার্য্যের সহিত একমত হন। কেহই পাশুপতদর্শনের সমর্থনে অগ্রসর হন নাই। এ জন্য পাশুপতদর্শন অধুনা প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মহাকবি বাণভট্টাদির সময়েও যে এই মত সুপ্রচলিত ছিল, তাহা তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে বুঝা যায়। এক্ষণে মাধবাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণই ঐ মত জানিবার একমাত্র উপায়।

পাশুপত-মতাবলম্বিগণ মহাদেবকেই পরমেশ্বর বলেন। তাঁহারা জীবকে "পশু" শব্দে অভিহিত করেন এবং জীবগণের অধিপতি বলিয়া পরমেশ্বরকে পশুপতি আখ্যায় আখ্যাত করেন। ইহাঁদের মতে পরমেশ্বর জীবগণের কর্ম্মনিরপেক্ষ হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, কেন না, তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন বা স্বতন্ত্র, কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না। শৈব দার্শনিকগণ পাশুপত মতের এই অংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, পরমেশ্বর তাহাকে তদনুরূপ ফল প্রদান করেন। অতএব পরমেশ্বর কর্ম্মাদিসাপেক্ষকর্ত্তা। তাঁহারা আরও বলেন, এই মতই যুক্তিসিদ্ধ ; কারণ, দেখ, যদি কেবল পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারেই সমস্ত সম্পন্ন হইত, তবে তিনি আমাদের আহার-বিহারাদির উপায়স্বরূপ হস্ত-পদাদির সৃষ্টি করিবেন কেন? আর নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য সৃষ্টি করিবারই বা আবশ্যকতা কি? তাঁহার ইচ্ছা হইলেই ত ভোজনাদি সকল কর্ম্মই অনায়াসে সুনিষ্পন্ন হইতে পারিত। আর দেখা যাইতেছে, কেহ প্রাসাদতুল্য গৃহে দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় নিদ্রা যায়, কাহারও পক্ষে বা তরুতলে তৃণশয্যাও দুর্লভ। কেহ অমৃততুল্য সুস্বাদু দ্রব্য ভোজন করিয়া অতিতৃপ্তিবশতঃ তাহাও ঠেলিয়া ফেলিতেছে, কাহারও পক্ষে বা পথে পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট কদর্য্য অন্নও দুর্লভ। কেহ নৃত্য-গীতাদি প্রমোদে পরমানন্দে কাল যাপন করিতেছে, কাহারও পক্ষে বা দারিদ্র্য, শোক, পীড়া প্রভৃতির জন্য ক্ষণকাল যাপন করাও দুঃসহ। এই সকল দেখিয়া ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তত্তৎব্যক্তির পূর্ব্বকৃত সুকৃত-দুষ্কৃতই তাহাদের বিসদৃশ ফলভোগের কারণ, অন্যথা কখনই এরূপ ঘটিতে পারিত না। কেন না, পরমেশ্বর পরম করুণাময়, সকলেরই পিতৃস্বরূপ ও হিতৈষী। তাঁহার স্নেহের ন্যূনতা বা আধিক্য নাই এবং এক জনের সুখ ও আর এক জনের দুঃখ হউক, ইহাও তাঁহার অভিপ্রেত নহে। যদি কেবল তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে সমস্ত হইত, তবে সকলেই সুখী হইত—কেহই দুঃখী থাকিত না। তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে আমাদের যে কিঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্ব-শক্তি আছে, আমরা সেই শক্তি তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করি বলিয়াই, আমরা নানাবিধ দুঃখ ভোগ করি। অতএব যাহার যেরূপ কর্ম্ম, পরমেশ্বর তাহাকে তদনুরূপ ফলভোগে নিযুক্ত করেন বলিয়া, পরমেশ্বর যে কর্ম্মাদিসাপেক্ষ-কর্ত্তা, তাহাতে সন্দেহ কি? পরমেশ্বরের কর্ম্মনিরপেক্ষতা স্বীকার করিলে, তাঁহার উপর বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য, এই দুই দোষ আরোপিত করা হয়।

কিন্তু ইহাতে এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে যে, তাহা হইলে পরমেশ্বরের স্বতন্ত্রতা নষ্ট হইল। রাজা যদি অমাত্যাদির সাহায্য অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাঁহার যেমন স্বাধীনতা নষ্ট হয় না, সেইরূপ পরমেশ্বরেরও কর্ম্মাদিসাপেক্ষতায় স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় না। অন্তকর্ত্তৃক আদিষ্ট না হইয়া যিনি যাহা সম্পন্ন করেন, তাঁহার সে বিষয়ে স্বাধীনতা নষ্ট হয় না। যখন পরমেশ্বর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আদিষ্ট না হইয়াই জগৎ নির্ম্মাণ করিতেছেন, তখন অবশ্যই পরমেশ্বরের স্বতন্ত্রতা অব্যাহত আছে।

ইহাঁরা যে কেবল পরমেশ্বরের কর্ম্মসাপেক্ষতা স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহা নহে। ইহাঁরা নৈয়ায়িকগণের মত জগতের উপাদানকেও ঈশ্বরনিরপেক্ষ বলেন। ইহাঁদের মতে ঈশ্বর জগৎ নির্ম্মাণ করেন মাত্র। জগতের উপাদান অনাদি পদার্থ। জীবগণও ঈশ্বরভিন্ন ও অনাদি। কতিপয় দার্শনিক এই বিষয়ে বিভিন্ন মত অবলম্বন করিয়া প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারা জীবগণের কর্ম্মানুসারে ফলভোগ স্বীকার করেন, কিন্তু জীব ও জগদুপাদানের ঈশ্বরভিন্নতা স্বীকার করেন না। এই প্রকার মতভেদ অবলম্বন করিয়া, তাঁহারা প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন স্থাপিত করেন। কিন্তু অপরাপর অন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে শৈবদর্শনের সমস্ত বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা শৈবদর্শনোক্ত জীবের ত্রৈবিধ্য, ত্রিবিধ মল, ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব ও সমস্ত পরিভাষা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা শৈবগণের ন্যায় ভক্তবৎসল মহেশ্বরকেই জগদীশ্বর বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতিকে ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত জগদুপাদানরূপে অঙ্গীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—যেরূপ তপঃপ্রভাবশালী তাপসগণ, ইষ্টক চূর্ণ প্রভৃতি উপাদানসাপেক্ষ না হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে অট্টালিকা নির্ম্মাণ এবং স্ত্রী-সংসর্গ ব্যতিরেকেই মানস পুত্রাদি উৎপাদন করিয়া থাকেন, সেইরূপ জগদীশ্বর কোন উপাদানের অপেক্ষা না করিয়া জীবের অদৃষ্ট অনুসারে জগন্নির্ম্মাণ করিতেছেন, পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই কোন কার্য্যের কারণ নহে। যখন উপাদান ব্যতিরেকেও যোগিগণ ইচ্ছাবশতঃ অট্টালিকাদি সম্পন্ন করিতে পারেন, তখন সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরই বা কেন উপাদাননিরপেক্ষ হইয়া সৃষ্টি করিতে পারিবেন না? এই জন্য প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন-প্রতিষ্ঠাতা বসুগুপ্তাচার্য্য বলিয়াছেন;—

নিরুপাদানসম্ভারমভিত্তাবেব তন্বতে।
জগচ্চিত্রং নমস্তস্মৈ কলাশ্লাঘ্যায় শূলিনে॥

বর্ণ, তুলিকাদি উপকরণ-সম্ভার ব্যতিরেকেই যিনি অভিত্তিতে জগচ্চিত্র অঙ্কিত করেন, সেই অর্দ্ধেন্দুশেখর শূলপাণিকে নমস্কার।

এই জগন্নির্ম্মাণ-বিষয়ে জগদীশ্বর অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিয়োজিত নহেন এবং অন্য কোন বস্তুর সহায়তাও অবলম্বন করেন না, এ জন্য তাঁহাকে স্বতন্ত্র বলা যায়। তিনি নানাবিধ জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থ হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। আত্মচৈতন্য,

যুক্তি ও শাস্ত্রানুশাসন দ্বারা প্রমাণীকৃত জীবাত্মা হইতে তিনি ভিন্ন নহেন। যেমন স্বচ্ছ মুকুরে নানাবিধ দ্রব্য প্রতিবিম্বিত দেখা যায়, সেইরূপ পরমেশ্বর আপনাতে সমগ্র জগৎ প্রতিবিম্ববৎ প্রকাশিত করিতেছেন। বহুরূপী নট যেরূপ কখনও রাজা, কখনও বা ভিক্ষুক, কখনও পণ্ডিত, কখনও বা মূর্খ—এই প্রকার নানারূপে আপনাকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ জগন্নাট্যপ্রবর্ত্তক পরমেশ্বর নানা জীবরূপে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন। অতএব বাস্তবিক পক্ষে জীব পরমেশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেবল তাহার আপনাকে পরমেশ্বর বলিয়া চিনিবার অপেক্ষামাত্র আছে। এ জন্য বাহ্য ও আভ্যন্তর পূজা ও প্রাণায়ামাদিপ্রয়াস সমস্তই নিষ্প্রয়োজন, কেবল প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি ও মুক্তি লাভ করা যাইতে পারে। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের বিষয়বোধক শাস্ত্র পাঁচখানি—সূত্র, বৃত্তি, বিবৃতি এবং লঘু ও বৃহৎ বিমর্শিনী। সেই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রথম সূত্র এই,—

কথঞ্চিদাসাদ্য মহেশ্বরস্য
দাস্যং জনস্যাপ্যুপকারমিচ্ছন্।
সমস্তসম্পৎসমবাপ্তিহেতুং
তৎপ্রত্যভিজ্ঞামুপপাদয়ামি ॥

কোন প্রকারে মহেশ্বরের দাস্য লাভ করিয়া ও লোকের উপকারে ইচ্ছুক হইয়া সমস্ত সম্পৎ প্রাপ্ত হইবার হেতুস্বরূপ মহেশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞার (অর্থাৎ আপনাকে মহেশ্বর বলিয়া চিনিবার) উপায় বলিতেছি। "কোন প্রকারে" অর্থাৎ পরমেশ্বরের অনুগ্রহে প্রাপ্ত তাঁহা হইতে অভিন্ন গুরুচরণারবিন্দের আরাধনা করিয়া। "লাভ করিয়া" অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ও নির্ব্বাধভাবে [মহেশ্বরের দাস্যের] ফল লাভ করিয়া। ইহা দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা ও শাস্ত্রকরণের যোগ্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্যথা প্রতারণার অবতারণা হইবে। মায়া উত্তীর্ণ হইলেও মহামায়ার অধীন বিষ্ণু, বিরিঞ্চি প্রভৃতি যাঁহার ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্র প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বর বলিয়া পরিগণিত, তিনিই অনন্ত-প্রকাশ, আনন্দ ও স্বাধীনতার আশ্রয় ভগবান্ "মহেশ্বর"। প্রভু যাঁহাকে স্বেচ্ছানুসারে সমস্ত দান করেন, তিনিই দাস [দীয়তে অস্মৈ ইতি দাসঃ]। যিনি মহেশ্বরের ন্যায় সকল স্বাধীনতার পাত্র, তিনিই মহেশ্বরের দাস। কারিকায় নির্ব্বিশেষ জনশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, অতএব এই শাস্ত্রের অধিকারীর বিষয়ে কোন নিয়ম নাই। সকলেই এই শাস্ত্রে অধিকারী। মহেশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞাই সমস্ত সম্পৎ লাভের হেতু, কেন না, তদ্দ্বারা মহেশ্বরের দাস্য লাভ করিলে আর কিছুই প্রার্থনীয় থাকে না। এ জন্য ভট্টোৎপল বলিয়াছেন,—যাঁহারা ভক্তিসম্পন্ন, তাঁহাদের আর কি প্রার্থনীয় আছে? যাঁহারা ভক্তিদরিদ্র (ভক্তিশূন্য), তাঁহাদের অন্য প্রার্থনায় কি ফল?

উক্ত কারিকায় বহুব্রীহি সমাস দ্বারা সমস্ত-সম্পৎ-সমবাপ্তিই তাঁহার প্রত্যভিজ্ঞার হেতু—এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে। আমরা যে অংশে জ্ঞাতা ও কর্ত্তা, সে অংশে আমরা ঈশ্বর; আমাদের শক্তি বর্দ্ধিত হইতে হইতে যখন আমরা সমস্ত জানিতে ও করিতে

পারিব, তখন আমরা পরমেশ্বরই হইব। অতএব সমগ্র শক্তিলাভ ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞার হেতু। এই উপায়ের কথা পরে বিশেষভাবে বলা হইতেছে।

কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন, জীব যদি বাস্তবিকই পরমেশ্বর হয়, তবে প্রত্যভিজ্ঞারই বা কি প্রয়োজন ? আমার জানা না থাকিলেও বীজ সলিল-তাপাদির যথোপযুক্ত সাহায্য পাইলেই অঙ্কুরিত হইবে। সেইরূপ "আমি ঈশ্বর", এ কথা সত্য হইলে, আমার ঈশ্বরের ন্যায় ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে। বহ্নি কি বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকে ? কিন্তু এরূপ আপত্তি করা অসঙ্গত। বীজ, অগ্নি প্রভৃতি বাহ্য বস্তু অজ্ঞাত থাকিলেও তাহার শক্তি তাহাকে প্রকাশ করে, কিন্তু মানসিক ব্যাপারে অপরিজ্ঞান ফল প্রকাশে বাধা দেয়, এরূপ স্থলে প্রত্যভিজ্ঞার প্রয়োজন আছে। আমার বাল্যকালের বন্ধু আমার পার্শ্বে বসিয়া থাকিলেও, বন্ধুর সহিত উপবেশনে যে পরমানন্দ উপস্থিত হয়, সে আনন্দ আমি ততক্ষণ উপভোগ করিতে পারিব না, যতক্ষণ না আমি তাঁহাকে বাল্যবন্ধু বলিয়া চিনিতে পারি। অদৃষ্ট নায়কে বদ্ধানুরাগা বিরহিণী কামিনীর কান্ত অভিকল্পিত হইলেও, তাঁহার বিরহ-দুঃখ ততক্ষণ সমভাবেই থাকিয়া যাইবে, যতক্ষণ না তিনি সমীপস্থ পুরুষকে স্বীয় বল্লভ বলিয়া চিনিতে পারিতেছেন। সেইরূপ যদিও বিশ্বেশ্বরই আমাদের আত্মা, আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিকটস্থিত, তথাপি ততক্ষণ আমাদের দুঃখনিবৃত্তি বা পরমানন্দ লাভ হইবে না, যতক্ষণ না আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছি।

অতএব ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা আবশ্যক। কিন্তু মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনের সংগ্রহমাত্রকরণে ব্যাপৃত বলিয়া, কি উপায়ে প্রত্যভিজ্ঞা লাভ করিতে হয়, তাহা বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করেন নাই। ক্ষেমরাজকৃত প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয় হইতে নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। এই গ্রন্থে মাত্র কুড়িটি সূত্রে সমস্ত প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন বিবৃত হইয়াছে। ইহার কতকগুলি সূত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশ করা যাইতেছে।

চৈতন্য সর্ব্ব বস্তুর নিয়ামক, কিন্তু নিজে অন্য কোন বস্তু দ্বারা নিয়মিত হয় না, ইহা হইতেই সমস্ত জগৎ নিষ্পন্ন হয়। ইহা জগতের উৎপাদনে কোন উপাদানের অপেক্ষা করে না, স্বেচ্ছাক্রমে নিজেতে জগৎকে প্রকাশিত করে। কিন্তু চৈতন্য জগদ্রূপে পরিণত হয়, এরূপ বলা ঠিক নহে। দর্পণ যেরূপ স্বয়ং কোন রূপে পরিবর্ত্তিত হয় না, কিন্তু আপনাতে নানা বস্তু প্রকাশিত করে, সেইরূপ চৈতন্যও স্বয়ং অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া জগৎ প্রকাশিত করে। আবার দর্পণ যেরূপ মৃত্তিকা-বীজাদি কোন উপাদান না লইয়া, উদ্যানাদি প্রদর্শন করে, সেইরূপ চৈতন্যও স্বেচ্ছাক্রমে বিনা উপাদানে সমগ্র জগৎ প্রকাশিত করে। এই জগৎ নানা বৈচিত্র্যময়, কেন না, জীব ও জীবগণের ভোগ্য পদার্থ নানা প্রকার। জীব ও জীবগণের ভোগ্য পদার্থ পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া নানা প্রকার হয়। জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পদার্থ ভোগ করে, আবার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার জন্য জীবগণ পরস্পর অধিকতর ভিন্ন হয়। জীব ও ভোগ্য পদার্থ পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া নানা বৈচিত্র্যযুক্ত হয়। এরূপ স্থলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয় না, কেন না, এ স্থলে পরস্পরাশ্রয়ে

বৈচিত্র্যের উৎপত্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যেমন অন্ধ ও পঙ্গু পরস্পরের সাহায্যে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলে, উহাদের কার্য্য অন্যোন্যাশ্রয়াত্মক বলিয়া অসম্ভব বলা যাইতে পারে না, সেইরূপ উপরিউক্ত স্থলেও বৈচিত্র্যের উৎপত্তি অন্যোন্যাশ্রয়াত্মক বলিয়া অসম্ভব বলা উচিত নহে। যেরূপ দুইখানি পাতলা তক্তা পরস্পরের আশ্রয়ে ঊর্দ্ধভাবে অবস্থিত হইলে, উহাদের ঊর্দ্ধস্থিতি অন্যোন্যাশ্রয়াত্মক বলিয়া অসম্ভব বলা যাইতে পারে না, যেরূপ দুইখানি কাষ্ঠের পরস্পর সংঘর্ষে অগ্নি উত্থিত হইলে, ঐরূপ অগ্নির উৎপত্তি পরস্পরাশ্রয়াত্মক বলিয়া অসম্ভব বলা যাইতে পারে না, সেইরূপ উপরিউক্ত স্থলেও বৈচিত্র্যের উৎপত্তি অন্যোন্যাশ্রয়াত্মক বলিয়া অসম্ভব বলা উচিত নহে। এইরূপে জীব ও জীবভোগ্য পদার্থ পরস্পরপ্রভাবে নানাবিধ হওয়ায় বিশ্বও নানা বৈচিত্র্যযুক্ত হইয়াছে।

অতঃপর জীবের স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে। জীবে ও শিবে বাস্তবিক পক্ষে কোন ভেদ নাই; তবে শিবের মায়াশক্তি দ্বারা জীবের স্বরূপ অপ্রকাশিত রহিয়াছে বলিয়া জীব ও শিব ভিন্নবৎ প্রতীত হয়। যেরূপ অতি ক্ষুদ্র বীজে সুমহৎ বটবৃক্ষের স্বরূপ অনভিব্যক্ত ভাবে থাকে এবং অনুকূল অবস্থায় সেই অতিক্ষুদ্র বীজ যেরূপ মহামহীরুহে পরিণত হয়, সেইরূপ ক্ষুদ্রশক্তি মানবেও পরমমহেশ্বরের সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বরিক ক্ষমতা অনভিব্যক্ত অবস্থায় রহিয়াছে এবং অনুকূল অবস্থায় সেই ক্ষুদ্রশক্তি মানবও পরমমাহেশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে। আরও যেমন ভগবানের শরীর এই বিশ্বই, সেইরূপ জীবের শরীরও সঙ্কুচিত বিশ্বাত্মক। মানব-শরীরের কোন্ অংশ বিশ্বের কোন্ অংশের অনুরূপ, তাহা নানা পুরাণ-তন্ত্রাদিতে বিবৃত হইয়াছে। তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য যোগিজনবোধ্য, এ জন্য তাহা উল্লিখিত হইল না। বস্তুতঃ জীব ও শিবের অভেদ-তত্ত্বই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের সার কথা। এই মতে এই তত্ত্বের পরিজ্ঞানেই মুক্তি হয় ও ইহার অপরিজ্ঞানেই বন্ধন হয়।

যখন চিদাত্মা পরমেশ্বর নিজের স্বাতন্ত্র্যবশতঃ আপনাকে নানা রূপে প্রকাশিত করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার ইচ্ছাদিশক্তি বস্তুতঃ অসঙ্কুচিত থাকিলেও সঙ্কুচিতের ন্যায় প্রকাশ পায় এবং তখনই ইনি সংসারী জীবরূপে প্রতীয়মান হন। এই সময় তাঁহার অব্যাহত ইচ্ছাশক্তি অনভিব্যক্ত হওয়াতে, তিনি আপনাকে অপূর্ণ মনে করেন। তাঁহার জ্ঞানশক্তি সঙ্কুচিতবৎ হওয়ায়, তিনি দেহকেই আত্মা বলিয়া ভাবেন। তাঁহার ক্রিয়াশক্তি পরিমিত হওয়াতে তিনি শুভাশুভ অনুষ্ঠানে রত হন। তাঁহার অন্যান্য শক্তিও সঙ্কুচিতবৎ হইয়া যায়। এইরূপে তিনি শক্তি-দরিদ্র হইয়া সংসারী আখ্যা লাভ করেন। নিজের শক্তির বিকাশ হইলে, আবার শিব হন।

এখন মুক্তির উপায় বর্ণিত হইতেছে। চিদানন্দ লাভ হইলে অর্থাৎ স্বরূপাবস্থানের আনন্দ অনুভবের সামর্থ্য হইলে, "আমি চিন্মাত্র, দেহাদিভিন্ন", এইরূপ দৃঢ় প্রতিপত্তি জন্মে। এই সময় দেহাদির অনুভব বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু তাহা হইলেও তখন "আমি দেহাদিভিন্ন চিন্মাত্র" এইরূপ প্রবলতর জ্ঞান বিদ্যমান থাকায়, দেহাদিজ্ঞান জীবকে বিপথচালিত করিতে

পারে না। এইরূপ অবস্থাকে জীবন্মুক্ত অবস্থা বলে। চিদানন্দলাভ হইলে আত্মজ্ঞান ও জীবন্মুক্তি হয়। চিদানন্দলাভ কিরূপে হয়? মধ্যবিকাশ হইলে চিদানন্দলাভ হয়। মধ্য-বিকাশ কিরূপে হয়, তাহা বলা হইতেছে। সকলের অন্তরতমরূপে বর্তমান ও সকল বস্তুর স্বরূপপ্রকাশক বলিয়া সংবিৎ (চৈতন্য)কেই মধ্য বলা হয়। এই সংবিতের স্বরূপ মায়াদশায় পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীবদেহকে আশ্রয় করে। এ জন্য জীবগণ দেহদ্বার ব্যতিরেকে জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। সংবিৎ অসংখ্য নাড়ীপথে সমস্ত দেহ আশ্রয় করিয়া আছে। তথাপি প্রধানতঃ ইহা ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের মূল পর্য্যন্ত মধ্যমনাড়ী বা ব্রহ্মনাড়ী আশ্রয়ে অবস্থিত। কেন না, এই মধ্যম নাড়ী হইতে সকল মনোবৃত্তির উদয় হয় ও ইহাতেই সকল বৃত্তির লয় হয়। এরূপ হইলেও বদ্ধ জীবগণের সংবিৎ সঙ্কুচিত ভাবে অবস্থান করে। যখন এই সংবিতের সঙ্কোচভাব দূরীভূত হইয়া ইহা বিকশিত হয় অথবা মধ্যভূত ব্রহ্মনাড়ী বিকশিত হয়, তখন জীব চিদানন্দ লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হয়।

উপরিউক্ত মধ্যবিকাশের কতকগুলি উপায় কথিত হয়। (১) বিকল্পক্ষয়ের দ্বারা মধ্য বিকাশ হয়। এই উপায় সুখকর; কারণ, ইহাতে প্রাণায়াম, মুদ্রাবন্ধ প্রভৃতি যন্ত্রণাময় ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিতে হয় না। আমাদের আত্মস্বরূপে অবস্থিতির প্রতিবন্ধক আমাদের মনের সঙ্কল্প-বিকল্প। আমরা যদি কিছুই চিন্তা না করি, তাহা হইলে সকল বিকল্প ক্ষয় হয় অর্থাৎ আমাদের মনে কোন প্রকার সঙ্কল্প-বিকল্প উপস্থিত হয় না এবং তাহা হইলেই আমরা স্বরূপে অবস্থান করিতে পারি এবং তাহা হইলেই সংবিতের বিকাশ হয়। আমাদের সমস্ত জ্ঞানেই কোন না কোন বাহ্য বিষয় রহিয়াছে। এই বাহ্য বিষয় ত্যাগ করিতে পারিলেই, শুদ্ধ চৈতন্য-মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ইহাকে স্বরূপে অবস্থান বলে। তাহা হইতেই চিদানন্দ লাভ হয়। অতএব এই চিদানন্দ লাভ করিতে হইলে সমস্ত বাহ্য বিষয়ের চিন্তা ত্যাগ করিতে হয় বা অকিঞ্চিচ্চিন্তক হইতে হয়। তাহা হইলেই সংবিৎ বিকশিত হয়। শিবসূত্রে এই উপায়কে শাম্ভব উপায় বলা হইয়াছে এবং এই উপায়ই সর্ব্বপ্রথম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধদেবও শূন্য ভাবনা দ্বারা নির্ব্বাণ লাভের উপদেশ দিয়াছেন। (২) দ্বিতীয় উপায় শক্তি-সঙ্কোচ। এই উপায় কঠোপনিষদের চতুর্থ বল্লীর (বা দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম বল্লীর) প্রথম মন্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

• পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়-সকল বহির্মুখ করিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিয়াছেন, এজন্য তাহারা বাহিরের বস্তুকেই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। কোন উত্তমশালী পুরুষ বাহ্য বস্তু হইতে উহাদিগকে ব্যাবৃত্ত বা সঙ্কুচিত করিয়া চিদানন্দ উপভোগ করিতে করিতে প্রত্যগাত্মাকে

দেখেন। (৩) তৃতীয় উপায় শক্তির বিকাশ অর্থাৎ অন্তর্নিগূঢ় সমস্ত শক্তির যুগপৎ বিস্ফারণ। আমরা যখন কোন বস্তু দেখি, তখন আমরা সেই বস্তুকে জানিতে পারি এবং নিজকেও আংশিক ভাবে (অর্থাৎ সেই বস্তুর দ্রষ্টৃরূপে) জানিতে পারি। অন্য বস্তু দেখিলে, নিজেকে সেই অন্য বস্তুর দ্রষ্টৃরূপে আংশিকভাবে জানিতে পারি। আবার যখন কোন শব্দ শুনি, তখন আমরা সেই শব্দকে জানিতে পারি এবং নিজেকেও আংশিকভাবে (অর্থাৎ সেই শব্দের শ্রোতৃরূপে) জানিতে পারি। এইরূপ আমরা সমস্ত সময়ই নিজেকে জানিতেছি বটে, কিন্তু তাহা আংশিকভাবে মাত্র। কিন্তু যদি চেষ্টা দ্বারা আমাদের সমস্ত গূঢ় শক্তির প্রয়োগ করিয়া আমরা নিজেকে সর্ব্বভাবে জানিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান হয় ও তাহাতেই চিদানন্দ লাভ করিতে পারি। কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের মন এক একটি বিষয়ই এক এক সময়ে গ্রহণ করে, এ জন্য আমরা কেবল আমাদিগকে আংশিক ভাবে জানিতে পারি। এই অপূর্ণতা দূর হইয়া সমস্ত শক্তির বিকাশ হইলেও শিবত্ব লাভ হয়। শিবসূত্রে এই উপায়কে শাক্ত উপায় বলা হইয়াছে। (৪) চতুর্থ উপায় বাহচ্ছেদ বা প্রাণাপানের গতি-বিচ্ছেদ। যোগসূত্রে ইহাকে সমাধিলাভের উপায় বলা হইয়াছে। জ্ঞানগর্ভে উক্ত হইয়াছে,— যে ব্যক্তি স্বরবর্ণরহিত ককারহকারাদি প্রায় বর্ণ উচ্চারণপূর্ব্বক প্রাণাপানের গতি বিচ্ছেদ করে ও হৃৎপঙ্কজমধ্যে চিত্ত নিহিত করে, তাহার হৃদয়ান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া তাদৃশ ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞার অঙ্কুর উদিত হয়, যাহা পশুরও পরমমাহেশ্বর্য্য জন্মাইতে সমর্থ। আন্তন্ত-কোটিনিভালন, আনন্দপূর্ণস্বাত্মভাবনা প্রভৃতি আরও নানা উপায়ে চিদানন্দ লাভ হইতে পারে।

উক্ত উপায়-সকলের অভ্যাসে নিত্য সমাধিলাভ হয়। তাহা হইলেই নিজের পূর্ণস্বরূপে অবস্থান ঘটে এবং ঈশ্বরতাপ্রাপ্তি হয়। এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা ক্ষেমরাজকৃত প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয় হইতে সংগৃহীত। এই গ্রন্থখানির রচনা সরল হইলেও, অপরিচিত পারিভাষিক শব্দসঙ্কুল বলিয়া ইহার অনেক স্থল বুঝা যায় না। যাহা বুঝা গেল, তাহারই সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম উপরে বর্ণিত হইল।

শ্রীধীরেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

জ্ঞানদাসের পদাবলী*

বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে জ্ঞানদাসের স্থান অতি উচ্চ। বহু মনীষী সমালোচক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরেই জ্ঞানদাসের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; কেহ কেহ বা জ্ঞানদাস অপেক্ষা গোবিন্দদাসকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী সার্দ্ধ শতাধিক বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসই যে কবিত্ব-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, সে সম্বন্ধে সমালোচকগণমধ্যে মত-ভেদ দেখা যায় না। স্বর্গীয় হেমবাবু ও নবীন-বাবুর মত বিভিন্ন প্রকৃতির দুই জন কবির মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর, এক কথায় ইহার উত্তর দেওয়া যেরূপ অসম্ভব, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এক কথায় ইহার উত্তর দেওয়াও সেইরূপ অসম্ভব। এই জটিল প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে হইলে উল্লিখিত কবিদিগের মধ্যে কাহার কি বিশেষত্ব,—তাঁহারা কে কোন্ শ্রেণীর রচনায় অধিক দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মীমাংসা করাই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক হয়; উহা মীমাংসিত হইলে তাঁহাদিগের মধ্যে তুলনায় সমালোচনা কিয়ৎপরিমাণে সুসাধ্য হইতে পারে। জ্ঞান-দাস ও গোবিন্দদাস সমসাময়িক কবি ছিলেন; নরহরি চক্রবর্ত্তীর "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থের বর্ণনায় আমরা উভয়কেই তদানীন্তন অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনগণ সহকারে খেতুরীর শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসবে উপস্থিত দেখিতে পাই। জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস উভয়েই সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দী, মৈথিল প্রভৃতি ভাষা-সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন এবং উভয়েই পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের আদর্শে পদ-রচনা করিয়াছেন; তথাপি গোবিন্দদাসের পদাবলীতে বিদ্যাপতির—বিশেষতঃ জয়দেবের প্রভাব যেরূপ সুস্পষ্ট, জ্ঞানদাসের পদাবলীতে সেরূপ নহে; তাঁহার পদ-সমূহে নান্নুরের স্বভাব-কবি চণ্ডীদাসের প্রভাবই সুপরিস্ফুট। গোবিন্দদাস যেরূপ জয়দেবের অপূর্ব্ব অনুকরণে সুললিত অনুপ্রাস-যোজনা, পদ-মাধুর্য্য ও অলঙ্কার-চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া, আমাদিগের বিস্ময় ও প্রীতির উৎপাদন করেন, জ্ঞানদাসও সেইরূপ চণ্ডীদাসের ন্যায় প্রাঞ্জল ও সুগভীর রসপূর্ণ রচনায় আমাদিগকে বিমোহিত করিয়া থাকেন। জ্ঞানদাসের এই উৎকৃষ্ট পদগুলি প্রায় সমস্তই চণ্ডীদাসের ন্যায় অমিশ্র বাঙ্গালা ভাষায় রচিত। গোবিন্দদাসের অমিশ্র বাঙ্গালা পদ দুই চারিটি পাওয়া গেলেও, সেইগুলি তাঁহার উৎকৃষ্ট পদ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না; কিন্তু জ্ঞানদাসের—

"দেখ রি সখি শ্যামচন্দ
ইন্দুবদনি রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র যুবতিবৃন্দ
গাওয়ে রাগ-মালিকা॥

---

* রাজসাহী, উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ৮ম অধিবেশনে পঠিত।

মন্দ-পবন কুঞ্জ-ভবন
কুসুম-গন্ধ-মাধুরী।
মদন-রাজ নব সমাজ
ভ্রমর-ভ্রমরি-চাতুরী ॥

প্রভৃতি ব্রজবুলি পদগুলি বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের উৎকৃষ্ট মৈথিল ও ব্রজবুলি পদের সহিত তুলনার অযোগ্য নহে। পক্ষান্তরে জ্ঞানদাসের—

"দেখ্যা আইলাম তারে সই দেখ্যা আইলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে॥"
"সই কি না সে বঁধুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নহে পরতীত
যেন দারিদ্রের হেম॥"
"হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া
মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয়॥"

ইত্যাদি সরল, মধুর ও গভীর ভাবপূর্ণ বাঙ্গালা পদগুলির তুলনা-স্থল সমগ্র পদাবলি-সাহিত্যে ও বিরল। সুতরাং গোবিন্দদাসের ব্রজ-বুলি পদাবলী অনুপ্রাস, পদ-লালিত্য ও অলঙ্কার-পারিপাট্য বিষয়ে অতুলনীয় বলিয়া স্বীকার করিলেও বাঙ্গালা ও ব্রজ-বুলি—উভয়বিধ উৎকৃষ্ট পদ-রচনায় দক্ষতা ও অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ অত্যুৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদ-রচনার জন্য বাঙ্গালা ভাষার গীতি-কবিদিগের মধ্যে চণ্ডীদাসের পরেই জ্ঞানদাসের স্থান নির্দ্দেশ করিলে কোনরূপেই অসঙ্গত হইবে না।

এইরূপ একজন অতি শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবির পদাবলী বিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়া যে একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাহা বলা বাহুল্য। দুঃখের বিষয় এই যে, স্বর্গগত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় ব্যতীত জ্ঞানদাসের সমগ্র পদাবলীর প্রকাশ-কার্য্যে আর কেহই অগ্রসর হন নাই। রমণীবাবু চণ্ডীদাসের পদাবলীর ন্যায় জ্ঞানদাসের পদাবলীরও একটি সটীক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু হস্তলিখিত প্রাচীন বিশুদ্ধ আদর্শ পুথির অসদ্ভাব কিংবা অন্য যে কারণেই হউক, রমণীবাবুর চণ্ডীদাসের সংস্করণের ন্যায় জ্ঞানদাসের সংস্করণেও বহু স্থলে পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে ১৩২০ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় "প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ" শীর্ষক প্রবন্ধে চণ্ডীদাসের পদাবলীর আলোচনা-প্রসঙ্গে কর্ত্তব্যের অনুরোধে রমণী বাবুর কতকগুলি পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতি প্রদর্শিত করিয়া বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থ নির্ণয়ের জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছি। জ্ঞানদাসের কবিত্বের সমালোচনা ইতিপূর্ব্বে অল্প-বিস্তর অনেকেই

করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার পদাবলীর পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতি সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কোন আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না; সুতরাং অন্ত সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে সমাগত সুধীমণ্ডলীর সমক্ষে আমরা প্রচলিত প্রথা অনুসারে জ্ঞানদাসের কবিত্বের সমালোচনা না করিয়া যদি তাঁহার পদাবলীর উক্ত অসঙ্গতি ও উহা নিবারণের উপায় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি, তাহা হইলে বোধ হয়, অসঙ্গত কিংবা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রধানতঃ যে সকল কারণে জ্ঞানদাসের পদাবলীর পাঠ-বিকৃতি ঘটিয়াছে, আমরা সংক্ষেপে সেই কারণগুলির উল্লেখ করিয়া পরে দৃষ্টান্ত সহ উহাদিগের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

১ম। অক্ষর-বিনিময়-জনিত পাঠ-বিকৃতি। 'স' ও 'শ', 'ব' ও 'র', 'ল' ও 'ন', 'জ' ও 'য' এবং 'ও' ও 'ভু' অক্ষরের বিনিময়-জনিত গোলযোগ ইহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল।

২য়। অক্ষরচ্যুতি-জনিত পাঠ-বিকৃতি।

৩য়। শব্দ-চ্যুতি-জনিত পাঠ-বিকৃতি।

৪র্থ। অতিরিক্ত শব্দ-প্রয়োগ-জনিত পাঠ-বিকৃতি।

৫ম। পদচ্ছেদের অভাব কিংবা অপ-ব্যবহার-জনিত পাঠ-বিকৃতি।

৬ষ্ঠ। ভণিতার গোলযোগে পাঠ-বিকৃতি।

৭ম। উল্লিখিত একাধিক কারণে পাঠ-বিকৃতি।

পাঠ-বিকৃতি ঘটিলে অর্থ-বিকৃতিও অনিবার্য্য হইয়া পড়ে; সুতরাং পাঠ-বিকৃতির উল্লিখিত কারণগুলি অর্থ-বিকৃতিরও কারণ বটে; পাঠ-বিকৃতি না থাকিলেও শব্দার্থের বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাবে প্রকৃত অর্থ-বোধ না হইয়া অসদ্ব্যাখ্যার কারণ হইতে পারে; এই জাতীয় অর্থের অসঙ্গতির কয়েকটি দৃষ্টান্তও আমরা প্রদর্শন করিব।

আমরা যথাক্রমে এই সকল পাঠ ও অর্থ-বিকৃতির সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

পাঠ-বিকৃতি

১ম। অক্ষর-বিনিময়

(১) 'স' ও 'শ'-কারের গোলযোগ

প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে 'শ'কারের পরিবর্ত্তে প্রায় সর্ব্বত্রই স-কারের ব্যবহার দৃষ্ট হয়; কিন্তু কোন কোন স্থলে 'স'কারের পরিবর্ত্তেও 'শ'কার ব্যবহৃত হইয়াছে। হিন্দী ও মৈথিলভাষায় 'শ'কার প্রায় সর্ব্বত্রই 'স'কার অর্থাৎ ইংরেজি (S) অক্ষরের ন্যায় উচ্চারিত হয় বলিয়া, হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় 'শ্যাম', 'শাওন', 'শিঙ্গার' প্রভৃতি শব্দ 'স্যাম', 'সাওন', 'সিঙ্গার' লিখিত হইলেও বাঙ্গালা ভাষায়, এমন কি, ব্রজ-বুলি পদাবলীতে পর্য্যন্ত 'স' ও 'শ' ইংরেজি (sh) অক্ষরের ন্যায় উচ্চারিত হওয়ায় ব্যাকরণ ও ব্যুৎপত্তির দিকে লক্ষ্য না করিয়া 'শ'কারের পরিবর্ত্তে 'স'কারের ব্যবহার নিরর্থক ও অসঙ্গত

বিবেচনায় বঙ্গীয় পদাবলীর সম্পাদকগণ আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার রীতি অনুসারেই 'স' ও 'শ'কারের পার্থক্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে 'স'-কারের বাহুল্যবশতঃ উহাতে যে কচিৎ 'স'কারের পরিবর্ত্তেও 'শ'কার ব্যবহৃত হইয়া থাকিতে পারে, ইহা বিস্মৃত হওয়ায় পাঠ-বিকৃতির কারণ ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্ত যথা,—রমণী বাবুর সংস্করণে—

"শুনহ মাধব কহলুঁ তোয়
শমতি না দেই দিন রজনী রোয়॥"

১ম পৃষ্ঠা।

"এবে দিন দুই তিন দেখিয়ে আন ছান্দে।
ডাকিলে শমতি না দেয় আঁখি মেলি কান্দে॥"

৫ম পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'শমতি না দেই' বাক্যের অর্থ লিখিয়াছেন—"শান্তি প্রাপ্ত হয় না। শমতি—শমতা।" প্রথম উদাহরণে 'শান্তি' অর্থ কথঞ্চিৎ সংলগ্ন হইলেও 'ডাকিলে শমতি না দেয়' বাক্যে কোনরূপেই শান্তি বা 'শমতা' অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং এ স্থলে 'শমতি' শব্দের আর একটি সঙ্গত অর্থ খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক; সেইরূপ কোন অর্থের উদ্ভাবন করিতে না পারিয়াই বোধ হয় রমণীবাবু শেষোক্ত স্থলে 'শমতি' শব্দের অর্থ লিখেন নাই। বস্তুতঃ 'শান্তি' বা 'শমতা' অর্থ প্রথম উদাহরণেও সঙ্গত হইতে পারে না; 'শান্তি বা শমতা পাওয়া' অর্থে 'শান্তি বা শমতা দেওয়া' বাক্যের প্রয়োগ নিতান্ত বিরুদ্ধার্থজ্ঞাপক সন্দেহ নাই। আমাদিগের দৃষ্ট পদকল্পতরুর চারিখানা হস্তলিখিত পুথিতেই 'শমতি' স্থলে 'সমতি' পাঠ আছে। 'সমতি' শব্দটি সংস্কৃত 'সম্মতি' শব্দ-জাত; হিন্দী ভাষায় 'সম্মতি' অর্থে 'সুমৃতী' শব্দের ব্যবহার আছে*; সম্মতি অর্থে পদাবলি-সাহিত্যের অন্যত্রও 'সমতি' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, যথা,—

"সরস-বিরসময়ি ইঙ্গিতে রসবতি
অসমতি সমতি বুঝাব।"

—রাধামোহন; পদকল্পতরুর ৪৪৮ সংখ্যক পদ।

জ্ঞানদাসের উদ্ধৃত উদাহরণ দুইটিতে 'সমতি' পাঠ ও উহার 'সম্মতি' বা সাড়া দেওয়া অর্থই সুসঙ্গত; সুতরাং এ স্থলে যে 'স'কার ও 'শ'কারের গোলযোগ হেতু পাঠ-বিকৃতি ও তজ্জন্য অর্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা 'সাড়া দেওয়া' অর্থে 'সুমৈড় দেওয়া' বাক্যের ব্যবহার করিয়া থাকে। আমাদিগের বিবেচনা হয় যে, 'সম্মতি' শব্দ হইতেই এই 'সুমড়ি' বা

* ডাক্তার ফ্যালনের হিন্দুস্থানী-ইংরেজী অভিধানে 'সুমৃতী' শব্দ দেখুন।

'সুমৈড়' শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে ; কারণ, অন্ত্য 'ত' অক্ষর অপভ্রংশে 'ড়' অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হওয়ার দৃষ্টান্ত বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষায় একান্ত বিরল নহে। যথা—(সংস্কৃত) 'পতন'—(বাঙ্গালা) পড়ন ; (সংস্কৃত) 'উদ্ধৃত'—(বাঙ্গালা) 'উদড়া', (হিন্দী) 'উধেড়া' ; (সংস্কৃত) অর্দ্ধাবৃত—(বাঙ্গালা) 'আউদড়', 'আদুড়' ; (সংস্কৃত) 'নিগ্রিত'—(বাঙ্গালা) 'নিগড়া'। 'সাড়া' শব্দটির সহিত 'সুমৈড়' শব্দের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা চিন্তনীয়।

(২) 'ব'-কার ও 'র'-কারের গোলযোগ

প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে 'ব' ও 'র' অক্ষর দুইটি সর্ব্বত্র বিভিন্নরূপে লিখিত হয় নাই। কোন কোন পুথিতে 'র' অক্ষর 'ব'-কারের ন্যায় এবং 'ব' অক্ষরটি 'ৰ' অর্থাৎ হসন্ত 'ব'-কারের ন্যায় দৃষ্ট হয় ; হসন্ত চিহ্নটি আবার অনেক স্থলে লিপিকর-প্রমাদে পরিত্যক্ত হইয়া 'ব' ও 'র' অক্ষরের ভেদ-চিহ্ন লুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এরূপ স্থলে শব্দের অর্থ দ্বারা 'ব' ও 'র' স্থির করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই ; সুতরাং বিচার্য্য শব্দটির অর্থ না বুঝিতে পারায় অনেক সময়ে যে, 'ব' ও 'র'-কারের গোলযোগ হেতু পাঠ-বিভ্রাট ঘটিবে—ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। 'ব' ও 'র'-কারের গোলযোগের দৃষ্টান্ত পদাবলি-সাহিত্যে অনেক দেখা যায় ; আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে নিম্নে কতকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি।

"মুখে হাসি মিশা বাঁশী বায়।
রমিয়া অমিয়া বিধু জগত মাতায়॥"—২০ পৃষ্ঠা
"তাহে হাসি কয় কথা খানি।
অমিয়া রমিয়া বিধুর পড়িল অবনী॥"—২১ পৃষ্ঠা।

বলা বাহুল্য যে, 'রমিয়া' পাঠে কোন সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না ; উভয় স্থলেই 'রমিয়া' শব্দের পরিবর্ত্তে 'বমিয়া' পাঠ হইবে। 'বাম্যা' এই অসমাপিকা ক্রিয়া-পদ ও 'বমিত' এই ক্ত প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ উভয়ের অপভ্রংশ হইতেই 'বমিয়া' শব্দ হইতে পারে ; দ্বিতীয় উদাহরণে 'বমন করিয়া' অর্থে 'বমিয়া' শব্দের প্রয়োগ ব্যাকরণ-সিদ্ধ নহে বলিয়া যাঁহারা আপত্তি করেন, তাঁহারা 'বমিয়া' শব্দের 'বমিত' অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন ; বস্তুতঃ 'বমিত' অর্থে 'বমিয়া' শব্দের প্রয়োগ পদাবলি-সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না,—সুতরাং আমাদিগের মতে দ্বিতীয় উদাহরণের অশুদ্ধ প্রয়োগ কবি-প্রয়োগ বলিয়া সমর্থন করাই সমীচীন পন্থা।

পুনশ্চ দৃষ্টান্ত যথা,—

"দেখবি মোহন গোকুল-চন্দ।
রাধা রসবতী　　　　রসিকা-শিরোমণি
নব পরিচয় অনুবন্ধ॥"—২৭ পৃষ্ঠা।

"দেখবি সখি শ্যাম চন্দ
ইন্দুবদনী রাধিকা।" —১২১ পৃষ্ঠা

'দেখিবে' অর্থ এ স্থলে সুসঙ্গত নহে; আমাদিগের দৃষ্ট তিনখানা হস্তলিখিত পুথিতে 'দেখ রি' পাঠ আছে। 'রি' ও বাঙ্গালা 'রে' সমার্থক; প্রভেদ এই যে, হিন্দীতে স্ত্রীলোকের সম্বোধনেই 'রি' ব্যবহৃত হয়; যথা,—

"ঐসে বরখা রিতুমে কৈসে রহুঁ একলি
বীতি রয়না দিন বিপদ ভেল ভারি
এ রি সখি রি।"—হিন্দী গীত।

পদাবলি-সাহিত্যের অন্যত্রও 'রি' দৃষ্ট হয়; যথা,—

"আলি রি হামরা তোহারি কিয়ে নহিয়ে।
যো তুয়া দুখে সুখায়ত শতগুণ
তাহারে কি বেদন না কহিয়ে॥"
—বিন্দু; প-ক-ত, ৭১ সংখ্যক পদ।

পুনশ্চ যথা,—

"গিরিবর নিকট খেলত শ্যামসুন্দর
ঘূর্ণিত নয়ন বিশাল।
নৌতুন তৃণ হেরিয়া যমুনাতট
চঞ্চল ধায় গোপাল॥"—৩৬ পৃষ্ঠা।

বলা বাহুল্য যে, 'ধায়' পাঠে কোনই অর্থ হয় না; আমাদিগের দৃষ্ট সকলগুলি পুথিতেই 'ধাব' পাঠ আছে; উহাতে অর্থ হইবে—"নূতন তৃণ দেখিয়া গোপাল অর্থাৎ ধেনুর পাল (শ্রীকৃষ্ণ নহে) চঞ্চল-ভাবে যমুনার তটে ধাবিত হইতেছে।"

পুনশ্চ যথা—

"তোমার অধর-রস পানে মোর আশ।
করজ লিখিয়া লহ মুই তুয়া দাস॥"—২২০ পৃষ্ঠা।
"এত পরিহারে কহিয়ে তোমারে
মনে না ভাবিহ আন।
করজ লিখিয়া লেহয়ে আমার
দাস করি অভিমান॥"—২২১ পৃষ্ঠা।

'করজ' শব্দটি মুসলমান-অধিকার সময়ে আরবী ভাষা হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। উদ্ধৃত স্থলে কর্জ্জপত্র (Bond) লিখা অর্থ সংলগ্ন হয় না; দাস-পত্র অর্থাৎ দাসরূপে আত্ম-বিক্রয়ই পদকর্তার অভিপ্রেত অর্থ। আমাদিগের দৃষ্ট তিনখানা হস্তলিখিত পুথিতে 'কবজ' পাঠ আছে; আরবী 'কবজ' শব্দের অর্থ 'রসিদ'; শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের

দেশে বিক্রয় কবালার সঙ্গে একখানা 'কবজ' লিখিত হইত; তাহাতে কবালার লিখিত মূল্যের টাকা প্রাপ্ত হইয়া বিক্রেতা ক্রেতাকে বিক্রীত ভূমির দখল ত্যাগ করিলেন—এইরূপ 'এবারত' লিখা থাকিত; উদ্ধৃত উদাহরণে ঠিক সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে; সুতরাং এ স্থলে 'কবজ'ই প্রকৃত পাঠ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(৩) 'ল' ও 'ন'-কারের গোলযোগ

প্রাচীন পুথির 'ল' ও 'ন'-অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। লিপিকরদিগের অপ্রনিধানে অনেক স্থলেই সেই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি রক্ষিত না হওয়ায় 'ল' ও 'ন' অক্ষরের গোলযোগ হেতু পাঠ-বিকৃতির কারণ ঘটিয়াছে।

'ল' ও 'ন'-কারের গোলযোগের সর্ব্বপ্রধান দৃষ্টান্ত 'নেহ' ও 'লেহ' শব্দদ্বয়। সংস্কৃত 'স্নেহ' শব্দের অপভ্রংশ হইতে 'সিনেহ' ও 'নেহ' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। পদাবলি-সাহিত্যের হস্তলিখিত ও মুদ্রিত গ্রন্থে 'সুলেহ' ও 'লেহ' শব্দেরও বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বিদ্যাপতির পদাবলির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় 'সুলেহ' ও 'লেহ' শব্দ অশুদ্ধ বিবেচনায় সর্ব্বত্রই 'সিনেহ' ও 'নেহ' লিখিয়াছেন। আমাদিগের বোধ হয়, 'সিনেহ' ও 'নেহ' রূপ দুইটিই প্রাচীনতর। সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থালয়ে রক্ষিত পদকল্পতরুর একখানা পুথিতে আমরা কোথায়ও 'লেহ' বা 'সুলেহ' শব্দ পাই নাই, উহাদিগের পরিবর্ত্তে 'নেহ' ও 'সুনেহ' পাইয়াছি। হিন্দী ও মৈথিল সাহিত্যেও 'নেহ' শব্দেরই প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; সুতরাং 'ল' ও 'ন' অক্ষরের গোলযোগ হইতেই প্রথমে 'লেহ' ও 'সুলেহ' শব্দ দুইটির উৎপত্তি হইয়াছে—ইহা অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু ভাষা-তত্ত্বের আলোচনা করিলে এইরূপ ভ্রান্ত সাদৃশ্যের (false analogy) অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যে শব্দ একবার ভাষায় চলিয়া গিয়াছে, তাহা ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ না হইলেও তাহা পরিত্যাগ করা অসম্ভব। 'করিলুঁ', 'গেলুঁ' ইত্যাদি রূপ 'করিনু', 'গেনু' ইত্যাদি রূপ অপেক্ষা অধিক প্রাচীন ও বিশুদ্ধ হইলেও 'করিনু', 'গেনু' শব্দগুলিকে এখন অশুদ্ধ বলিয়া ত্যাগ করা যাইতে পারে না। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে 'লেহ' ও 'সুলেহ' শব্দ দুইটিকেও পাঠ-বিকৃতির উদাহরণস্বরূপ গণ্য করা অসঙ্গত বিবেচনায় আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে অন্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি; যথা,—

"অলখিতে হৃদয়ক　　　অন্তর অপহর
　　পাশরিণ না হয় স্বপনে।"—২২ পৃষ্ঠা।

"পুলকি রহল তনু পুন পরসঙ্গ।
নীপ-নিকরে কিয়ে পূজন অনঙ্গ॥"—২৪ পৃষ্ঠা।

"জ্ঞানদাস কহে কানাই পাগুনি কর দূর।
চরণে পরাও তুমি কনয় নূপুর॥"—১০০ পৃষ্ঠা।

প্রথম উদাহরণের 'পাশরিণ' পাঠ অর্থ-শূন্য; উহার স্থলে 'পাসরিল' পাঠ হইবে;

'পাসরিল' শব্দের অর্থ 'পাসরণ' অর্থাৎ বিস্মরণের যোগ্য। যোগ্য অর্থে ও অতীত কালের 'ক্ত' প্রত্যয়ের অর্থে কৃদন্ত-বিভক্তি 'ইল'-প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রয়োগ পদাবলি-সাহিত্যে অনেক আছে; যথা,—

"যে চিতে দড়াঞাছি সেই সে হয়।
খেপিল বাণ যেন রাখিল নয়॥"—জ্ঞানদাস, ১১৭ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ ক্ষিপ্ত বাণ রক্ষণের যোগ্য নহে।

দ্বিতীয় উদাহরণের 'পূজন' স্থলে 'পূজল' পাঠই সমীচীন বটে; 'পূজল' শব্দের কর্তৃ-পদ 'তনু'; পংক্তিদ্বয়ের অর্থ এই যে,—"(শ্রীরাধার) দেহ (শ্রীকৃষ্ণের) পুনঃপ্রসঙ্গে রোমাঞ্চিত হইয়া রহিল; (ঐ তনু) কদম্ব-সমূহ দ্বারা কি (প্রেম-দেবতা) কন্দর্পকে (সন্তুষ্ট করার জন্য) পূজা করিল?"

তৃতীয় উদাহরণের পংক্তি-দ্বয়,—

"প্রাণনাথ কি বলিব তোরে।
জাগিল গোকুলের লোক কেমনে যাব ঘরে॥ ধ্রু॥
তোমার পীত ধটী আমারে দেহ পরি।
উভ করি বান্ধ চূড়া আউলাইয়া কবরী॥"

ইত্যাদি পদটির ভণিতা। শ্রীরাধার সখী-স্থানীয় পদ-কর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—"ওহে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি (শ্রীরাধার) পাশুনি (?) দূর কর এবং চরণে স্বর্ণ-নূপুর পরিধান করাও।" রমণী বাবু 'পাশুনি' শব্দটি 'পিশুন' বা 'পৈশুন্য' শব্দের অপভ্রংশ মনে করিয়াই বোধ হয় লিখিয়াছেন—"পাশুনি—পাপ"। 'পাশুনি' শব্দের অস্তিত্ব ও উহার উল্লিখিত অর্থ তর্ক-স্থলে স্বীকার করিয়া লইলেও উহাতে যে এ স্থলে নিতান্ত হাস্য-জনক অর্থ হয়, তাহা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। বস্তুতঃ 'পাশুনি' শব্দই নাই; 'পাশুলি' শব্দই 'ল' ও 'ন' অক্ষরের গোলযোগ হেতু 'পাশুনি' লিখিত হইয়াছে। 'পাশুলি' স্ত্রীলোকের পরিধেয় পা-ঝাঁপ কিংবা ঐ জাতীয় কোন অলঙ্কার হইবে; জ্ঞানদাস শ্রীরাধার সম্পূর্ণ পুরুষীকরণ উদ্দেশ্যে তাঁহার 'পাশুলী' খসাইয়া উহার পরিবর্ত্তে পুরুষ-অলঙ্কার নূপুর পরিধান করাইবার জন্য সময়োচিত উপদেশ প্রদান করিয়া, কৌশলে একটু রসিকতা করিয়া লইয়াছেন; কেন না, নায়ক কর্ত্তৃক নায়িকার চরণ ধারণ নিতান্তই হাস্যকর ও সখীদিগের কৌতুক-জনক, সন্দেহ নাই।

(৪) 'জ' ও 'য'-কারের গোলযোগ

প্রাচীন পুঁথিতে 'য' অক্ষরের পরিবর্ত্তে অধিকাংশ স্থলে 'জ' অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন স্থলে 'য়' অক্ষরটির পুটুলি লিপিকর-ভ্রমে পরিত্যক্ত হওয়ায় 'য়' অক্ষরটি প্রথমে 'য' অক্ষরে এবং পরে আবার কোন পণ্ডিতম্মন্য লিপিকর কর্ত্তৃক 'জ' অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিষম গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে। সেইরূপ অনেক স্থলে 'অ' ও 'আ' অক্ষরের পরিবর্ত্তে

'য়' ও 'য়া' অক্ষর ব্যবহৃত হওয়ায়, 'য়' ও 'য়া' অক্ষরের পুটুলি ভুলে পরিত্যক্ত হইয়া আগে 'য' ও 'যা' অক্ষরে এবং পরে উহাই 'জ' ও 'জা' অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে ইহার দুইটি হাস্যজনক উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা ;—

"হামরা দুহুঁ জন পথে একু মেলি।
সুজান জন সঞে করু আন খেলি॥"—২৮ পৃষ্ঠা।

"উচ্চণ্ড দেখিয়া বেলা ডাকিতে আইনু মোরা
যতেক গোকুলের রাখ জান।
একেলা মন্দির মাঝে আছ তুমি কোন কাজে
এ তোমার কেমন ঠাকুরাণ॥"—৩২ পৃষ্ঠা।

প্রথম উদাহরণের 'সুজান' পাঠ-স্থলে 'সো আন' পাঠ হইবে। 'সো আন' শব্দদ্বয় কোন পুথিতে 'সো য়ান' লিখিত হওয়ায় ও 'য়' অক্ষরের পুটুলিটি ভুলে পরিত্যক্ত হওয়ায় 'সো যান' শব্দই পরে কোন পণ্ডিতম্মন্য লিপিকর কর্ত্তৃক 'সুজান' শব্দে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় উদাহরণে 'রাখ জান' কিংবা 'রাখজান' কোন পাঠেই অর্থ হয় না ; 'রাখয়াল' শব্দটির 'য়' অক্ষরের পুটুলি ভ্রমে পরিত্যক্ত হওয়ায় ও পরে 'য' অক্ষর 'জ' অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এই আপাত-দুর্ব্বোধ্য পাঠ-বিকৃতির সৃষ্টি করিয়াছে। 'রাখয়াল' ও 'ঠাকুরাল' শব্দের অন্ত্য 'ল' অক্ষর 'ল' ও 'ন'-কারের গোলযোগে 'ন' অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। 'ঠাকুরাণী' শব্দের অপভ্রংশ 'ঠাকুরাণ' শব্দ থাকিলেও, এ স্থলে উহা প্রযুক্ত হইতে পারে না ; এ স্থলের 'ঠাকুরাল' শব্দ 'ঠাকুরালি' শব্দেরই রূপান্তর এবং উহার অর্থ 'বড়মানষি'।

(৫) 'ও' ও 'তু' অক্ষরের গোলযোগ

অনেক প্রাচীন পুথিতেই 'ও' অক্ষর ও 'তু' অক্ষর দেখিতে একই প্রকার। সুতরাং উহাদিগের গোলযোগে যে পাঠ-বিভ্রাট ঘটিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে একটি দৃষ্টান্ত দেখুন,—

"উলট কদলী উরু গুরুয়া নিতম্ব।
জ্ঞানদাসের পহুঁ জিয়ে তুই অবলম্ব।"—৫৫ পৃষ্ঠা।

'তুই' পাঠে কোনই অর্থ হয় না। উদ্ধৃত পংক্তিদ্বয় শ্রীরাধার রূপ-বর্ণনাত্মক 'ঢল ঢল কসিত কাঞ্চন তনু গোরী' ইত্যাদি পদের ভণিতা। জ্ঞানদাস অপূর্ব্ব রসিকতার সহিত বলিতেছেন,—"(শ্রীরাধার) উরু উলটা কদলী-তরু (স্বরূপ) ও নিতম্ব বিশাল (অর্থাৎ ঘটের স্বরূপ) ; জ্ঞানদাসের প্রভু শ্রীকৃষ্ণ (জলমগ্ন ব্যক্তির ন্যায়) উহা আশ্রয় করিয়া (ভব-সাগরে) বাঁচিয়া আছেন।" এ স্থলে 'ওই' শব্দ প্রাচীন পুথিতে 'তুই' শব্দের সমানাকার বলিয়া পরবর্ত্তী লিপিকর কর্ত্তৃক ভ্রমবশতঃ 'তুই' শব্দে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

(৬) অন্যান্য অক্ষরের বিপর্য্যাস হেতু পাঠ-বিকৃতি

অন্যান্য অক্ষরের বিপর্য্যাস-বশতঃও অনেক স্থলে পাঠ-বিকৃতি দৃষ্ট হয়; আমরা নিম্নে উহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি,—

"এ সখি এ সখি দেখলু নারী।
হেরইতে হরখে হরল যুগ চারি॥"—২৯ পৃষ্ঠা।

'নায়িকার দর্শন-জনিত আনন্দে যুগ-চতুষ্টয়কে হরণ করিল'—এরূপ অর্থ যে নিতান্তই অসংলগ্ন, তাহা বলা বাহুল্য। এই পদটি পদকল্পতরু গ্রন্থে নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংগৃহীত "পদরত্নাকর" গ্রন্থে—"হেরইতে হরখে" ইত্যাদি স্থলে "হেরইতে হরখ রহল যুগ চারি॥" পাঠ আছে;—উহার অর্থ এই যে, "(নায়িকাকে) দেখিলে (সেই) হর্ষ যুগ-চতুষ্টয়-পরিমিত কাল স্থায়ী হইল।" (অতিশয়োক্তি-অলঙ্কার দ্বারা হর্ষের প্রাবল্য ব্যঞ্জিত হইতেছে)।

পুনশ্চ সেই পদে—

"পরসে পুছলুঁ হাম তাকর নাম।
জ্ঞানদাস কহব রসিক সুজান॥"—২৯ পৃষ্ঠা।

এ স্থলে 'পরসে' শব্দের 'স্পর্শ করিয়া' অর্থ কোন রূপেই সংলগ্ন হয় না; 'পর সে' পাঠ কল্পনা করিয়া 'অন্যের নিকট হইতে' অর্থ করিলে যদিও কিঞ্চিৎ সংলগ্ন হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানদাস প্রভৃতি বঙ্গীয় পদকর্ত্তাদিগের পদাবলীতে 'পর সে' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না; সেইরূপ অর্থ পদ-কর্ত্তার অভিপ্রেত হইলে তিনি 'পর সঞে' লিখিতেন। 'পর সঞে' পাঠ কোন পুথিতে নাই এবং কল্পনা করিলেও তদ্দ্বারা ছন্দোভঙ্গ ঘটে; সুতরাং 'পরসে' পাঠের পরিবর্ত্তে পদরত্নাকর গ্রন্থের 'পরখে' পাঠই সমীচীন বোধ হয়। 'পরখে' অর্থাৎ পরোক্ষে, কি না শ্রীরাধার অসমক্ষে আমি তাঁহার নাম (নিকটস্থ লোকদিগকে) জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহাই ঐ পংক্তির অর্থ। অপরিচিত কুল-কামিনীর নিকট নাম জিজ্ঞাসা কিংবা তাঁহার সমক্ষে অন্যের নিকট তাঁহার নাম-জিজ্ঞাসা—ইহার কোনটিই ভদ্রোচিত নহে; সে জন্যই—

"জ্ঞানদাস কহ রসিক সুজান॥"

অর্থাৎ জ্ঞানদাস তাহা দেখিয়া কহিতেছেন, (হে শ্রীকৃষ্ণ!) তুমি বিলক্ষণ রসিক ও সজ্জন বটে। পদ-রত্নাকরের 'জ্ঞানদাস কহ' পাঠই শুদ্ধ; কারণ, 'কহব' পাঠে ছন্দঃপতন ঘটে ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদ প্রয়োগের কোন সার্থকতাও দেখা যায় না।

পুনশ্চ——

"ভুলিল চকোর চাঁদ জনু পাওল
মন্দিরে নাচয়ে ফেরি।"—৩৯ পৃষ্ঠা।

'ভুলিল' পাঠে ভাল অর্থ হয় না ; 'ভুখিল' অর্থাৎ ক্ষুধিত চকোর যেন চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইল, ইহাই সঙ্গত অর্থ বটে।

পুনশ্চ—

"সজনি ও কথা কথন নয়।
শ্যাম সুনাগর　　　　গুণের সাগর
পড়িনু কোলে ঘুমায় ॥ ধ্রু ॥—৮২ পৃষ্ঠা।

পদকল্পতরুর চারিখানা হস্তলিখিত পুথিতে 'কথন' স্থলে 'কহিল' এবং পদরত্নাকরে 'কথন' পাঠ আছে। 'কহিল নয়' অর্থাৎ 'কহিবার যোগ্য নয়'। পদরত্নাকরের 'কথন' পাঠ অপেক্ষা 'কহিল' পাঠই সমীচীন। 'কথন' শব্দের 'থ' অক্ষরটি সাদৃশ্যবশতঃ 'খ' অক্ষরে পরিবর্তিত হইয়াই যে এই পাঠ-বিকৃতির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

পুনশ্চ —

"বয়স কিশোর　　মোহন ঠাম
নিরখি মুরছি　　পতত কাম
সজল জলদ　　শ্যাম ধাম
পিঙল বসন দামিনী।"—১২৬ পৃষ্ঠা।

আমাদিগের দৃষ্ট সকল পুথিতেই 'পতত' স্থলে 'পড়ত' পাঠ আছে ; উহাই সঙ্গত পাঠ। কারণ, হিন্দী, মৈথিল কিম্বা বাঙ্গালা পদাবলি-সাহিত্যে 'পত' ধাতুর অপভ্রংশ-জাত 'পড়ই', 'পড়ত', 'পড়ল' ইত্যাদি পদেরই প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, 'পতই', 'পতত', 'পতল' ইত্যাদি প্রয়োগ কোথাও পাওয়া যায় না।

'পিঙল বসন দামিনী' বাক্যের 'পিঙল' পাঠ বটতলার মুদ্রিত গ্রন্থে ও উহার আদর্শ পুথিতে পাওয়া গেলেও উহা সমর্থনযোগ্য নহে। 'পিঙল' শব্দে পীত-বর্ণ বুঝায় না, সুতরাং উহা শ্রীকৃষ্ণের তড়িদ্বর্ণ পীত বসনের প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে না। চণ্ডীদাসের 'পরাণনাথকে সপনে দেখিলুঁ' ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পদের—

'পিয়ল বরণ　　　　বসনখানিতে
মুখানি আমার মোছে।'

বাক্যের ন্যায় এ স্থলেও তিনখানা প্রাচীন পুথিতেই 'পিয়ল' পাঠ আছে ; 'পীত' শব্দ হইতেই অপভ্রংশ 'পিয়ল' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে ; ইহার অন্ত্য 'ল' অক্ষরটি 'শ্যামল', 'পিজল' প্রভৃতি লকারান্ত শব্দের ভ্রান্ত-সাদৃশ্য হইতে জাত বলিয়াই বিবেচনা হয়।

পুনশ্চ—

"যে মোর করমে　　　　লিখন আছিল
বিহি ঘটাওল মোরে।
তোমরা কুলবতী　　　　দেখিনু চুকতি
কুল লৈয়া থাক ঘরে॥"—১৭৩ পৃষ্ঠা।

'দেখিনু চুকতি' বাক্যের 'চুকতি' পাঠে এখানে কোনই অর্থ হয় না; বটতলায় মুদ্রিত পুস্তকে ও উহার আদর্শ পুথিতে 'দেখিনু মুকতি', "পদরসসার" পুথিতে 'দেখিলে মুকতি' পদরত্নাকর ও পদকল্পতরুর অন্যতম পুথিতে 'দেখিলে মুরতি' এবং অন্য দুইখানা পুথিতে 'দেখিলে কুমতি' পাঠ আছে। শেষোক্ত পাঠের অর্থ—'কুলবতী তোমরা আমার কুবুদ্ধি দেখিলে; (সুতরাং সতর্ক হও) কুল রক্ষা করিয়া গৃহে থাক।' 'তোমরা কুলবতী, তোমাদিগকে দেখিলে মুক্তি হয়', এইরূপ অর্থ করিলে তীব্র বিদ্রূপ প্রকাশ পায়,—প্রিয়-সখীদিগের প্রতি সেইরূপ বিদ্রূপোক্তি করার কোন কারণ দেখা যায় না।

পুনশ্চ—

"রস নবলেশ দেখায়লি গোরী।
পায়লি রতন পুন লেয়লি ছোড়ি॥"—২১৭ পৃষ্ঠা।

'ছোড়ি' পাঠ সম্পূর্ণ নিরর্থক। 'ছোড়ি' স্থলে শুদ্ধ পাঠ 'চোরি' হইবে। ইহার প্রায় সদৃশ ভাব গোবিন্দদাসের একটি পদে দৃষ্ট হয়; যথা,—

"হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরি।
দেই রতন পুন লেয়লি চোরি॥"
প-ক-ত, ৫২ সংখ্যক পদ।

পুনশ্চ—

"হিমকর উগ হতে দিনকর তেজ।
নলিনী বিছায়ত কণ্টক-শেজ॥"—২৩৫ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'উগ' একটি পৃথক্ শব্দ মনে করিয়া উহার অর্থ লিখিয়াছেন 'উগ্র'। বস্তুতঃ 'উগ্র' অর্থে 'উগ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না; ঐরূপ শব্দ বা অর্থ থাকিলেও 'হতে' শব্দটিকে 'হৈতে' কল্পনা করিয়া 'হিমকর দিনকর-তেজ হইতে উগ্র' এরূপ দূরান্বয় ও দুরন্বয় না করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। আমাদিগের দৃষ্ট সকল পুথিতেই 'উগইতে' পাঠ আছে; 'উগইতে' শব্দের অর্থ এখানে 'উদিত হইলে'; সুতরাং 'হিমকর উগইতে' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ—'চন্দ্র উদিত হইলে সূর্য্যের তেজ (বিস্তার করে) অর্থাৎ শ্রীরাধার বিরহ-জনিত সন্তাপ হেতু শীতরশ্মি চন্দ্রও উষ্ণ-রশ্মি সূর্য্যের ন্যায় অসহ্য বোধ হয়।'

এইরূপ অক্ষর-বিপর্য্যাস-জনিত পাঠ-বিকৃতির উদাহরণ আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলীতে আরও কয়েকটি প্রাপ্ত হইয়াছি;—বাহুল্য-ভয়ে তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

২য়। অক্ষর-চ্যুতি-জনিত পাঠ-বিকৃতি

নানা কারণেই অক্ষর-চ্যুতি ঘটিতে পারে; একই অক্ষর কোন শব্দে পাশাপাশি ভাবে একাধিক বার প্রযুক্ত হইলে, লিপিকর-ভ্রমে দুই একটি পরিত্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক বটে। আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে অক্ষরচ্যুতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি;—

"অপরূপ পবনে সঘন তনু দোলত
গগন সহিত দ্বিজরাজ।
চঞ্চল চরণ- কমল মণি নূপুর
শবদ মঙ্গল পুর॥"—১৩ পৃষ্ঠা।

পদকল্পতরুর সকল পুথিতেই 'শবদ' স্থলে 'সশবদ' পাঠ আছে; তবে কোন কোন পুথিতে প্রাচীন রীতি অনুসারে উহা 'সসবদ' লিখিত হইয়াছে। এই 'সসবদ' শব্দে 'স' অক্ষরটি পাশাপাশি ভাবে দুইবার প্রযুক্ত হওয়ায় উহা ভ্রম-জনিত বিবেচনা করিয়া নিরক্ষর ছন্দোজ্ঞান-হীন লিপিকর কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় ও তৎপরে পণ্ডিতম্মন্য কোন লিপিকর কর্তৃক 'সবদ' 'শবদ'রূপে পরিবর্ত্তিত হওয়ায়ই এই পাঠ-বিকৃতির কারণ ঘটিয়াছে। অক্ষর-চ্যুতিতে প্রায়শই অর্থের অসঙ্গতি ও ছন্দোভঙ্গ ঘটিয়া থাকে; সুতরাং অর্থ-বিচার ও ছন্দোবিজ্ঞানই এই শ্রেণীর পাঠ-বিকৃতি নির্ণয়ের প্রধান উপায়। অর্থ ও ছন্দোবিচার দ্বারা বর্ণ-চ্যুতি অনুমিত হইলে যদি কোন প্রাচীন পুথির পাঠের দ্বারা অর্থ ও ছন্দের অসঙ্গতি বিদূরিত হয়, তাহা হইলে উহাই যে প্রকৃত পাঠ, তৎসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। উদ্ধৃত উদাহরণে 'সশবদ' পাঠ গ্রহণ না করিলে অর্থের অসঙ্গতি ও ছন্দোদোষ নিবারিত হয় না, সুতরাং উহাই শুদ্ধ পাঠ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

পুনশ্চ দৃষ্টান্ত যথা,—
"একসরি যাইতে যমুনা-তীর।
অলখিতে আওল শ্যাম-শরীর॥
অম্বরে ছিল মোর অঙ্গ উদাস।
কত বেরি হেরি হেরি মৃদু মৃদু হাস॥"—৯২ পৃষ্ঠা।

এ স্থলে 'অম্বরে অর্থাৎ বস্ত্রে আমার অঙ্গ উদাস অর্থাৎ উন্মুক্ত ছিল'—এই বাক্যটি বিরুদ্ধার্থ বলিয়াই বিবেচনা হয়; পদকল্পতরুর দুইখানা পুথিতে 'অসম্বরে ছিল মোর অঙ্গ উদাস' পাঠ আছে। পদাবলি-সাহিত্যে সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বের অক্ষর বিবক্ষা (Option) বশতঃ কখনও গুরু, কখনও লঘু হয়, সুতরাং এ স্থলে 'অম্বরে' ও 'অসম্বরে' উভয় পাঠেই ছন্দ বজায় থাকে। সুতরাং কেবল অর্থের অসঙ্গতি দর্শনেই অম্বরে পাঠের পরিবর্ত্তে 'অসম্বরে' পাঠ স্বীকার করিতে হইবে। ইহা বর্ণ-বিপর্য্যাস ও বর্ণচ্যুতি উভয়বিধ কারণ-জনিত পাঠ-বিকৃতির দৃষ্টান্ত বটে।

পুনশ্চ—
"বীণ রবাব মুরজ পিনাস।
বিবিধ যন্ত্র লেই করয়ে বিলাস॥"—১১৫ পৃষ্ঠা।

'পিনাস' শব্দটির সহিত একটা সাহিত্যিক বাগযুদ্ধের ইতিহাস বিজড়িত রহিয়াছে; তাহা না বলিলে চলিতেছে না। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক স্বর্গীয় জগবন্ধু বাবুর কিংবা শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবু কিংবা শ্রীযুক্ত সারদা বাবু—ইহাঁদিগের মধ্যে কে, আমাদিগের ঠিক স্মরণ নাই, বিদ্যাপতির "ঋতুপতি রাতি রসিকবর রাজ।" ইত্যাদি সানুপ্রাস পদের—

"রটতি রবাব মহতী কপিনাশ।
রাধারমণ করু মুরলী বিলাস ॥"

পংক্তি-দ্বয়ের টীকা করিতে যাইয়া 'মহতী' ও 'কপিনাশ' পৃথক্ শব্দ স্থির করিয়া 'কপিনাশ' শব্দের অর্থ 'এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র' লিখায়, স্বর্গীয় কাব্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার বিদ্যাপতির সংস্করণে বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছেন,—"কপিনাশ নামে কোন বাদ্যযন্ত্র আছে, ইহা কেবল আধুনিক কোন প্রভুর টীকাতেই দেখিলাম। অন্য কোথাও শুনি নাই!" কাব্যবিশারদ মহাশয়ের এই উক্তির কেহ প্রতিবাদ করিয়াছেন কি না, জানি না; বিদ্যাপতির পরবর্ত্তী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু কাব্যবিশারদ মহাশয়ের বহু পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতির সুমীমাংসা করিয়াছেন, কিন্তু তিনিও নিঃসন্দেহে কাব্যবিশারদ মহাশয়ের ধৃত—"রটতি রবাব মহতীক পিনাশ" পাঠ এবং তাঁহার প্রতিপাদিত 'মহতীক', 'পিনাশ' বা 'পিনাক' শব্দের বাদ্যযন্ত্র অর্থই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; তবে 'মহতীক' পাঠে ছন্দোভঙ্গ অনিবার্য্য বলিয়া তিনি 'মহতীক' স্থলে 'মহতিক' পাঠ গ্রহণ করিয়া 'মহতিক'—'মহতী (নারদ-বীণা) বৃহৎ বীণা' অর্থ লিখিয়াছেন। কাব্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার উক্তির পোষকতায় জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে ছন্দোভঙ্গ-দোষ-দুষ্ট "বীণ রবাব মুরজ পিনাস" ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'বীণ রবাব মুরজ পিনাস" পংক্তিতে যে একমাত্রাত্মক একটি অক্ষরের অভাব অনুভূত হয়, উহা ছন্দোবিৎ পাঠকবর্গকে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না; আমরা ছন্দোভঙ্গের কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখিতে পাইলাম যে, বটতলার মুদ্রিত গ্রন্থ ও উহার আদর্শ পুথি ব্যতীত আর সকল পুথিতেই 'বীণ রবাব মুরজ কপিনাস' পাঠ আছে; এই পাঠে ছন্দ বজায় থাকে এবং 'পিনাস' বলিয়া যে শব্দ নাই, 'কপিনাশ'ই প্রকৃত শব্দ, তাহাও প্রমাণিত করে; কেন না, 'মহতী' শব্দের স্থলে গায়ের জোরে 'মহতীক' পাঠ কল্পনা করিলেও 'মুরজ' এই সুপ্রচলিত শব্দের স্থলে 'মুরজক' শব্দ কল্পনা করা বাতুলের পক্ষেও অসম্ভব; সুতরাং নিরপেক্ষ সমালোচক যে 'রটতি রবাব মহতি কপিনাশ' এবং 'বীণ রবাব মুরজ কপিনাশ' শুদ্ধ পাঠ বলিয়াই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন,—ইহা বলাই বাহুল্য। 'পিনাক' বা 'পিনাস' (?) বাদ্যযন্ত্র যেরূপ অপ্রচলিত,—'কপিনাস'ও সেরূপ অপ্রচলিত বটে,—সুতরাং এরূপ বাদ্যযন্ত্রের নাম শুনি নাই—এইরূপ আপত্তি উভয় পক্ষেই সমান প্রযোজ্য। জ্ঞানদাসের পদেই 'কপিনাস' ও 'পিনাক' যন্ত্রের একত্র প্রয়োগ আছে; যথা,—

"বিণা কপিনাস পিনাক ভাল
সপ্ত স্থর বাজত তাল
এ সর-মণ্ডল মন্দিরা ডম্ফ
মেলি কতহু গায়নী।"—প-ক ত, ১২৭৮ সংখ্যক পদ।

এ স্থলে 'কপিনাস' ও 'পিনাক' যে পৃথক্ বাদ্যযন্ত্র—তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে; কোন সূক্ষ্মবুদ্ধি ব্যক্তি 'মহীতক' ও 'মুরজক' শব্দের ন্যায় যদি 'বিণাক' শব্দেও 'বীণা' বুঝেন, তাহা হইলে 'পিনাস' ও 'পিনাক' একই বাদ্যযন্ত্রের কি জন্য যে পুনরুক্তি হইয়াছে, তজ্জন্য আরও যে কত সূক্ষ্ম কল্পনার আশ্রয় লইতে হইবে, তাহা স্থূলবুদ্ধি আমাদিগের চিন্তার অগম্য। রমণী বাবুর সংস্করণে উদ্ধৃত কলিটি এইরূপ লিখিত হইয়াছে; যথা,—

"বিশাল পিনাক ভাল
সপ্ত স্থর বাজত তাল
এ সব রস-মণ্ডল
মন্দিরা ডম্বু কেলি কতহুঁ গায়নী।"—১২৬ পৃষ্ঠা।

এই পাঠে অক্ষর-বিপর্য্যাস, অক্ষর-চ্যুতি ও শব্দচ্যুতি-জনতি অর্থ ও ছন্দের অসঙ্গতি অনিবার্য্য; সুতরাং পদকল্পতরুর উদ্ধৃত পাঠই সমীচীন বটে। পদাবলী-সাহিত্যে 'পিনাক' নামক যন্ত্রেরই প্রয়োগ আছে; 'পিনাস' বা 'পিনাশ' বলিয়া কোন শব্দ নাই।

পুনশ্চ দৃষ্টান্ত যথা,—

"সখি মোর নব অনুরাগে।
পরবশ জীউ না রবে পুনভাগে॥"—১৬৪ পৃষ্ঠা।

'পরবশ জীউ না' ইত্যাদি বাক্য অর্থ-শূন্য। পদকল্পতরুর তিনখানা পুথিতে 'পরবশ জিউ না উবরে পুন ভাগে' ও একখানা পুথিতে 'উবরে' স্থলে 'উরবে' পাঠ আছে; 'উরবে' পাঠের 'উ' অক্ষরটি লিপিকর-দোষে পরিত্যক্ত হওয়াতেই 'পরবশ জীউ না রবে' ইত্যাদি পাঠ-বিভ্রাটের সৃষ্টি করিয়াছে। পুথিগুলিতে 'জীউ' পাঠই আছে, কিন্তু 'পরবশ জীউ না রবে পুনভাগে' লিখিলে ছন্দোভঙ্গ অনিবার্য্য হয় বলিয়া 'জীউ' স্থলে 'জিউ' পাঠ কল্পিত হইয়াছে। 'উবর' ধাতুর অর্থ মাননীয় শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর বাঙ্গালা শব্দ-কোষে—"উবর... ধাতু, (সং উদ্বৃত ধাতু। হিং উবর, ওং মং ওহল ধাতু) উবরি—উদ্বৃত্ত হই; প্রঃ—প্রসাদ উবরিল খায় সহস্রেক জন (চৈঃ চঃ)। (অপ্রচঃ)" লিখিত হইয়াছে। 'না উবরে' বাক্যের অর্থ 'উদ্বৃত্ত হয় না' অর্থাৎ 'বিচ্ছিন্ন না হইয়া, কণ্ঠায় কণ্ঠায় পূর্ণ হইয়া থাকে'—এইরূপ অর্থ করিলে 'পরবশ জিউ না উবরে পুনভাগে' এই দুরূহ পংক্তির অর্থ বেশ সংলগ্ন হয়। শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন যে, নব অনুরাগ হেতু কৃষ্ণ-প্রেমের বশীভূত তাঁহার প্রাণ পুণ্য-ভাগ্য হেতু (কৃষ্ণ-প্রেম হইতে) বিচ্ছিন্ন না হইয়া (উহাতেই) পরিপূর্ণ রহিয়াছে। 'আঁখে

রৈয়া আঁখে নহে সদা রহে চিতে। সে রস নিরস নহে জাগিতে ঘুমিতে॥' ইত্যাদি পরবর্ত্তী কলিগুলি দ্বারাও এইরূপ অর্থই সমর্থিত হয়।

৩য়। শব্দ-চ্যুতি-জনিত পাঠ-বিকৃতি

নানা কারণেই শব্দ-চ্যুতি ঘটিতে পারে। প্রাচীন পুথিতে একটি শব্দের পাশাপাশি স্থলে পুনরুক্তি হইলে, সেই শব্দটি বারংবার না লিখিয়া, পুনরুক্তি-জ্ঞাপক ২, ৩ প্রভৃতি অক্ষর ব্যবহৃত হইত। এরূপ স্থলে সেই সাঙ্কেতিক অঙ্ক-চিহ্নটি লিপিকর-ভ্রমে পরিত্যক্ত হইলে যে শব্দচ্যুতি-জনিত পাঠ-বিকৃতির কারণ ঘটিবে, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে। এইরূপ বিকৃতি দ্বারা ছন্দের মধ্যে একটা ফাঁক পড়িয়া যায় বলিয়া শব্দচ্যুতি সহজেই অনুমিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত যথা—

''গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক।
বয়ানে রহু আরতি অনেক॥"—৭০ পৃষ্ঠা।

এখানে যে 'বয়ান' শব্দের পূর্ব্বে বা পরে একটি শব্দ পড়িয়া গিয়াছে, তাহা পাঠ-মাত্রেই প্রতীত হয়; 'গলে গলে', 'হিয়ে হিয়ে' বাক্যগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে 'বয়ানে' স্থলেও যে 'বয়ানে বয়ানে' প্রকৃত পাঠ, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। হস্তলিখিত পুথিতেও তাহাই পাওয়া যাইতেছে। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, অক্ষর-চ্যুতির দৃষ্টান্ত অপেক্ষা শব্দ-চ্যুতির দৃষ্টান্ত খুব বিরল। জমা-খরচ-লিখক মুহুরীদিগের পক্ষে প্রযোজ্য "হাজারে বেজার নহি শতে করি ভয়। ঈশ্বর না করে যেন দশ পাঁচ হয়॥" (অর্থাৎ ঠিকে হাজারের অঙ্ক ভুল হইলে ভয় করি না—শতের অঙ্ক ভুল হইলে অল্প ভয় করি, ঈশ্বর না করুন, যেন দশক কিম্বা এককের অঙ্ক ভুল না হয়—কেন না, সেই ভুল বাহির করা কঠিন)। এই উক্তিটি নকলনবিশদিগের পক্ষেও প্রযোজ্য বটে। একটি পংক্তি পড়িয়া গেলে তাহা সহজেই ধরা যায়,—একটি শব্দ পড়িলে তাহা ধরা তদপেক্ষা অনেক কঠিন; একটি অক্ষর পড়িয়া গেলে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা নিতান্তই কঠিন কার্য্য, সুতরাং এ অবস্থায় শব্দচ্যুতি অপেক্ষা অক্ষর-চ্যুতির দৃষ্টান্ত যে অনেক বেশী পাওয়া যাইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

৪র্থ। অতিরিক্ত শব্দ-প্রয়োগ-জনিত পাঠ-বিকৃতি

অতিরিক্ত শব্দ-প্রয়োগ স্থলে প্রায়শঃই লিপিকর-প্রমাদবশতঃ একই শব্দের পুনরুক্তি দৃষ্ট হয়; ছন্দঃপতন ও অর্থের অসঙ্গতি দর্শনে সহজেই এই জাতীয় পাঠ-বিকৃতি নির্ণীত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত যথা,—

"রাধা মাধব রতি-রস কেলি।
বিদগধ নাগর নাগর বৈদগধি মেলি॥"—৭৪ পৃষ্ঠা।

বলা বাহুল্য যে, দ্বিতীয় পংক্তিতে লিপিকর-প্রমাদবশতঃ একটি 'নাগর' শব্দ পুনরুক্ত হওয়ায় ছন্দঃপতন ও অর্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে।

অতিরিক্ত শব্দ-প্রয়োগের আর একটি দৃষ্টান্ত পূর্ব্বোদ্ধৃত—

"এ সব রস মণ্ডল

মন্দিরা ডম্বু কেলি কতহুঁ পায়নী।"

পংক্তিদ্বয়ে দৃষ্ট হইবে; উহাতে 'রস' শব্দটি অতিরিক্ত লিখিত হইয়াছে; উহার 'সব' শব্দটি 'ব' ও 'র' অক্ষরের বিনিময়ের উদাহরণ বটে; শুদ্ধ পাঠ যে 'এ সর মণ্ডল' হইবে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

৫ম। পদচ্ছেদের অভাব কিংবা অপব্যবহার-জনিত পাঠ-বিকৃতি

পাঠ-বিকৃতির কারণ-সমূহের মধ্যে এই কারণটি সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র ও কৌতুক-জনক। প্রাচীন পুথিতে অনেক সময়েই পৃথক্ পৃথক্ শব্দের মধ্যেও ফাঁক দেওয়া হইত না; অনেক হিন্দী মুদ্রিত পুস্তকেও এই অদ্ভুত প্রথা দেখা যায়; এরূপ স্থলে পরবর্ত্তী লিপিকর সদিচ্ছা হেতু শব্দগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া লিখিতে যাইয়া, অনেক সময়েই যে ভ্রমবশতঃ শব্দগুলিকে মিশাইয়া ফেলিয়া, তাহা হইতে অনেক অশ্রুত-পূর্ব্ব অদ্ভুত শব্দের সৃষ্টি করিয়া বসিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? ১৩১৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় "প্রাচীন পদাবলীর পাঠ-ভেদ" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে এই জাতীয় পাঠ-বিকৃতির কয়েকটি কৌতুকাবহ উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছি। এখানে জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে সেইরূপ কয়েকটি উদাহরণ দেখাইব।

শ্রীরাধার বাল্য-লীলার একটি পদে মাতা কীর্ত্তিদা বালিকা রাধাকে বলিতেছেন,—

"বিহান হইতে　　কাহার বাটীতে

কোথা গিয়াছিলা বল।

এ ক্ষীর মোদক　　চিনীক দলক

কে তোরে আঁচরে দেল॥"—৫৯ পৃষ্ঠা।

শ্রীরাধা উত্তরে বলিতেছেন,—এক অপরিচিতা গোয়ালিনী আমাকে পথ হইতে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইয়া, নানারূপ আদর-যত্ন করিয়া—

"তবে মোর গোরা　　গাথানি মাজিয়া

নাস বেশ বনাইয়া।

হরষিত মোরে　　পাঠাইয়া দেল

এ সব আঁচরে দিয়া॥"—৬১ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'এ সব' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"চিনীর দলক ইত্যাদি।" সংস্কৃত 'দলি' শব্দ হইতে পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় প্রচলিত 'দলা' ও পশ্চিম-বাঙ্গালার 'ডেলা' শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে; এই অর্থে সংস্কৃত কিংবা ভাষা-সাহিত্যে 'দলক' শব্দের ব্যবহার নাই; কিন্তু রমণী বাবু কিংবা তাঁহার আদর্শ পুথির লিপিকর 'কদলক' (কলা) শব্দের আদ্য 'ক' অক্ষরটিকে ষষ্ঠী বিভক্তির

চিহ্ন মনে করিয়া, 'চিনী কদলক' অর্থাৎ চিনী ও কলা না বুঝিয়া "চিনীর দলক" বুঝিয়াছেন। জ্ঞানদাসের এই খাঁটি বাঙ্গালা পদটিতে কোথাও ষষ্ঠী বিভক্তি-সূচক 'ক' দেখা যায় না; তার পরে 'ডেলা' অর্থে 'দলক' শব্দই নাই; সুতরাং 'চিনি কদলক'ই যে বিশুদ্ধ পাঠ ও স্বাভাবিক বর্ণনা, তাহাতে বোধ হয়, কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

পুনশ্চ দৃষ্টান্ত যথা,—

"কানুক রীত ভীত মঝু চিতহিঁ
না জানি কি হয়ে পরিণামে।
ঐছন পিরীতিক রস নাহি হোয়ত
যৈছন কি রস মানে॥"—২০৬ পৃষ্ঠা।

এটি মানিনী শ্রীরাধার সখীর প্রতি উক্তি। রমণী বাবুর গৃহীত পাঠে চতুর্থ পংক্তির কোনই অর্থ হয় না; তিনি অর্থ করার জন্য চেষ্টাও করেন নাই। পদকল্পতরুর হস্ত-লিখিত পুথিতে উদ্ধৃত পংক্তিগুলির স্থলে নিম্নলিখিত পাঠ আছে; যথা,—

"কানুক রীত ভীত মঝু চীতহিঁ
না জানি কি হয়ে পরিণামে।
ঐছন পিরিতক বশ নাহি হোয়ত
যৈছন কীর সমানে॥"

অর্থাৎ—শ্রীকৃষ্ণের রীতি দেখিয়া আমার চিত্তে ভীতি হইতেছে; না জানি, পরিণামে কি হয়! এইরূপ (লোক) প্রেমের বশ হয় না—যেমন টিয়া পাখীর ন্যায়। কোন কোন প্রাচীন পুথিতে 'বশ' স্থলে 'বস' লিখিত হইয়াছে, সুতরাং 'ব' ও 'র' অক্ষরের গোলযোগে উহা 'রস' পঠিত হওয়া বিচিত্র নহে—কিন্তু 'যৈছন কীর সমানে' পংক্তিটির দুইটি শব্দ ভাঙ্গিয়া তিনটি করিয়া 'যৈছন কি রস মানে' বাক্যের ন্যায় একটি হেঁয়ালির সৃষ্টি করা যে নিতান্ত কৌতুকজনক, তাহা বলা বাহুল্য।

পুনশ্চ—

"জীবন যৌবন সফল করি মানসি
কানু হেন বিদগধ নাহ।
জ্ঞানদাস কহে কতিহুঁ না শুনিয়ে
পিরিতি কহই নিরবাহ॥"—২০৪ পৃষ্ঠা।

উদ্ধৃত পাঠে 'পিরিতি নির্ব্বাহ কহিতেছে' এইরূপ অদ্ভুত অর্থ ছাড়া চতুর্থ পংক্তির কোন অর্থ হয় না। প্রকৃত পাঠ,—

"জ্ঞানদাস কহে কতিহুঁ না শুনিয়ে
পিরিতিক ইহ নিরবাহ॥"

অথাৎ জ্ঞানদাস কহিতেছেন,—পিরিতির এই নির্ব্বাহ অর্থাৎ অবসান কোথাও শুনি

নাই। পদকল্পতরুর চারিখানা পুথি ও পদ-রত্নাকর পুথিতে শেষোক্ত বিশুদ্ধ পাঠই আছে; সুতরাং 'পিরিতি কহই নিরবাহ' পাঠ যে অসঙ্গত পদচ্ছেদ ও অক্ষর-বিপর্য্যাসের সম্মিলিত উদাহরণ, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না!

পূর্ব্বোদ্ধৃত 'হিমকর উগ হতে দিনকর তেজ' পংক্তিটিও এইরূপ অসঙ্গত পদচ্ছেদ ও অক্ষর-বিপর্য্যাসের উদাহরণ বটে।

আমরা বাহুল্য ভয়ে ভ্রান্ত পদচ্ছেদের আর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইব।

মানিনী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

"শুন শুন মাধব না বোলহ আর।
কি ফল আছয়ে এত পরিহার॥
পাওল তুয়া সঞে প্রেমক মূল।
খোয়লু সরবস নিরমল কুল॥
পুন কিয়ে আছয়ে তুয়া অভিলাষ।
দূরে কর কৈতব ভ্রমরতি আশ॥"—২২৪ পৃষ্ঠা।

'ভ্রমরতি আশ' যে কীদৃশ পদার্থ, তাহা রমণী বাবু লিখেন নাই, আমাদিগেরও বোধগম্য হয় নাই। পদকল্পতরুর একখানা প্রাচীন পুথিতে আমরা 'ভ্রমরতি আশ' অংশের পরিবর্ত্তে 'ভ্রমর তিয়াস' ও অন্য একখানা পুথিতে 'ভ্রম তিয়াস' পাঠ পাইয়াছি। 'ভ্রম তিয়াস' পাঠে ছন্দঃপতন দ্বারা একটি অক্ষরের চ্যুতি সহজেই অনুমিত হয়; সুতরাং 'ভ্রমর তিয়াষ' বা 'ভ্রমর তিয়াস'ই যে শব্দ, তাহা একরূপ নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। মূর্দ্ধণ্য 'ষ' যে স্থলে 'খ' লিখিত না হয়, সেরূপ স্থলে উহার পরিবর্ত্তে অনেক প্রাচীন পুথিতেই 'স' ব্যবহৃত দেখা যায়; সুতরাং 'তিয়াষ' ও 'তিয়াস' যে একই 'তৃষা' শব্দের রূপান্তর, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভ্রমরের ন্যায় তৃষ্ণা যার—এইরূপ বহুব্রীহি-সমাস দ্বারা 'ভ্রমর-তৃষ্ণ' ও তাহার অপভ্রংশ 'ভ্রমর-তিয়াষ' শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে; উহাতে অর্থও সুসঙ্গত হয়। সুতরাং আমরা 'ভ্রমরতি আশ' পাঠটিকেও ভ্রান্ত পদচ্ছেদ ও 'শ' ও 'স'-কারের গোলযোগজনিত পাঠ-বিকৃতির উদাহরণ বলিয়াই বিবেচনা করি।

৬ষ্ঠ। ভণিতার গোলযোগ-জনিত পাঠ-বিকৃতি

ভণিতা-পরিবর্ত্তনের কয়েকটি স্বাভাবিক কারণ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বোক্ত "প্রাচীন পদাবলীর পাঠ-ভেদ" শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি; অতএব এ স্থলে উহার পুনরুক্তি করা অনাবশ্যক। কেবল রচনা-দর্শনে কোন একটি পদ জ্ঞানদাসের রচিত কিংবা অন্য কোন কবির রচিত, তাহা স্থির করা বিশেষজ্ঞের পক্ষেও সহজসাধ্য নহে।

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল।

ইত্যাদি জ্ঞানদাসের সুবিখ্যাত পদে কোন কোন প্রাচীন পুথিতে চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে। পদটি যে চণ্ডীদাসের অযোগ্য নহে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে; সুতরাং এরূপ স্থলে ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত সত্য-নির্দ্ধারণের অন্য উপায় নাই। জ্ঞানদাসের আরও কয়েকটি পদের সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। আমরা রমণী বাবুর জ্ঞানদাস হইতে কয়েকটি উদাহরণ দেখাইব।

রমণী বাবুর উদ্ধৃত 'করে কর মোড়ি মিনতি করু মো সঞে' ইত্যাদি (২০৮ পৃষ্ঠার) ব্রজ-বুলি পদটি পদকল্পতরু ও পদরসসার পুথিগুলিতে ঘনশ্যামের ভণিতাযুক্ত দেখা যায়। এ স্থলেও রচনা-দর্শনে সত্য নির্দ্ধারণ সুসাধ্য নহে। রমণী বাবুর ২০৯ পৃষ্ঠার "মানিনি হাম কহিয়ে তুয়া লাগি" ইত্যাদি ব্রজ-বুলি পদটিতে পদকল্পতরু গ্রন্থে কোন ভণিতা নাই; পদ-রত্নাকর গ্রন্থে বলরামের ভণিতা আছে। রমণীবাবুর সংস্করণে জ্ঞানদাসের ভণিতাটি যে ভাবে সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে উহা যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা স্থির করিতে অধিক বিলম্ব হয় না; এই পদটির প্রথমাংশে শ্রীরাধা অকারণে শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করায় সখী তাঁহাকে নানা-রূপ প্রবোধ দিতেছেন,—ইহাই বর্ণিত হইয়াছে; পদকল্পতরুর অন্তিম কলিটি এই—

"তুহুঁ ধনি গুণবতি বুঝি করহ রীতি
পরিজন ঐছন ভাষ।
শুনইতে রাই হৃদয় ভেল গদ গদ
অনুমতি করল প্রকাশ॥"—৫২০ সংখ্যক পদ।

এখন শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত পুনর্ম্মিলনের অনুমতি আভাসে প্রকাশ করিলেন বলিয়াই যে পদ-কর্ত্তা এক নিশ্বাসে মিলন করাইয়া ছাড়িবেন, ইহা স্বাভাবিক বোধ হয় না; রমণী বাবুর জ্ঞানদাস কিন্তু তাহাই করিয়াছেন। উদ্ধৃত কলির পরেই তিনি লিখিতেছেন,—

"জ্ঞানদাস কহে সুন্দরী সুন্দর
মিলহি কুঞ্জক মাঝ।
হের নয়ন মোর সফল কর তুঁ
যুগল পরমহি সাজ॥"

এই ভণিতার ভাব কিংবা ভাষা যে জ্ঞানদাসের উপযুক্ত নহে, বিশেষজ্ঞ না হইলেও তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি। পক্ষান্তরে পদরত্নাকরের ভণিতাটি কিরূপ কৌশলপূর্ণ দেখুন,—

"তুহুঁ ধনি গুণবতি বুঝি করহ রীতি
ঐছন বলরাম-ভাষ।
শুনইতে রাই হৃদয় ভেল গদগদ
অনুমতি করল প্রকাশ॥"

পদকর্ত্তারা সখী-ভাবেই লীলা দর্শন ও লীলা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং সখীর

মুখের শেষ কথাটি কাড়িয়া লইয়া পদ-কর্ত্তা নিজের নাম দিয়া উহা বলায় দোষের কারণ না হইয়া সুকৌশলে কবির লীলা-তন্ময়তাই প্রকাশ করিতেছে। এই পদটির অন্য কোন রচয়িতা ঐতিহাসিক প্রমাণে স্বীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত উল্লিখিত কারণে আমরা উহা বলরাম-দাসের রচিত বলিয়াই স্বীকার করিতে বাধ্য হইব।

রমণী বাবুর উদ্ধৃত ২১১ পৃষ্ঠার "শুন শুন সুন্দরি আর কত সাধসি মান" ইত্যাদি পদটিতে পদকল্পতরু ও পদরত্নাকর পুথিগুলিতে জ্ঞানদাসের পরিবর্ত্তে গোবিন্দদাসের ভণিতা আছে। রমণী বাবুর উদ্ধৃত পাঠেও অনেক অনৈক্য দেখা যায়। রমণী বাবুর ধৃত পাঠের মূল কি, প্রকাশ নাই। সুতরাং পদকল্পতরু ও পদরত্নাকরের প্রমাণ অনুসারে এই পদটি গোবিন্দদাসের রচিত বলিয়াই অনুমান করা সঙ্গত বিবেচনা করি।

রমণী বাবুর উদ্ধৃত ২৩৪ পৃষ্ঠার "ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটীর বন" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদটিতে পদকল্পতরু ও পদরত্নাকর গ্রন্থে বিদ্যাপতির ভণিতা আছে; বিদ্যাপতির সকল সংস্করণেই উহা বিদ্যাপতির পদাবলীর অন্তর্গত করা হইয়াছে; এই পদের রচনার সহিত বিদ্যাপতির রচনার যেরূপ সাদৃশ্য দেখা যায়, জ্ঞানদাসের রচনার সহিত সেরূপ সাদৃশ্য নাই; সুতরাং ইহা বিদ্যাপতির পদ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

৭ম। একাধিক কারণে পাঠ-বিকৃতি

একই স্থলে একাধিক কারণ কার্য্যকর হইয়া কিরূপে পাঠ-বিকৃতির জটিলতা সম্পাদন করিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা পূর্ব্বোদ্ধৃত—"এ সব রস-মণ্ডল", "পরবশ জীউ না রবে", "হিমকর উগ হতে", "পিরিতি কহই নিরবাহ", "যৈছন কি রস মানে" পাঠ-বিকৃতির উদাহরণগুলিতেই প্রাপ্ত হইয়াছি,—এ স্থলে উহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

যেখানে প্রকৃত পক্ষে কোন পাঠ-বিকৃতি নাই, কিন্তু টীকাকারের ভ্রমবশতঃ অর্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে, উহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখাইলেই আমাদিগের বক্তব্য শেষ হইবে। রমণী বাবু জ্ঞানদাসের দুরূহ বাক্যাবলীর প্রায়শঃই টীকা করেন নাই; কিন্তু স্থানে স্থানে কতিপয় দুরূহ শব্দের অর্থ দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সংস্করণে এইরূপ অসদ্ব্যাখ্যার দৃষ্টান্ত বড় বেশী পাওয়া যায় নাই; পাঠ-বিকৃতি-জনিত অর্থের অসঙ্গতির বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে; সুতরাং এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করা হইল না।

(১) জ্ঞানদাসের ৭ পৃষ্ঠায় লিখিত "কহইতে সো ধনী বচন না শুন।" ইত্যাদি বয়ঃ-সন্ধি-বর্ণনার পদের—

"কুবলয় কর চীর চিকুর চিয়াব।
কিয়ে পরকিত কিয়ে ভাব বুঝাব॥"

এই দুর্ব্বোধ্য পংক্তিদ্বয়ের অর্থ নির্ণয়ের জন্য কোন প্রয়াস না পাইয়া, রমণী বাবু কেবল 'চিয়াব' শব্দের অর্থ 'বিন্যাস' লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। 'চিয়াব' শব্দের এরূপ অর্থ তিনি

কিরূপে পাইলেন, বুঝা যায় না। পূর্ব্বে 'চিকুর' আছে বলিয়াই কি 'চিয়াব' শব্দের অর্থ 'বিন্যাস' বলিতে হইবে ? আমরা পদাবলি-সাহিত্যে কেবল জাগরণার্থক 'চি' ধাতুর পদ পাইয়াছি ; যথা,—

"কহে বসু রামানন্দে আনন্দে আছিনু নিন্দে
কেন বিধি চিয়াইল তায়।"—প-ক-ত, ১৪৫ পদ।

'চিয়াইল' অর্থাৎ 'জাগাইল'। পুনশ্চ -

"বলরাম তুমি নাকি আমার পরাণ লৈয়া বনে যাইছ।
যারে চিয়াইয়া দুগ্ধ পিয়াইতে নারি
তারে তুমি গোঠেরে সাজাইছ॥"—প-ক-ত, ১১৭৭ পদ।

'চিয়াইয়া' অর্থাৎ 'জাগাইয়া'। 'চিয়াব' এই 'চি' ধাতুর তিঙন্ত পদ হইলে উহার অর্থ 'জাগাইব' হইবে। আর যদি মৈথিল ব্যাকরণানুসারে করা, দেখা ইত্যাদি অর্থে 'করব', 'দেখব' ইত্যাদি বিশেষ্য পদের ন্যায় 'জাগা' অর্থে 'চিয়াব' বিশেষ্য পদ সিদ্ধ হইয়াছে মনে করা যায়, তাহা হইলে 'চিয়াব' শব্দের অর্থ 'জাগরণ' (awakening) হইবে ; কিন্তু বলা আবশ্যক যে, মৈথিল ব্যাকরণানুযায়ী 'করব', 'দেখব' ইত্যাদি বিশেষ্য পদের ব্যবহার আমরা বঙ্গীয় পদাবলি-সাহিত্যে কোথায়ও পাই নাই। বস্তুতঃ ইহার কোন অর্থই এখানে সংলগ্ন হয় না। বিশেষজ্ঞগণ 'চিয়াব' শব্দের এবং উদ্ধৃত পংক্তিদ্বয়ের কোন সদর্থের উদ্ভাবন করিতে পারিলে, জ্ঞানদাসের একটি হেঁয়ালীর মীমাংসা হইতে পারিবে।

(২) "কটি পীত বসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুলকলঙ্কের কোড়া॥"—৯ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'কোড়া' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'মূল'। মূল অর্থে 'কোড়া' শব্দের প্রয়োগ আমরা প্রাপ্ত হই নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর বাঙ্গালা শব্দকোষে 'কোড়া' বা 'কোঁড়া' শব্দ নাই,—'কোঁড়' ও 'কুঁড়ী' শব্দ আছে। তিনি 'কোঁড়' শব্দের অর্থ—"শাখার অগ্র" ও 'কুঁড়ী' শব্দের অর্থ 'পুষ্পের মুকুল' লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ আমরা পদকল্পতরুর পুথিগুলিতে 'কোড়া' শব্দের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র 'কোঁড়া' পাঠই পাইয়াছি। যথা,—

"কি খেনে দেখিনুঁ গোরা নবীন কামের কোঁড়া
সেই হৈতে রৈতে নারি ঘরে।"—প-ক-ত, ১১৭ পদ।

'কুল-কলঙ্কের কোঁড়া' ও 'কামের কোঁড়া' উভয় স্থলেই 'কুট্মল' বা 'কুঁড়ী' অর্থই ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ ও সুসঙ্গত। 'বিধাতা শ্রীকৃষ্ণকে কুল-কলঙ্কের কুঁড়ীরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন' এবং 'গোরা নব-জাত কামের কুঁড়ী স্বরূপ' বলায় কুল-কলঙ্ক ও কন্দর্প যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের রূপে যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে ; ইহার পরে যখন উহা ফুল ও ফলরূপে বিকসিত ও পরিণত হইবে, তখন না জানি কি হইবে !—'কোঁড়া' শব্দের ধ্বনি দ্বারা ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে।

(৩) "সর্ব্ব অঙ্গ ভূষিত গো-ক্ষুরের ধূলা।
উরু পর ঢুলিছে বনফুলমালা ॥"—৪২ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'উরু' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন 'বক্ষঃস্থল'। জ্ঞানদাসের ষোড়শ গোপালের রূপ-বর্ণনায় আরও দুই স্থলে 'উরু' বা 'উর' শব্দের প্রয়োগ আছে ; যথা,—

"উরু পর দোলে দোলা তুলসীর দাম।
ভুবনমোহন রূপ অতি অনুপাম ॥"—৪৫ পৃষ্ঠা।
"উর পরে দোলে কিবা নব গুঞ্জা-মাল।
কণ্ঠতটে হার চারু মুকুতা প্রবাল ॥"—৪৫ পৃষ্ঠা।

বস্তুতঃ এখানে 'উর' কিংবা 'উরু'—যাহাই প্রকৃত পাঠ হউক না কেন, 'উরু' শব্দের এরূপ সৃষ্টিছাড়া অর্থ করার কোনই কারণ দেখা যায় না। বনফুল-মালা কণ্ঠে ধারণ করিলেও তাহা উরু পর্য্যন্ত দোদুল্যমান হওয়া অস্বাভাবিক নহে ; আমরা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-বেশের যে চিত্র সচরাচর দেখিতে পাই, তাহাতে তাঁহার বন-মালা জানু-বিলম্বীই দৃষ্ট হয় ; সুতরাং 'উরু পর ঢুলিছে বন-ফুল-মালা' বলিলে, কোনরূপেই উহা অসঙ্গত হয় না। তথাপি পাঠের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করিলে উদ্ধৃত শ্লোকত্রয়ের মধ্যে দ্বিতীয় উদাহরণে 'উর' এবং প্রথম ও তৃতীয় উদাহরণে 'উরু' পাঠই সঙ্গত বিবেচনা হয়। জ্ঞানদাসের ন্যায় ভক্ত পদ-কর্ত্তা যে তুলসীর মাল্য সুবল-নামক গোপালের নিম্ন-অঙ্গ উরুতে স্পর্শ করাইতে সম্মত হইবেন,—এরূপ বিশ্বাস হয় না ; পক্ষান্তরে বহুমূল্য মুক্তা ও প্রবালের হার কণ্ঠ-তট ছাড়িয়া বড় নিম্নে যাইতে দেখা যায় না—সুতরাং উহার সহিত বৈষম্য (contrast) দেখাইবার জন্য বন-মালার ন্যায় সুলভ্য গুঞ্জাহারকে উরুবিলম্বিরূপে বর্ণিত করাই স্বাভাবিক ও সমীচীন বোধ হয়।

(৪) "মলয়জ পবন সহিতে ভেল মিত।
নিরখি নিশাকর যুবজন হিত ॥"—১১১ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'মিত' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন 'অনুমিত'। এটি বসন্ত-বর্ণনার পদ ; 'পরিমিত' ব্যতীত 'অনুমিত' অর্থে 'মিত' শব্দের প্রয়োগ ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ নহে এবং সংস্কৃত, কি ভাষা-সাহিত্যেও তাদৃশ প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। এখানে 'মিত' শব্দের অর্থ 'মিত্রতা' ; অর্থাৎ চন্দ্রকে যুবজনের হিতকারী দেখিয়া, (সেই দৃষ্টান্তে যুবজনের হিত আচরণ করার জন্য) মলয়জ পবনের সহিত বসন্তের মিত্রতা হইল অর্থাৎ মলয়-পবনের সাহায্যে বসন্তও চন্দ্রের ন্যায় যুবজনের হিত আচরণে প্রবৃত্ত হইল।

(৫) "বিগলিত অরুণ বসন দুহুঁ গায়।
শ্রম-জল বিন্দু বিন্দু শোভে তায় ॥
হেম মরকতে জনু জড়িত পণ্ডার।
তাহে বেঢ়ল গজমোতিম হার ॥"—১১৬ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'পণ্ডার' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন 'প্রণালী'। 'পণ্ডার' শব্দের 'প্রণালী' অর্থ

আছে, তর্ক-স্থলে ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও এ স্থলে যে তদ্দ্বারা কোন সদর্থ হয় না, তাহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে। বস্তুতঃ এখানে 'পঙার' শব্দের সর্ব্ব-বাদি-সম্মত প্রসিদ্ধ 'প্রবাল' অর্থ ধরিলেই সুন্দর সংলগ্ন হয়। অর্থাৎ আবীরের অরুণ-বর্ণে রঞ্জিত শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে শ্রম-জল-বিন্দুগুলি আলোহিত প্রবালের ন্যায় লক্ষিত হওয়ায়, স্বর্ণ ও মরকতের সহিত যেন প্রবাল জড়িত রহিয়াছে, এরূপ বোধ হইতেছে। 'পঙার' শব্দের 'প্রণালী' অর্থ কল্পনা করিলে এ স্থলে উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়।

(৬) "কি যশ অপযশ না ভায় গৃহ-বাস
হইলোঁ কুলের খাঁখার।"—১৬৭ পৃষ্ঠা।

রমনী বাবু "খাঁখার' স্থলে 'অঙ্গার' গীতাচিন্তামণি এবং লীলাসমুদ্র।" এইরূপ লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন; 'খাঁখার' শব্দের অর্থ-নিরূপণের জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু বাঙ্গালা-শব্দ-কোষে 'খাকার' শব্দের উৎপত্তি ফারসী 'খাক' শব্দ হইতে স্থির করিয়া উহার অর্থ 'অঙ্গার, পাংশু' লিখিয়াছেন এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কুলের খাকার' বাক্যটিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্বর্গীয় জগবন্ধু বাবু তাঁহার "গৌর-পদ-তরঙ্গিণী" গ্রন্থের তৃতীয় পরিশিষ্টে 'খাঁকারি' শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন যে, 'হাঁকারি ও খাঁকারি দুইটি শব্দ প্রায় তুল্যার্থক। হাঁকারি (হুঙ্কার) করিয়া অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে, খাঁকারিও তাই। গলার উচ্চ শব্দ করাকে রাঢ়দেশে "গলা খাঁকারা" বলে; থু-থু, কাস প্রভৃতি পরিত্যাগের সময় গলায় যে শব্দ হয়, তাহাকেও বলে। তুলসীদাস হরিনাম-মাহাত্ম্যপ্রকাশে বলিয়াছেন,—

"হ"কার কহরিতে খাঁকার সমেত অন্তর মল বাহিরায়।
'রি'কার কহরিতে কবাট পড়ে সকল অনথ হোই যায়॥"

তিনি ইহাও লিখিয়াছেন,—"শ্রীহট্ট অঞ্চলে খাঁকারি শব্দে লজ্জা বুঝায়।" বস্তুতঃ 'খাঁখার' শব্দের উৎপত্তি আজ পর্য্যন্তও সন্দিগ্ধ বটে। 'খাঁখার', 'খাঁকার' বা 'খাকার' শব্দের উৎপত্তি যে শব্দ হইতেই হউক না কেন, 'খাঁখার' ও 'খাঁখারি' শব্দ দুইটি যে ভাবে পদাবলি-সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে উহাদিগের অর্থ 'অঙ্গার' না হইয়া 'লজ্জা' কিংবা 'কলঙ্ক' অর্থই অধিক সংলগ্ন হয়। যেমন—

"কেমন কানাই সেই কেমন মুরতি সই
কেমন বা তাহার বেভার।
রাধার বন্ধুয়া বলি সব লোক ডাকে তারে
সেই মোর কুলের খাঁখার॥"—প-ক-ত, ৯০৬ সংখ্যক পদ।

এ স্থলে যে 'কলঙ্ক' অর্থ ছাড়া অন্য কোন অর্থই সংলগ্ন হয় না, তাহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে। এই অর্থ 'হইলোঁ কুলের খাঁখার' ইত্যাদি স্থলেও অসংলগ্ন হয় না; সুতরাং এক স্থলে 'অঙ্গার' ও অন্য স্থলে 'কলঙ্ক' এইরূপ বিভিন্ন অর্থ কল্পনা না করিয়া শ্রীহট্ট অঞ্চলের প্রচলিত সর্ব্বতোভদ্র অর্থটি গ্রহণ করাই সুবিধাজনক বোধ করি।

(৭) "সৎ ঔষধ তার কদম্বের তলা।
জীয়াইতে থাকে সাধ তথা নিয়া পেলা॥"—১৯১ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'পেলা' শব্দটির অর্থ লিখিয়াছেন—'পলায়ন কর'। 'পেলা' শব্দের এরূপ অর্থ ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ কিংবা পদাবলি-সাহিত্যে প্রচলিত নহে। 'পলায়ন কর' অর্থ এখানে একেবারেই সংলগ্ন হয় না। প্রাচীন পুথিতে 'ফেল' ধাতুর 'ফেলে', 'ফেলিল', 'ফেলা' ইত্যাদি পদের পরিবর্ত্তে প্রায় সর্ব্বত্র 'পেলে', 'পেলিল', 'পেলা' ইত্যাদি রূপ দৃষ্ট হয়; আধুনিক লিপিকরগণ কিম্বা প্রাচীন পদাবলীর আধুনিক সম্পাদকগণ অনেক স্থলেই উহা সংশোধিত (?) করিয়া 'ফেলে', 'ফেলিল' ইত্যাদি আধুনিক রূপ চালাইয়াছেন। এ স্থলে যেরূপেই হউক, প্রাচীন রূপটি রহিয়া গিয়াছে বলিয়াই উহার অর্থ-সম্বন্ধে এইরূপ ভ্রম জন্মাইয়াছে। আমরা 'পেল' ধাতুর কয়েকটি প্রয়োগ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"গোরীদাস আদি করি   চন্দন পিচকা ভরি
গদাধরের অঙ্গে দেয় পেলি।"

"স্বরূপ নিজগণ সাথে   আবির লইয়া হাতে
সঘনে পেলায় গোরা গায়।"— প-ক-ত, ১৪৩৩ পদ।

"কারো অঙ্গে কেহো কেহো জল পেলি মারে।
গৌরাঙ্গ পেলিয়া জল মারে গদাধরে॥"—প-ক-ত, ১১০৮ পদ।

(৮) "তাম্বুল কর্পূর   খপুরে পুন রাখয়ে
বাসিত বারি সমীপ॥"—১৯৯ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'খপুর' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন 'ঘটে'। সংস্কৃত 'খর্পর' (অপভ্রংশ 'খাপরা') শব্দের সহিত 'খপুর' শব্দের আকার-গত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে ও 'খপুরে' শব্দের পরে 'রাখয়ে' ক্রিয়া-পদ থাকায় খাপরার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে কর্পূর তাম্বুল রাখা যাইতে পারে,—বোধ হয়, উভয়বিধ কারণেই রমণী বাবু ঐরূপ অর্থ লিখিয়াছেন; কিন্তু 'খপুর' শব্দের অর্থ তাহা নহে। সংস্কৃত 'খপুর' শব্দের অর্থ 'গুবাক' অর্থাৎ 'সুপারি'। এই গুবাক অর্থেই ইহা পদাবলি-সাহিত্যে বহু স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। পদামৃতসমুদ্রের সঙ্কলয়িতা, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও পদ-কর্ত্তা রাধামোহন ঠাকুর গোবিন্দদাসের—

"সাজল কুসুম-   সেজ পুন সাজই
জারই জারল বাতি।
বাসিত খপুর   কপুরে পুন বাসই
তৈ গেল মদন-ভরাঁতি॥"

শ্লোকটির 'খপুর' শব্দের টীকায় লিখিয়াছেন—"খপুরো গুবাকঃ, "গুবাকঃ খপুর" ইত্যমরশাসনাৎ।" সুতরাং 'খপুরে' শব্দের অন্ত্য 'এ'কার অধিকরণ-কারকের বিভক্তি

নহে—ইহা কর্ম্মকারকের বিভক্তি। শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোন অজ্ঞাত শব্দের অর্থ করিতে গেলে যে সময়ে সময়ে কিরূপ বিড়ম্বিত হইতে হয়, ইহা তাহার একটি সুন্দর উদাহরণ বটে।

(৯) "ঐছন পুরুখ কতিহুঁ নাহি দেখি।
আপন দিব তোহে হরি না উপেখি॥—২১২ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'আপন দিব তোহে' ইত্যাদি পংক্তির অর্থ লিখিয়াছেন,—"তোমার দিব্য, তুমি হরিকে উপেক্ষা করিও না"। বৈষ্ণব-কবির পদাবলীতে আছে,—সুচতুরা শ্রীরাধা নিজের সতীত্ব সম্বন্ধে ননদীর নিকট দিব্য করিতে হইলে 'ননদীর মাথা খাই' বলিয়া দিব করিতেন। সেইরূপ এ স্থলে বক্ত্রী শ্রীরাধার সপত্নী হইলে, শ্রীরাধার দিব্য করিলে অসঙ্গত হইত না; কিন্তু বক্ত্রী শ্রীরাধার সপত্নী না হইয়া প্রিয়-সখী হওয়ায় কথাটা কিছু অস্বাভাবিক হইতেছে। তার পর 'তোহে' শব্দের অর্থ 'তোমাকে' কিম্বা 'তোমার নিকটে' না করিয়া কোনমতেই 'তুমি' করা যায় না—সুতরাং 'আপন দিব তোহে' বাক্যের অর্থ হয় যে,—"তোমাকে নিজের দিব্য দিতেছি, হরিকে উপেক্ষা করিও না।" 'নিজের দিব্য' বলিলে দিব্যকারিণী সখীর দিব্য না বুঝাইয়া উহা শ্রীরাধার দিব্য বুঝাইতে পারে না; সুতরাং সরল অর্থ হইল যে, সখী বলিতেছেন,—"আমার দিব্য, তুমি হরিকে উপেক্ষা করিও না।"

আর একটি দৃষ্টান্ত দিলেই আজিকার বক্তব্য শেষ হইবে।

(১০) "চান্দে চান্দে কমলে কমলে এক মেলি।
চকোর ভ্রমরে এক ঠাঞি করে কেলি॥
শিখিকোরে ভুজগিনী নাহি দুঃখ শোক।
যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক॥"—৭১ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'কোক' শব্দের অর্থ 'চক্রবাক' লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, এখানে যমুনা-জল ও চক্রবাক শব্দে কাহাকে বুঝাইতেছে, তিনি সে সম্বন্ধে কোন বাক্য-ব্যয় করেন নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু তাঁহার বাঙ্গালা-শব্দ-কোষে 'কোক' শব্দের অর্থ 'বন্য কুক্কুর; নেকড়া বাঘ' লিখিয়া উহার প্রয়োগ-স্থলস্বরূপ জ্ঞানদাসের "যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক॥" পংক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা বাল্যকালে অশিক্ষিত লোকের রচিত গ্রাম্য কৃষ্ণ-যাত্রার বিদ্রূপাত্মক একটি শ্লোক শুনিয়াছিলাম,—

"কালীদহ সায়রে কৃষ্ণ দিলেন সাঁতার।
কেউ বলে কালিয়া কুত্তা কেউ বলে দাঁতাল॥"

পূর্ব্ববঙ্গে বৃহৎ দন্তযুক্ত শূকরকে গ্রাম্য ভাষায় 'দাঁতাল' বলে। বস্তুতঃ বিদ্রূপ (parody) ব্যতীত যে 'বন্য কুক্কুর' বা 'নেকড়া' বাঘের মত অর্থ এখানে আসিতে পারে, ইহা মনে করিতে

আমাদিগকে প্রথমে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। পরে বুঝা গেল, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর ন্যায় বিচক্ষণ ও সুপণ্ডিত ব্যক্তির উক্তিতে এবং বাঙ্গালা-শব্দ-কোষের ন্যায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে ঘুণাক্ষরেও বিদ্রূপের আশঙ্কা করা যাইতে পারে না; সুতরাং সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু রমণী বাবুর সংস্করণ দেখেন নাই কিংবা দেখিয়া থাকিলেও 'কোক' শব্দের প্রতিপাদ্য কি, তাহা বুঝিতে না পারায়, অর্থ-সঙ্গতির দিকে দৃষ্টি না করিয়া অপ্রণিধানবশতঃই ঐরূপ লিখিয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুকে আমরা ভাষাতত্ত্ব-বিৎ, সুপণ্ডিত, সাহিত্যসেবী বলিয়া আন্তরিক শ্রদ্ধা করি,—তাঁহার এই প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে অপ্রতিভ করা কিংবা নিজে বাহাদুরি লওয়ার ইচ্ছা আমাদিগের নাই,—উহার স্থলও ইহা নহে; কারণ, আমাদিগের বিশ্বাস, সংস্কৃত-সাহিত্যে কিম্বা পদাবলি-সহিত্যে যাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ দৃষ্টি আছে, তাঁহারা সকলেই এ স্থলে 'কোক' বা 'চক্রবাক' শব্দের প্রতিপাদ্য যে কি, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন,—শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুও হয় ত এত ক্ষণে তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, কৌতুক ভাবিয়া হাস্য করিতেছেন,—সুতরাং এই কৌতুকাবহ ভ্রম-প্রদর্শনের উদ্দেশ্য বাহাদুরী নহে,—বৈষ্ণব কবির পদাবলী কিংবা সেই জাতীয় প্রাচীন সাহিত্যের শব্দার্থ ও তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে কিরূপ অবহিত হওয়া আবশ্যক, সামান্য অপ্রণিধানে কিরূপ হাস্যজনক ভ্রমের উৎপত্তি হইতে পারে, ইহার এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অন্য দৃষ্টান্ত না পাওয়াতেই আমরা এই অপ্রীতিকর আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। ভরসা করি, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

উপসংহারে সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে সমাগত সহৃদয় সাহিত্য-সেবিগণের নিকটে আমরা সানুনয়ে নিবেদন করি, বৈষ্ণব-কবির পদাবলীর পল্লবগ্রাহি-আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা গভীর-ভাবে উহার মধ্যে নিমগ্ন হউন। সেইরূপ করিতে হইলে, সংস্কৃত-সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী ও মৈথিল-সাহিত্যেরও বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক হইবে; কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের পারদর্শিতা লইয়া বৈষ্ণব-কবির পদাবলীর ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া অনেক খ্যাত-নামা পণ্ডিতও বিড়ম্বিত হইয়াছেন। সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা না করিয়াও যাঁহারা দীর্ঘকাল যাবৎ বৈষ্ণব-কবির পদাবলীর আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা এই ক্ষেত্রে সেইরূপ বিড়ম্বিত না হইলেও প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দার্থের ব্যুৎপত্তি-গত আলোচনায় অক্ষমতারই পরিচয় দিয়া থাকেন; সুতরাং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অভিজ্ঞতা লাভ এবং হিন্দী ও মৈথিল ভাষা ও সাহিত্যে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়াই পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া একান্ত সঙ্গত। বৈষ্ণব-কবির কাব্য প্রেম, ভক্তি ও আনন্দের অনন্ত আধার; তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া শ্রদ্ধান্বিত অন্তঃকরণে গভীর-ভাবে উহাতে নিমগ্ন হইলে, উহা হইতেই আমরা মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের পুষ্টিকর প্রচুর খাদ্য প্রাপ্ত হইব;—অনশন-ক্লিষ্ট আমাদিগকে আর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতে হইবে না,—আর আমাদিগকে বিফল-মনোরথ হইয়া নিরানন্দ জীবনের দুর্ব্বহ ভার বহন করিতে হইবে না। ভগবান্ করুন, সেই দিন আবার আসুক,

রোগ-শোক-ক্লিষ্ট এই বঙ্গে আবার ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীর প্রবাহিত হইয়া, নব বসন্তের সহিত নব জীবনের সঞ্চার করুক, আবার অবিরল কোকিল-কূজিতের ন্যায় অসংখ্য কবি-কণ্ঠে সুললিত কবিতার ঝঙ্কার উঠিয়া বঙ্গের গগন-প্রান্তর প্লাবিত করুক; আবার বাঙ্গালী জয়দেব ও চণ্ডীদাসের বংশধর বলিয়া গর্ব্ব করিয়া ধন্য হউক।

রাজসাহীর সাহিত্য-সম্মিলনে এই প্রবন্ধ পাঠ করার পরে আমরা 'ভক্তি-রত্নাকর' গ্রন্থের ৫ম তরঙ্গে সঙ্গীত-দামোদরের নিম্নলিখিত শ্লোকে নানাবিধ বীণা-যন্ত্রের বর্ণনা-প্রসঙ্গে 'পিণাকী' ও 'কবিলাস' নামক বীণার উল্লেখ পাইয়াছি, যথা,—'ঔড়ম্বরী পিণাকীচ নিবন্ধঃ পুষ্কলস্তথা ॥' 'কবিলাসো মধুস্যন্দী ঘোণেত্যাদি ততং ভবেৎ ॥' 'কবিলাস' ও 'পিণাকী' শব্দের অপভ্রংশ হইতেই পদাবলি-সাহিত্যের 'কপিনাস' ও 'পিণাক' শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

জঙ্গিপুরের (মুরশিদাবাদ) গ্রাম্য শব্দ

কোন জেলার সর্ব্বত্র গ্রাম্য শব্দ একরূপ হইতে পারে না। মুরশিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার গ্রাম্য শব্দের সহিত সদর মহকুমার গ্রাম্য শব্দের বহু সাদৃশ্য আছে; কিন্তু কাঁদি মহ-কুমার গ্রাম্য শব্দের সহিত সাদৃশ্য বড় অল্প। এই মহকুমার পশ্চিমে বীরভূম ও উত্তরে মালদহ জেলা। মুরশিদাবাদ জেলার উত্তর প্রান্তে এই মহকুমা অবস্থিত। এ অঞ্চলের গ্রাম্য শব্দে হিন্দীর প্রাধান্য বেশ বুঝিতে পারা যায়।

গ্রাম্য ভাষা হইতে অধিবাসীদিগের উপনিবেশের যুগ স্পষ্ট, বোঝা যায়। এ অঞ্চলের আদিম অধিবাসী মাল, তিওর, বাগ্দি, কুড়োল, চাঁড়াল, পুঁড়ো, কৈবর্ত্ত, ডোম; পরে কিছু কিছু ব্রাহ্মণ কায়স্থও আসিয়াছিল। দ্বিতীয় যুগের অধিবাসী মুসলমান, রাজপুত, আহীর প্রভৃতি। ইহারা প্রায় বিহার হইতে আসিয়াছিল। তৃতীয় যুগের অধিবাসী ৬০।৭০ বৎসরের মধ্যে চাকরি উপলক্ষে দক্ষিণাঞ্চল হইতে আসিয়াছে।

সাধারণ ভাবে এ অঞ্চলের উচ্চারণের কতকগুলি বিশেষত্ব নিম্নে লিখিতেছি। যেখানে দক্ষিণাঞ্চলে আকার স্থানে ওকার উচ্চারিত হয়, এ অঞ্চলে সে স্থানে কতক লোক ঠিক আকার উচ্চারণ করে, অধিকাংশ লোক বক্র একার অর্থাৎ য-ফলা আকার উচ্চারণ করিবে। যেমন, জুতা—দক্ষিণে জুতো, মালদহে ও হিন্দীতে জুতা, এ অঞ্চলে জুতা ও জুত্যা (য-ফলা আকার আছে বলিয়াও দ্বিত্ব উচ্চারণ হইবে না।) দক্ষিণাঞ্চলে (অর্থাৎ দক্ষিণরাঢ়, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান) বেটা, ফেল্, দেখ্ প্রভৃতি শব্দের একার বক্রোচ্চারিত হয়, এ অঞ্চলে তদতিরিক্ত শব্দেও একার বক্র হয়; যেমন—তেল, বেল, মেলা, এ অঞ্চলে ত্যাল, ব্যাল্, ম্যালা উচ্চারিত হয়। অনর্থক চন্দ্রবিন্দু-যোগ কোথাও কোথাও হইয়া থাকে; যেমন—ঘোঁড়া, পোঁকা, সাঁপ। দক্ষিণাঞ্চলেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, কাঁচ, জোঁক, হাঁসি শুনিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এখানে র-কার ও ড়-কারের প্রভেদ বড় নাই। পাঠশালায় পড়ান হয়—"ডয়ে বিন্দু র।" অনেকেই র ও ড় উচ্চারণ করিতে পারে না, যাহা পারে, তাহা উভয়ের মাঝামাঝি। তবে ঢ়-কার উচ্চারণে এ অঞ্চলের লোক বেশ দক্ষতা দেখায়। সংস্কৃত "বৃদ্ধ" হইতে প্রাকৃত বুড্ঢ। ইহা হইতে গ্রাম্য বুঢ়া, এ দেশে বুঢ়্যা। দক্ষিণাঞ্চলে গ্রাম্য শব্দে পদের আদিস্থিত হকার বা বর্গের হ-জাত ২য় ও ৪র্থ বর্ণ ঠিক উচ্চারিত হয়, কিন্তু এরূপ বর্ণ পদের অন্ত স্থানে থাকিলে দক্ষিণাঞ্চলবাসী ঠিক উচ্চারণ করিতে পারে না, বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্ণস্থানে যথাক্রমে ১ম ও ৩য় বর্ণ উচ্চারণ করিয়া ফেলে। পূর্ব্ববঙ্গে আদিস্থিত ২য় ও ৪র্থ বর্ণও যথাযথ উচ্চারিত হয় না। হিন্দিতে যেমন, এ অঞ্চলেও তেমনি সমস্ত বর্ণই পূর্ণ উচ্চারিত হয়। হিন্দীতে মাথা, এ অঞ্চলে মাথা, দক্ষিণাঞ্চলে মাতা। হিন্দীতে রাখ্ দে, জঙ্গিপুরে রেখে দে, দক্ষিণাঞ্চলে রেকে দে। অনেকে বলেন, দক্ষিণা-

ঞ্চলবাসী এইরূপে গ্রাম্য ভাষাকে কোমল করেন। ইহা শরীর ও জিহ্বার দুর্ব্বলতা-ব্যঞ্জক বলিয়া মনে হয়।

ফির, শুন্, উঠ প্রভৃতি ধাতুর ইকার ও উকারের গুণে দক্ষিণাঞ্চলে ফের, শোন, ওঠ হয়। এ দিকে এখনও সর্ব্বত্রই যথাযথ বিনা গুণে উচ্চারিত হয়। যথা,—সে শুনে না, উঠে, ফিরে ইত্যাদি। হিন্দীতে বোল্ (ক্রিয়া) এ দেশে বুল, দক্ষিণে বল।

কতকগুলি ধাতুর অসাধারণ রূপ দৃষ্ট হয়। দক্ষিণে—আছে অথবা ছিল, এ দিকে আছে, আছিল হয়। দক্ষিণে 'যাইতেছ', 'খাইতেছ', গ্রাম্য ভাষায় যাচ্ছ, খাচ্ছ। এ দিকে যেছো, খেছো। দক্ষিণে 'হইয়া+আছে' হইতে 'হইয়াছে', 'হয়েছে' রূপ। এ দিকে হইল+আছে, হইতে হ'লছে; এইরূপ গেলছে (গিয়াছে)। দক্ষিণাঞ্চলে 'কাজটা করিও' স্থলে সংক্ষেপে 'ক'রো' হইয়াছে, এ দিকে এখনও 'করিও' আছে। নদীয়ার ন্যায় এ দিকেও মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ক্রিয়ার শেষে আকার হয়। নদীয়ায় ও এ অঞ্চলে "খাবা", "যাবা", কলিকাতা ও হুগলীতে "খাবে", "যাবে"।

সম্বোধনে হে, টে, রে প্রভৃতির প্রয়োগ হয়। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের সহিত প্রয়োগে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। দক্ষিণে 'ওহে রাম শুন্‌চো'; এ দিকে ওরূপ প্রয়োগ ভিন্ন আরও দুই প্রকারে 'হে' ব্যবহৃত হয়। 'রাম হে শুনছো ? ও রাম শুনছো হে ?' অনাদরে 'রে'র প্রয়োগ 'হে'র ন্যায় তিন প্রকারে হয়। দক্ষিণাঞ্চলে স্ত্রীলোকের সম্বোধনে অনাদরে 'ওলো', 'লো'র যেখানে প্রয়োগ হয়, এ দেশে সে স্থানে 'ওটে', 'টে'র প্রয়োগ হইয়া থাকে। এ অঞ্চলের মুসলমান এবং যে সকল জাতি এখনও মাঝে মাঝে হিন্দী বলে, তাহাদের মধ্যে সম্বোধনে অনাদরে 'রে' স্থানে 'বে' ব্যবহার হয়। যথা—'শুন্‌ছিস বে'।

'তাহাই হউক' এই অর্থে দক্ষিণে 'আচ্ছা' কথার প্রয়োগ আছে। এ দিকে 'আচ্ছা' এবং 'হোক' উভয় প্রয়োগই দেখা যায়। যথা—'যেও, আচ্ছা', কিম্বা 'যেও, হোক'।

দক্ষিণাঞ্চলে 'ইত্যাদি' অর্থে সহচর শব্দ প্রয়োগের সময় প্রায়ই একার্থের বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়; যথা,—ঘর-বাড়ী, তরি-তরকারী, কাপড়-চোপড়; কিন্তু এ অঞ্চলে দ্বিতীয় শব্দটি 'ট' দিয়া আরম্ভ হইয়া থাকে, যেমন—ঘর-টর, তরকারী-টরকারী, কাপড়-টাপড়।

অদস্ শব্দজাত সর্ব্বনামের সম্ভ্রমের প্রয়োগে এ অঞ্চলে উনি, উনারে, উনার হয়। দক্ষিণাঞ্চলে উনি, ওঁকে, ওঁর হয়। সেইরূপ ইদম্ শব্দজাত ইনি, ইনাকে, ইনার হয়। দক্ষিণাঞ্চলে ইনি, এঁকে, এঁর হইয়া থাকে।

প্রাকৃতে যেমন আদিস্থিত র-স্থানে স্বরবর্ণ ও স্বরবর্ণস্থানে র হয়, এ অঞ্চলে প্রাকৃত জনের মধ্যে কেহ কেহ সেইরূপ প্রয়োগ করে। আমি লক্ষ্য করিয়াছি, ইহারা চেষ্টা করিলেও অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে না। যে 'রাম বাবু' স্থানে 'আম বাবু' বলে এবং 'আম' স্থানে 'রাম' বলে, সে আদিতে র উচ্চারণ নিশ্চয়ই করিতে পারে।

মুসলমানদিগের মধ্যে এ অঞ্চলে কতকগুলি এমন শব্দের প্রয়োগ আছে, যাহা হিন্দু-

দিগের মধ্যে কচিৎ দৃষ্ট হয়। যেমন ভো'র (পা), পোঁহাৎ (প্রভাত), বোর (বদর, কুল), বোরভ্যান্ (প্রাতঃকাল), হামি (আমি), সুঁই (সুঁচী), ধাগা (মোটা সূতা), পুছ কর (প্রশ্ন কর), ত্যাপ্‌পহোর (তৃতীয় প্রহর), ঘাটা (পথ), হাগারথের (আমাদিগের), শুৎ (শো, শয়ন কর)। সম্বোধনে হিন্দীর ন্যায় 'গে'র ব্যবহার আছে; যথা—হাঁগে মা, দক্ষিণে হ্যাগো মা। এ দিকের প্রাকৃত জন বলে—শুন্যাছিলাম, বহু মুসলমানে বলে—শুন্যাছিনু। আশ্চর্য্যের কথা, মুরশিদাবাদের দক্ষিণে বা বীরভূম, বর্দ্ধমানে ক্রিয়ার শেষে এই 'নু'র প্রয়োগ দেখি নাই। এমন কি, হুগলী জেলার উত্তরাংশেও এরূপ প্রয়োগ নাই। হুগলী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে এরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

এ অঞ্চলে চাঁই নামক একপ্রকার জাতি তরি-তরকারী উৎপাদন করে; ইহাদিগের স্ত্রীলোকেরা মাথায় করিয়া হাটে বাজারে তাহা বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। ইহাদিগকে সাধারণে মোল্লান (মণ্ডলানী) বলে। পুরুষের উপাধি মণ্ডল। এই জাতি ভাগলপুর জেলায় প্রচলিত হিন্দীতে কথোপকথন করিয়া থাকে।

জঙ্গিপুর মহকুমার পশ্চিম ভাগে যেখানে এঁটেল মাটি দেখা যায়, সেই স্থান হইতে রাঢ় আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থান হইতে রাঢ়ের ভাষার বিশেষত্বও আরম্ভ হইয়াছে। এ অঞ্চলের অন্য লোকে বলিবে—ঘরখানা পড়ে গেল, জঙ্গিপুরের পশ্চিম ভাগে বলিবে—ঘরখানা পড়ি গেল; আর একটু দক্ষিণ-পশ্চিমে বীরভূমে বলিবে—পড়িং গেল। বীরভূমের দক্ষিণে ও বাঁকুড়ায় 'ং' চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হইবে; যেমন—খেঁয়ে।

পূর্ব্বে এ অঞ্চলে বহু রেশম-সূত্র ও রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইত। জঙ্গিপুরে এককালে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রেশম-কুঠী ছিল। এখনও কিছু কিছু রেশমী সূতা ও কাপড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। রেশম-শিল্পের বহু পারিভাষিক শব্দের প্রচলন আছে। সঞ্চ (সঞ্চিত কোষ) কাটিয়া যে প্রজাপতি বাহির হয়, তাহাকে 'চোথ্‌রি' বলে। চোথ্‌রি ডিম পাড়িয়া মরিয়া গেলে কিয়দ্দিবস পরে ডিম হইতে 'পোলু' বাহির হয়। তখন চতুর্দ্দিকে বাখারি-বাঁধা মাটি, গোবর-লেপা দরমা বা চাটায়ে পোলু রাখা হয়। ইহাকে ডালা বলে। পোলু 'পাত' অর্থাৎ তুঁতপাতা খাইয়া বড় হইয়া পাকিলে অর্থাৎ হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিলে "চঁধার্কতে" রাখা হয়, তখন পোলু 'কোআ' (কোষ) প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে বাস করে। এই কোআ হইতে সূতা বাহির করিতে বিলম্ব হইলে কোআ কাটিয়া চোথ্‌রি বাহির হয়, তজ্জন্য "কুপী"তে (দরমা-নির্ম্মিত প্রায় ২।২॥০ হাত উচ্চ গোলাকার আধার) ভরিয়া উত্তপ্ত তন্দুরে রাখিয়া কোআর মধ্যস্থ কীট নষ্ট করা হয়। ইহার পরে যে সময়ে ইচ্ছা, উত্তপ্ত জলে ফেলিয়া এই কোআ হইতে সূতা বাহির করা হয়। এই সূতায় গরদকাপড় হয়। আর "মুহকাটা" (চোথারি বাহির হইয়া গেলে) কোআ হইতে যে মোটা সূতা বাহির হয়, তাহা হইতে মটকা কাপড় হয়। যেখানে সূতা বাহির করা হয়, তাহাকে "ঘাই" বলে, যাহাতে সূতা জড়ান হয়, তাহার নাম "ভোহোবিল"। অনেকগুলি "ঘাই"

একত্রে থাকিলে সেরূপ কারখানাকে "বানোক" বলে। যে ব্যক্তি কোআ গরম জলে ফেলিয়া সূতা বাহির করে, সে "কাটানি"। যে তোহোবিল ঘুরাইয়া সূতা জড়ায়, সে "পাকদার"। বৎসরের মধ্যে সাধারণতঃ চারি বার কোআ জন্মে। এই সময়কে "বন্দো" বলে।

নিম্নে বর্ণানুক্রমে কতকগুলি গ্রাম্য শব্দ দিলাম। atএ aর ন্যায় একারের বক্র উচ্চারণ বুঝাইতে উল্টা একার ও গ্রস্ত ইকারের জন্য বিদ্যানিধি মহাশয়ের উদ্ভাবিত শূন্য-চিহ্ন দিলে ভাল হইত। কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থা না হইলে সেরূপ ছাপা হইতে পারে না বলিয়া সে সংকল্প ত্যাগ করিলাম। কোন বর্ণে য-ফলা আকার দিলে বঙ্গদেশে দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। এই শব্দগুলিতে কোথাও দ্বিত্ব উচ্চারণ হইলে দুইটি অক্ষর দিয়াছি, নতুবা সর্ব্বত্র হিন্দীর ন্যায় একটি বর্ণের উচ্চারণ হইবে। যেখানে অকারের উচ্চারণ 'ও' হইয়াছে, সেখানে ও-কার দিয়াছি. বন্ধনীর মধ্যে দ থাকিলে বুঝিতে হইবে, শব্দটি দক্ষিণাঞ্চলে প্রচলিত আছে। প্রাং (প্রাকৃত), হিং (হিন্দী), আং (আরবী), ফাং (ফারসী), সং (সংস্কৃত) প্রভৃতি সাংকেতিক অক্ষর ব্যবহার করিয়াছি।

অ

অদের—উহাদের। অনুপাম (কলা)—মর্ত্তমান। অন্না—পুং মহিষ। অরা—উহারা। অদের, অরা, সং অদস্‌শব্দজাত। দক্ষিণাঞ্চলে ওদের, ওরা।

আ

আইটা—বড় চিংড়ী। আউস্‌—আশুধান্য। আওটান—(দুগ্ধ) গরম করা (সং আবর্ত্তন), আক—ইক্ষু, আকাল—দুর্ভিক্ষ। আকাবাকি—তাড়াতাড়ি। আকর্ষী—আঁকুসী(দ)। আক্রা—অক্রেয়। আখা—চুল্লী।

আগা'ল, আগডুহি—বাঁশের বা গাছের সর্ব্বোচ্চ অংশ।

আগল্যা—আগড়া (দ)।

আগ্‌বোল—দেব কার্য্যের জন্য আগে তুলিয়া রাখা মিষ্টান্নাদি।

আগামুখা (হিং)—আমা (দ)। আঙ্গন্যা—আঙ্গিনা। আঘুন—অগ্রহায়ণ।

আছিল—ছিল। আছিল্যা—যাহা ছিলা হয় নাই। আজাই—মাতামহ।

আজার—খালি। আজরে—খালি করে। আতোষবাজি—বর্দ্ধমান অঞ্চলে, কারখানা। বাজি (দ)।

আথ্‌লা—কুম্ভকারের মৃণ্ময় যন্ত্রবিশেষ, উহার উপর হাঁড়ী কলসীর তলদেশ রাখিয়া পিটে। অনেকে ইহাতে পোষা পায়রাকে পানীয় জল দেয়।

আদাবাদি, আনাআনি—বিবাদ, মনোবিবাদ। আনখা (হিং)—আশ্চর্য্য।

আনাজ—চৈতালী, রবিখন্দ। আদোথি—গুড়চিনির পাটালি (দ)।

আবাস্তা—দুরবস্থা। আমচুর—আমসী (দ)। আমতা, আমট—আমসত্ত্ব (দ)।

আমসোপরি—পেয়ারা। পেয়ারা হইতে আমের বিভিন্নতা বুঝাইতে আমকে "জাৎ"-আম বলে।

আঘোল—অম্ল। দক্ষিণাঞ্চলে অম্লব্যঞ্জনকে "অঘোল", বিশেষণে "টক্" বলে। এ দিকে উভয় অর্থেই "আঘোল"।

আরি—ছোট করাত। আঢ়ি—বেত্রনির্ম্মিত ক্ষুদ্র আধার। আড়ি(দ), আর্শী—দর্পণ।

আলকাপ, কাপ, কাটাকাপ—অদ্ভুত কার্য্য বা যে লোক অদ্ভুত কার্য্য করে। কয়েক বৎসর হইল, এ অঞ্চলে যাত্রার দলের ন্যায় গানের দল হইয়াছে। ইহাকেও আলকাপ বলে।

আল্গিনি—সং আলগ্নী-শব্দজাত। যাহাতে বস্ত্রাদি রাখিলে মৃত্তিকায় লগ্ন হইবে না। আল্না (দং)।

আল্গা—অলগ্ন। আল্গোছে—না ছুঁইয়া। আলাহ্গা (হিং) পৃথক্।

আলোগ্লতা—এই লতার মূল মাটিতে থাকে না। অনেকে বোধ হয়, ইহাকে স্বর্ণলতা বলে।

আলো চাল—আতপ চাউল। আশোজ—অশৌচ। ওশুদ্ (দ)। আসান (হি)—কিঞ্চিৎ সুস্থ।

আঁশর্যাল—আরশোলা, তেলে পোকা। আঁটবে—ধরিবে (দ)।

আঁকুরি—ভিজান ছোলা মটর আদি। আঁছোই (পড়া)—পোকা (পড়া। আঁধার্ সা (হি)—তণ্ডুলচূর্ণজাত মিষ্টান্নবিশেষ। ইস্যারা (হি)—ইঙ্গিত।

উকুন—উৎকুণ, ইকুন (দ)। উকুন্ডা—চোর কাঁটা (দ) নামক তৃণ।

উথ্র্যা—বর্দ্ধমানাধিপতি ৺মহারাজ মহাতাপচাঁদের জনক ৺প্রাণকৃষ্ণ কপূর-প্রণীত "হরিহরমঙ্গল" পুস্তকে এ কথার প্রয়োগ দেখিয়াছি। মুড়্কী (দ)।

উচ্যা—(হিং) উচা। উচ্চ। উছোট—হোঁচোট (দ)।

উচ্ছুগ্গু—উৎসর্গ। উজ্যান—উজান, স্রোতের বিপরীত দিক্।

উজ্যার—শেষ। অসন্তোষের সহিত কথাটার প্রয়োগ হয়।

উঠ্না—মুদিখানা হইতে ধারে প্রত্যহ দ্রব্যাদি আনয়ন।

উব্ক্যার—উপকার।

উব্টন—অঙ্গরাগবিশেষ। এ অঞ্চলের ছত্রি বা রাজপুত জাতির বিবাহে শুধু হরিদ্রার পরিবর্ত্তে বর-কন্যার জন্য এই অঙ্গরাগ ব্যবহৃত হয়। ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে আছে,—"উবটন হরিদ্রা মাথায় বেহুল্যার অঙ্গে"।

উর্ব্বন—বমি। উল্যা—উলু (খড়)। উল্ক্যাপাত—অদ্ভুত লোক (অবজ্ঞায়, উপহাসে)।

উড়োল—মৎস্যবিশেষ, সর্ব্বদাই জলের উপর সন্তরণ করিয়া বেড়ায়।

উস্নো (চাল)—উষ্ণ শব্দজাত। সেদ্ধো চাল (দ)।

এ, ও

এও—মাতামহী। এল্‌পোন্—আলিপনা। এস্‌ক্যা—তণ্ডুল-চূর্ণে প্রস্তুত রুটির ন্যায় খাদ্যবিশেষ। আ'স্‌কে (দ)।

এঁঠো, জুঠ্যা—উচ্ছিষ্ট ও সোকৃরি (দ) উভয় অর্থেই প্রয়োগ হয়।

এঁঠ্যাল—এঁটেল (দ)। এঁঠ্যাত্তল—যেখানে উচ্ছিষ্ট ফেলা হয়।

ওকি—বমি। দক্ষিণাঞ্চলে বমির চেষ্টা অর্থে উকি কথার প্রয়োগ হয়।

ওখো'ল—(সং) উদূখল, (প্রাং) ওকৃখল।

ওত—আড়াল। (সং) একান্ত, (প্রাং) ওঁত।

ওর—শেষ। ওল্‌হান—গোরুর বাঁটের উপরিস্থিত উচ্চ অঙ্গ।

ওসার—(হি) বিস্তার।

ক

কচাল—তর্ক, বিবাদ। কদ্‌ব্যাল—কপিত্থ।

কর্ত্তাবাবা, কর্ত্তামা—মাতামহ, মাতামহী, পিতামহ, পিতামহী।

কল্লা—(১) ভাণ, ছল। (২) তিক্ত ফলবিশেষ, এই অর্থে "কর্ল্লা"রূপেও উচ্চারিত হয়। দক্ষিণাঞ্চলের উচ্ছে ও করলা এ দিকে পুঁটুল্যা কল্লা ও চৈঁয়া (চাঁই শব্দজাত) কল্লা।

কাকা—খুল্লতাত ও জ্যেষ্ঠতাত উভয় অর্থে। শিশু (দ) "খুড়া জ্যেঠা" অপেক্ষা "কাকা" কথা সহজে উচ্চারণ করিতে পারে। যে সকল নিকট আত্মীয়কে শিশু প্রায়ই নিকটে দেখে, তাহাদের নাম শিশুর ভাষায় একবর্ণজাত; যেমন মামা, বাবা, দাদা, দিদি ইত্যাদি।

কাগজা, কাগ্‌জী (লেবু)—(দ) কাগ্‌জী, পাতি।

কাঙ্গ্‌নী—কঙ্কণ। কাজিয়া—বিবাদ।

কা'ট—(তেলের) সরিষার তেলের পাত্রে যে ময়লা জমে।

কাঠা—(১) বেত্রনির্ম্মিত ক্ষুদ্র আধার, পূর্ব্বে কাষ্ঠের হইত। (দ) খুঁচি কুনকে। (২) জমীর মাপ ৩২০ বর্গ হাত।

কাঢ়া—(১) সং কাথ, প্রাং কাঢ়। (দ) পাচন। (২) ব্যবহার করা; যেমন—হাঁড়ি কাঢ়া, রা কাঢ়া (কথা কহা)।

কাঢ়াই—সং কটাহ, প্রাং কড়াহ। (দ) কড়াই, কড়া। ইহা লৌহ, পিত্তল, কিম্বা মৃত্তিকার হইতে পারে।

কাতারি—মৃণ্ময় ক্ষুদ্র পাত্রবিশেষ, অম্ল দই জমাইবার জন্য বেশী ব্যবহার হয়।

কাত্তি—কাটারি অপেক্ষা ক্ষুদ্র লৌহাস্ত্র।

কাস্তি—কটাহ (লৌহের)।

কান্‌টা—কানাচ (দ)। বাড়ীর পশ্চাৎ দিক্।

কানি—পুরাতন ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড।

কাদা মাছ—বা'ন মাছ (দ)।

কাবারি—বাখারি (দ)।

কাম (হি)—কর্ম্ম।

কাম্‌হাই—অনুপস্থিতি।

কাম্‌রা—ধনীর সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ (বৈঠকখানা)। ইং chamber বা camera হইতে।

কালাই—মাষ কলাই (দ)। এই "মাষ কলাই"এর "কলাই" দক্ষিণাঞ্চলে কোথাও "কড়াই" হয়। কলাই শব্দে ছোলা, মটর, মসুর প্রভৃতিকে বুঝায়। কিন্তু কালাই কথার সেরূপ প্রয়োগ নাই।

কাহানী—কাহিনী। উপকথা (দ)।

কাহিল—পীড়িত। দক্ষিণাঞ্চলে কোথাও কোথাও 'দুর্ব্বল' অর্থে প্রয়োগ আছে।

কাছট্যাল—বিবাদ।

কিপ্পোন—কৃপণ।

কিফ্যাৎ—লাভ, সুলভ।

কিয়ারি—(১) কুকুর, গরু প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর ঘা হইলে আরোগ্য জন্য মন্ত্র প্রয়োগ। মন্ত্র-প্রয়োগকর্ত্তাকে পীড়িত পশুর নিকট যাইতে হয় না। (২) পুষ্পোদ্যানের আলবাল।

কিরা্যা—শপথ। হিং কিরিআ।

কিষ্‌ব্যাণ—কৃষাণ।

কুঠি—(১) বড় কারখানা, যেমন রেশম কুঠি। (২) যেখানে তেজারতি কারবার হয়। (৩) কাঁচা মাটির তৈয়ারী শস্য রাখিবার আধার।

কুঢ়্যা—অলস। (দ) কুড়ে, কুঁড়ে।

কুঢ়োল—কুঠার।

কুষ্ঠে—কোন স্থানে, কোন ঠাঁই।

কুদা (হিং)—লাফান।

কুমঢ়্যা—(১) হিং কোঁহোরা, সং কুষ্মাণ্ড। ভত্যা (হিং ভতুয়া) ও সুজ্জুভেদে দুই প্রকার; দক্ষিণাঞ্চলে প্রথম প্রকার দেশী, ছাঁচি বা চাল কুমড়ো, ২য় প্রকার বিলিতি কুমড়ো। (২) নৌকার এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত উপরের লম্বা কাষ্ঠখণ্ড।

কুহর‍্যা—ভাপ।

কুশো'র—ইক্ষু।

• কেন্তা—কাঁস্তে (দ)।

কোআ—রেশম-কীটের কোষ।

কোঠা—খড়ের ঘরের মাটির ছাদ। কোঠায় জিনিষ-পত্র রাখা চলে।

কোত্তি—কোথায়।

কোথু—কোথাও।

কোদা—(১) তৃণজাতীয় শস্যবিশেষ। (হিং) কোদো। (২) হাম ব্যাধি।

কোদোল—সং কুদ্দাল।

কোপ্ট্যা—ছোট সন্না। দক্ষিণাঞ্চলে যে সকল কার্য্যে মাটির "খুরি" ব্যবহৃত হয়, এ দিকে সেই কার্য্যে "কপ্ট্যা"র কাজ হয়।

কোপ্রা—নদী গ্রীষ্মকালে দূরে চলিয়া গেলে যে গর্ত্তে জল সঞ্চিত থাকে।

কোপা—ছাদ পিটিবার 'পিটুনে' (দ)।

কোবিতর, কোইতর—(হিং) কবুতর। (দ) পায়রা।

কোয়্যা, কোয়া—কাক।

কোরমী—দেধানের গাছ, দেখিতে ভুট্টা বা মকাই গাছের ন্যায়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য উৎপাদিত হয়।

কোলবর—নীত-বর (দ)।

কোলগ্যা—কলিকা (ধূম পানের)। (দ) কোলকে।

কোহিন্ন্যা—কনুই (দ)। সং কফোণি, প্রাং কহোণি সম্ভব।

কঁচ্যা—(১) ছোট থলি। (২) কেঁচো (দ)।

কাঁক্যাল—কটি।

কাঁকিল্যা—সরু লম্বা আকারের মৎস্যবিশেষ।

কাঁকোই—চিরুণী। সং কঙ্কতিকা, হিং কাঙ্ঘাই।

কাঁঠাল—কাঁটাল (দ)।

কাঁথি—খোলা চালার মধ্যে রান্না-ঘর হইলে গৃহস্থেরা প্রায়ই ২।৩ দিকে ২॥০ হাত আন্দাজ উচ্চ মাটির প্রাচীর স্বহস্তে নির্ম্মাণ করে। ইহাই কাঁথি।

কাঁড়ি—কোঠা অর্থাৎ মাটির ছাদের নিম্নস্থ বাঁশ, কিম্বা কাঠের কড়ি।

কুঁজ্র্যা—খুচরা তরকারী-বিক্রেতা। ফ'রে (দ)।

কুঁড়্যা—কুটীর, (দ) কুঁড়ে। এ দিকের কুঁড়ে নৌকা বা গো-গাড়ীর ছইএর ন্যায়। দক্ষিণাঞ্চলে খড়ের ক্ষুদ্র ঘরকে কুঁড়ে বলে।

কুঁহা—কোয়াসা (দ) কুজ্ঝটিকা।

কুঁহা—কূপ। পাতকো (কলিকাতায়)।

কেঁল্যাই, কেউরী—কেল্ল্যাই (দ)।

কোঁখা—কক্ষ। সং কুক্ষা শব্দজাত।

খ

খকা—কাঠের থালা। বারকোষ (দ)।

খন্তা—মৃত্তিকা খননের শস্ত্র। ইহার ফলার সহিত কাঠের হাতল থাকে।

খরা—গ্রীষ্মকাল।

খর—খদির (সং)। প্রাং খইর।

খরচা (মাছ)—চুণো মাছ (দ)।

খাচ্‌রা—দুষ্ট। সং খচ্চর শব্দজাত।

খাজুর—খর্জ্জুর (সং)। পূর্ব্বে সাধু ভাষায় রাঢ়ে খাজুর ছিল, এখন খেজুর হইয়াছে। প্রাং খজ্জুর হইতে খাজুর হইবার কথা। আদিতে একার আসিতে পারে না।

খাট—সং খট্বা। দড়ির খাট।

খাপ্‌রা (হিং)—খোলা (দ)। যথা—খাপ্‌রার ঘর।

খাবোল—গ্রাস।

খাম্বা—সং স্তম্ভ, প্রাং খম্ভো। থাম (দ)।

খান্‌গী—বেশ্যা।

খানোখা—অনর্থক।

খ্যার—ঘর ছাইবার খড়, পশ্বাদির খাদ্যকে এ দেশে খ্যার বলে না।

খাস্‌তান—শ্রান্ত হওয়া। ফাং ভাষায় খাস্ত্‌ অর্থে আহত হওয়া।

খিটক্যাল—ময়লা।

খীর—পায়স।

খীরস্যা—ঘনাবর্ত্তিত দুগ্ধ, খীর (দ)।

খিয়্যা (হিং)—শশা।

খুর্‌য়্যা—(১) গরুর পায়ের ঘা। (২) খাট বা তক্তাপোষের পায়া।

খুরি—ধাতুর ছোট বাটি।

খুর্সি—টুল।

খেন্তাল—কলহপ্রিয়। স্ত্রীলোকের প্রতি প্রযুক্ত হয়।

খোরা—ধাতুর বড় বাটি।

খোরি (মাছ)—খয়রা মাছ (দ)।

খোরোটি—মাটির ঘরের দেয়ালে মাটির প্রলেপ দিয়া মসৃণ করা।

খোস্‌কা—ডুমুর (দ)। দক্ষিণাঞ্চলের যজ্ঞডুমুর, এ দেশে ডোমো'র।

খাঁকার (হিং)—গয়ের (দ)।

খিঁচরী (হিং)—খেচরান্ন।

খুঁট্যা—খোঁটা (দ)।

খুঁতি—ছোট থলি।

খোঁটা—নিন্দা। ভারতচন্দ্রে প্রয়োগ আছে।

গ

গঢ়্যা—সং গর্ত্ত, প্রা° গড্ড। ক্ষুদ্র জলাশয়, ডোবা (দ)।

গঢ়োন—গঠন। প্রাকৃত ভাষায় অনাদিস্থিত ঠ স্থানে ঢ হয়। দক্ষিণাঞ্চলে ঢ়-কারের উচ্চারণ নাই, সে স্থানে ড় হয়।

গন্ধভাজিল্যা—গাঁদাল পাতা (দ) (?)।

গল্‌হোই—নৌকার অগ্রভাগ।

গলাসী—গরুর গলার দড়ি।

গস্ত—দোকানের দ্রব্য লইয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রয়। বাসনের দোকানদারে এ কথা বেশী ব্যবহার করে। কলিকাতায় ছোট দোকানদারে পাইকারী মাল খরিদ করাকে গস্ত করা বলে।

গহম্—গোধূম। হিং গেহুঁ।

গহমা—বিষধর সর্পবিশেষ, খ'য়ে গোখ্‌রো (দ)।

গহান্—পথ, মুসলমানেরাই ব্যবহার করে।

গহ্ণা—গ্রহণ (চন্দ্র-সূর্য্যের)।

গা—গিয়ে, গে (দ)। ক্রিয়ার সহিত ব্যবহার করা হয়; যথা—করগা = কর গিয়ে, করগে (দ)। আসন্ন ভবিষ্যতে আদেশ বা অবজ্ঞায় ব্যবহার হয়।

গাওনা—দ্বিরাগমন, (দ) ঘর বসত।

গাছষষ্ঠী—অরণ্যষষ্ঠী।

গাজোল—বাদল।

গাঁজ্‌ল্যা—গেঁজে (দ)। মোটা সূতার থলিবিশেষ, ইহাতে টাকা পয়সা রাখিয়া কোমরে বাঁধা হয়। নিম্নশ্রেণীর লোকে ব্যবহার করে।

গাঁজিল্যা—শিয়ালকাঁটা।

গাধা পুন্ন্যা—পুনর্নবা।

গাত্‌র্‌া—পুং বিড়াল।

গায়া—ইষ্টকালয়ের গাঁথনী করিবার কর্দ্দম।

গাড়া—পোঁতা (দ)।

গাঢ়া—গর্ত্ত।

গাড়োরি—মেষপালক জাতি।

গাড়োল—বৃহৎজাতীয় মেষ।

গালা, গালান্—(দ) গুলি, গুলো, গুলিন্।

গিধ্যান্—গৃহিণী।

গিভার—অহঙ্কার।

গিধ্‌নী—গৃধিণী।

গিরস্তালী—গৃহস্থালী।

গিড়োন—গ্রহণ (চন্দ্র-সূর্য্যের)।

গুচ্চের—অনেকগুলি। সংখ্যাধিক্যে অসন্তুষ্ট হইলে প্রয়োগ হয়।

গুচ্ছি—ডাংগুলি, ভাঁটা আদি খেলিবার ক্ষুদ্র গর্ত্ত।

গুজ্যার—খেয়াঘাট, ফাং গুজারা।

গুঠি—(১) আঁঠি, (২) দাবা পাশার ঘুটি (দ)।

গুঠিং—ক্ষুদ্রাকারের গোল পাথর, ইহা রাস্তায় দেওয়া হয় ও ইহা পোড়াইলে চূণ হয়। ঘুটিং (দ)।

গুড্ডি (হি)—ঘুরি (দ)।

গুদ্দ্যা—শাঁস (দ)। ফলের মধ্যস্থ শস্ত।

গুধ্যা, গুধি—খোকা, খুকি (দ)।

গুল্ল্যা—গুল্ফ।

গুলি—ক্ষুদ্র গোলাকার পদার্থ। (১) আফিমের গুলি। এই অর্থে "মদক" (হিং) শব্দেরও ব্যবহার হয়। (২) খেলিবার গুলি, পূর্ব্বে গালার হইত, (৩) বন্দুকের গুলি। গোলা শব্দে ক্ষুদ্রার্থে ই প্রত্যয়। হিন্দিতে এখনও "গোলি" বলে।

গুড়—তিন প্রকারের গুড় ব্যবহৃত হয়। (১) চাকী—পশ্চিম হইতে আমদানী, কড়া পাক করিয়া নামাইয়া কাঠের পাত্রে ঢালা হয়। জমাট বাঁধিয়া গেলে বিক্রয় হয়। (২) ভেলি—বড়ই অপরিষ্কার, আকের পাতা ও ডাটা গুড়ে মিশ্রিত থাকে। চাকীর ন্যায় জমাট, কিন্তু আকারে ক্ষুদ্র ও গোল। (৩) সায়ো—দক্ষিণাঞ্চলের দানাদার তরল গুড়।

গুষ্টি—পিতা; পূর্ব্বপুরুষ। বংশ।

গুহ্যা—স্বপক্ষের খেলোয়াড়।

গোকুল (ফুল)—বকপুষ্প।

গোটকুন—গড়াই মাছ (দ)।

গোরো—গৌরবর্ণ।

গোলা—(১) গৃহস্থের শস্য রাখিবার স্থান। ইহা দরমা বা চাটাই দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। উপরে খড়ের ছাউনি থাকে। (২) আড়ত।

গোসা, গোঁসা—ক্রোধ। এ দেশের উপকথার রাজপুত্র "গোঁসা-ঘরে" শয়ন করিত।

গোহিল—গোশালা, গোয়াল (দ)।

গাঁধি পোকা—পেদো পোকা (দ)।

গিঁট, গিঁট্যা—গ্রন্থি।

গিঁট বন্ধন—বিবাহকালে পাত্র-পাত্রীর বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থি বন্ধন। গাঁটছড়া (দ)।

গুঁড়্যা—গবাদি পশুর খাদ্যরূপে চৈতালির শুষ্ক গাছের চূর্ণ ব্যবহৃত হয়। ভুষি (দ)।

ঘ

ঘরামু—ঘরামি (দ)।

ঘিষ্ট্যান—ঘর্ষণ।

ঘিস্‌ক্যাপ—সূত্রধরের যে অস্ত্রে কাষ্ঠের পৃষ্ঠ সমতল করা হয়।

ঘোরাচি—ঝাড়-লণ্ঠন জ্বালিবার জন্ত সিঁড়িযুক্ত কাষ্ঠের উচ্চ মঞ্চ।

ঘোর‍্যা—বোআল জাতীয় ক্ষুদ্র মৎস্তবিশেষ। ইতর লোকে খায়।

ঘোর‍্যাল—মেছো কুমীর (দ)। ঘরিআল (হিং)।

ঘোসি—ঘুঁটে (দ)।

চ

চঠোই—চড়ুই পাখী।

চাকৃতি—রুটি লুচি বেলিবার গোল কাষ্ঠখণ্ড। চাকা (দ)।

চাকিয়া—জলপান করিবার কাংস্ত পাত্রবিশেষ।

চাকু—ছুরি।

চাখা, চাখ্‌নী—আস্বাদন।

চাট—(১) পশ্বাদির পদাঘাত। (২) নেশাখোর (মাতাল, গুলিখোর) নেশা করিয়া যে আহার্য্য খায়।

চাটাই—দরমা। বাঁশ, নল ছেঁচা, তালপত্র বা খর্জ্জুরপত্রের চাটাই হয়।

চাপোর—করতল দ্বারা প্রহার।

চাব্‌কি—ঘুন্‌সি (দ)।

চাভাল—চোআল (দ)।

চাভুক—চাবুক (দ)।

চাভি—(১) জালবিশেষ। (২) তালা খুলিবার চাবি (দ)। বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া অঞ্চলে এই অর্থে চাবিকাটি, কাটি বা খাটি বলে।

চামচিক্যা—চর্ম্মচটিকা।

চালা—(১) সাধারণতঃ প্রাচীরহীন খড়ের গৃহ। ইহার এক দিকে প্রাচীর থাকিতে পারে। (২) শব্দ ; যেমন—চালা কর=শব্দ কর=ডাক।

চালি—(১) প্রতিমার চালচিত্তির (দ)। পশ্চিমাঞ্চল হইতে শালকাষ্ঠ নৌকার সহিত বাঁধিয়া ভাসাইয়া লইয়া আইসে। ইহাকে কাঠের চালি বলে।

চালোন—চালুনী (দ)।

চিখো'ল—মৎস্তবিশেষ।

চিন্‌হ্যার—পরিচয়।

চিন্‌হো—চিনিয়া লও।

চিহ্নোৎ—চিহ্ন।

চিপো—নিঙড়াও (দ)।

চিময়্যা—যাহা সহজে ভাঙ্গা যায় না। যেমন চিম্‌য়্যা কাঠ, চিম্‌য়্যা মুড়ি (দঃ মিওনো মুড়ি)।

চিম্মু—খেলিবার সময় যে প্রবঞ্চনা করে।

চিয়ান—জাগান।

চিয়ারি—বাঁশের ধারাল ত্বক্।

চিয়্যা—চিঁড়ে (দ)।

চুক্যা—অম্ল শাকবিশেষ।

চুকোই—বাসনের আকারের ছেলেদের মাটির খেলানা।

চুনকাম—কোলি ফিরান (দ)।

চুন্‌হারি—চুন প্রস্তুতকারক।

চুমুক—পিতলের ক্ষুদ্র জলপাত্র।

চোআ—তামাক মাখিবার আকের গুড়ের মাৎ।

চোকোর—গমের জাঁতা-ভাঙ্গা আটা চালিয়া লইলে যে তুষি (দ) হয়।

চোঙ্গা—এক পাব্ বাঁশের এক দিকের গাঁট কাটিয়া ফেলিলে যে পাত্র হয়। তৈলিক তৈল বিক্রয়ের সময় মাপরূপে ব্যবহার করে। অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের চোঙ্গা গোআলারা ব্যবহার করে।

চোটকি—চর্ম্মপাদুকাবিশেষ। পদতলের আকারের এক খণ্ড মোটা চামড়ায় কয়েক স্থানে চামড়ার ফিতা লাগাইলে ইহা প্রস্তুত হয়।

চোত্যালি—চৈত্র মাসের ফসল ; যেমন—ছোলা, মটর, গম ইত্যাদি।

চোপা—চেহারা। দুর্ব্বল বা পীড়িত ব্যক্তির চেহারাতেই বিশেষরূপে প্রযুক্ত হয়।

চোপোর (রাত)—চারি প্রহর অর্থাৎ সমস্ত রাত্রি।

চৌকী—(১) তক্তাপোষ (দ)। (২) পাহারার স্থান, পাহারা দেওয়া।

চ্যাওয়া—বিস্তৃত।

চ্যাঙ্‌রা—ছেলে মানুষ।

চ্যাঙ্‌রামু—ছেলে-মান্‌সি (দ)।

চ্যালা—(১) ক্ষুদ্র মাছবিশেষ। (২) জ্বালানি কাঠের লম্বা টুক্‌রা।

চ্যাল্‌হা—সন্ন্যাসীর শিষ্য।

চঁদোণী—রাঁধুনী (দ) মশলা।

চাঁঙারি—বাঁশের বেতির প্রস্তুত ঝুরি।

চাঁছি—(১) ঘন বা শুষ্কপ্রায় ক্ষীর। (২) দুধ আওটানর পরে কড়াইয়ের গায়ে যাহা লাগিয়া থাকে।

চোঁকা—ফলের ত্বক্।

ছ

ছরোৎ—খাটিবার শক্তি।

ছাৎ—ছাদ।

ছাতা—ছত্র, ছাতি (দ)। এ অঞ্চলের "ব্যাংএর ছাতা" বৰ্দ্ধমানে "ছাতু"। এই ছাতু বৰ্দ্ধমানে রাঁধিয়া খায়। বিহারেও লোকে খায়। এ অঞ্চলের লোকে ইহা খাওয়া দূরের কথা, অস্পৃশ্য জ্ঞান করে।

ছাহা—ছাওয়া (দ)। যেমন ঘর ছাহা, দড়ির খাট ছাহা।

ছাপ্পোর (খাট)—পালঙ্ক।

ছিট্যাস্ লাগা—খাল ধরা (দ)।

ছিস্তার—নষ্টা স্ত্রীলোক।

ছিপি—ছোট থালা।

ছিম্‌রি, ছিমি—শুঁটি (দ)।

ছিল্‌ক্যা—ফলাদির সরু ত্বক্।

ছুটি (সজিনার)—খাড়া (দ)। ডাঁটা (বৰ্দ্ধমানে)।

ছুআছুৎ—অপবিত্র স্থানে গমন হেতু অস্পৃশ্য।

ছুন্‌—যে ছেলেমান্‌সি করে।

ছেঞ্চ্যা—ছাঁচতলা (দ)।

ছেয়তন্—সপ্তপর্ণ (সং), ছত্তিবন্ন (প্রাং), ছাতিম (দ)।

ছোটি—প্রসূতির ষষ্ঠ দিবস। (প্রাং) ছট্‌ঠি।

ছ্যাওআ—উদূখল।

ছ্যানা—দুগ্ধের ছানা (দ)।

ছঁওকান—সাঁৎলান (দ)।

ছ্যাঁচা—সত্য।

ছিঁক—হাঁচি।

ছেঁচ্‌কি—খুন্তি (দ)।

ছেঁক্র্যা—ছায়া।

জ

জঞ্জাল—বিপদ্।

জল-কাঁথি—জলের কলসীর জন্ম উচ্চ মৃন্ময় বেদী।

জল্‌হোই—নৌকার তক্তা আঁটিবার পেরেক।

জাওন—মাটির দেওয়াল বা প্রাচীরের জন্য প্রস্তুত কর্দ্দম।

জাগ—(১) কাল রঙ্গের পায়রা। (২) গাছে ২।৪টি আম পাকিলে অবশিষ্ট কাঁচা আম পাকিবার জন্য ঘরে পাতা দিয়া ঢাকিয়া রাখা।

জাগা—স্থান। জায়গা (দ)।

জাফ্‌রি—ক্ষুদ্র চারা গাছকে পশ্বাদি হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাখারি বা কঞ্চির ঘেরা।

জামা—ছত্রি বা রাজপুত জাতির বিবাহে বরের জামা। ইহার নিম্নভাগ ঘাগ্‌রার ন্যায়, উপরিভাগ চাপ্‌কানের মত। পৌরাণিক চিত্রে রাজাদিগের গাত্রাবরণ এইরূপ দেখা যায়।

জামাল গোঠা—এক প্রকার গুল্ম, বেড়া দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণাঞ্চলে ইহাকে "ভ্যারাণ্ডা" বলে। নদীয়ায় "কচা"। এ অঞ্চলে "এরণ্ড"কে "ভ্যারাণ্ডা" বলে।

জাল মাছ—চিংড়ী।

জাংহ্‌—(জঙ্ঘা শব্দজাত) উরু।

জিআলা—জিউলী (দ)। চালার খুঁটিরূপে ব্যবহৃত হয়। এ গাছগুলি আমড়াজাতীয়। ডাল কাটিয়া লাগাইলেই গাছ হয়। সহজে মরে না বলিয়া জী(ব)আলা নাম হইয়া থাকিবে।

জিওল—শিঙ্গী মাছ।

জিজ্যা—ভগিনীপতি। কেবল ছত্রি জাতি কথাটি আহ্বানেও ব্যবহার করে। দক্ষিণাঞ্চলে ভগিনীপতিকে ডাকিবার সময় কোন সম্বন্ধবাচক শব্দের ব্যবহার হয় না। উপাধির পরে "মহাশয়" বা "মশায়" শব্দের ব্যবহার হয়। কোন বালকের ভগিনীপতিকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"উনি তোমার কে ?" দক্ষিণাঞ্চলের বালক উত্তর করিয়াছিল,—"উনি আমার মিত্তির মোশায়"।

জিতুয়া—জিতাষ্টমীব্রত।

জিদ্দি—(ফাং) জিদ্দ্‌। আবদার (দ)।

জিম্মা—কাহারও রক্ষণাধীনে রাখা।

জিল্‌পী—মিষ্টান্নবিশেষ। জিলিপি (দ)।

জুয়ায় না—করা উচিত নহে।

জো—উপায়।

জোখা—মাপ।

জোল্যা—আম আনিবার জন্য দড়ির ঝোলা।

জুঁহি—(সং) যুথী, (প্রাং) জুহী, (দ) জুঁই ফুল।

ঝ

ঝারি—গাড়ু।

ঝাম্মা—ছাঁকনা (দ)।

ঝাল—(১) ঝাল আস্বাদ। (২) ডাল্‌নার ন্যায় তরকারী।

ঝালপাত—তেজপাত।

ঝাল-ঝোপ্‌পা—যে গাছের ডাল উচ্চে নাই, তাহার ডাল হইতে লাফাইয়া একরূপ খেলা।

ঝুন্‌ক্যা—মালসার ন্যায় ক্ষুদ্র হাঁড়ি।

ঝুরি—তেলে-ভাজা গুড়ে পাক করা বেশনের মিষ্টান্ন। (বর্দ্ধমানে) সিঁড়ি।

ঝাঁপ—আগর (দ)।

ঝাঁজ্‌রি—ছিদ্রবিশিষ্ট মাটির হাঁড়ি। মুড়ি ভাজিবার সময় ব্যবহার হয়।

ঝিঁক্‌রান—নাড়া দেওয়া।

ঝুঁটি—খোঁপা (দ)।

ঝেঁট্যান—ঝাঁট দেওয়া আবর্জ্জনা।

ট

টাটি—দোকানদারের গদি বা বসিবার স্থান।

টাটি—দরমার প্রস্তুত বেড়া।

টাপ্পোর, টপ্পোর—ছোই (দ) (গাড়ী বা নৌকার)।

টিক্‌লি—(হিং) টিকুলী। টিপ ? (দ)।

টুসি—ডগা (দ)।

টোকা—ধুচুনী (দ)।

টোক্‌রা—বলদকে জাব দিবার জন্য গোগাড়ীর গাড়োয়ানেরা বড় চাঙারির ন্যায় এক প্রকার আধার ব্যবহার করে। ইহাকেই টোক্‌রা বলে। ইহাতে জল দিলেও পড়ে না।

টোস্তা—শুক্‌নো (আম)।

ট্যাংরা—মৎস্যবিশেষ।

ট্যাড়া—বক্র।

ট্যারা—যে একটু বক্রদৃষ্টিতে দেখে।

ঠ

ঠসা—বধির।

ঠাট—রঙ্গ, কৌতুক।

ঠায়্যো—দণ্ডায়মান। (হিং) ঠহর।

ঠাওরাও—থামো।

ঠিলি—পিতলের ক্ষুদ্র কলসী।

ঠুসি—আম পাড়িবার জালি।

ঠোঙা—পাতার আধার। দোনা (দ)।

ঠাঁই—স্থান।

ড

ডর—ভয়। ডরফুকুন্তা—ভীরু, ভয়-তরাসে (দ)।

ডণ্ডোবৎ—প্রণাম।

ডহরা—নৌকার খোল

ডহোর—তৃণাচ্ছাদিত বিস্তৃত রাজপথ।

ডাঠাফুতি—ডাংগুলি (দ) খেলা।

ডাহুক—ডাক (পাখী)।

ডাঙ্গা—স্থল। (দ) ড্যাঙ্গা।

ডানকুনি—স্রোতের মুখে নাতিবিস্তৃত জলধারা আটকাইয়া মৎস্য ধরিবার ফাঁদ।

ডাব্‌ঠি—তালি (দ) (বস্ত্রের)।

ডাবোর—পাথরের বড় বাটী।

ডাব্‌রি—ঐ ছোট, ক্ষুদ্রার্থে "ই" প্রয়োগ।

ডাহিন—(১) ডাইনী (দ), সং ডাকিনী। (২) দক্ষিণ (সং)। দাহিণ (প্রাং)।

ডুম্‌নি—পগারের পাশের প্রণালী।

ডিহি—(১) এক তৌজিভুক্ত বিভিন্ন গ্রাম লইয়া জমীদারির অংশ। (২) পরিত্যক্ত উচ্চ বাস্তভূমি। ভিটা (দ)।

ডিব্যা—কৌটো (দ)। (হিং) ডিবিআ।

ডেহোল—দয়েল পাখী (দ)।

ডেল্‌হারি—যাহারা দাইল প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। যখন রেল হওয়ার পূর্ব্বে পশ্চিমের মাল লইয়া নৌকা যাতায়াত করিত, তখন জঙ্গিপুরে টোল আদায় হইত বলিয়া মাঝিরা এই-খানে খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিত। সেই সময় এই ডেল্‌হারির দল ভাগলপুর অঞ্চল হইতে আসিয়া জঙ্গিপুরে উপনিবেশ স্থাপন করে।

ডেহুরী—ধনীদিগের কাছারী-বাড়ীর সদর দ্বার।

ডোরা—লাল রঙ্গীন রেশমের মোটা সুতা। এই ডোরা হাতে বাঁধা হয় বলিয়া সূর্য্যের ব্রতকে "ডোরা খোলা" ও "ডোরা বাঁধা" বলে।

ডোমোর—যজ্ঞডুমুর।

ডোল—কূপ হইতে জল তুলিবার লৌহ পাত্র।

ড্যাহোর—ক্রমশঃ, পর পর।

ড্যাঙ্গায়ো—কলহ।

ডাঁরা—গঙ্গার পার্শ্বস্থ স্বাভাবিক খাল।

ডাঁরি—ডেঙ্গো ডাঁটা (দ)।

ডাঁরঘরা—বাড়ীর ভিতরের লম্বা চালা-ঘর।

ড্যাকা—সাপের ছানা। হুগলীতে সোলুই।

ঢ

ঢাকি—বৃহদাকার ঝুরি।

ঢেরি—স্তূপ।

ঢোলাই—ঢোলের বাদ্য সহযোগে ঘোষণা। ঢ্যাঁরা (দ)।

ঢোক্—তরল দ্রব্য একেবারে যতটুকু পান করা যায়।

ঢেম্‌নী—উপপত্নী।

ঢিঁস্‌ক্যাল—ঢেঁকিশালা।

ঢুঁরা (হি)—অনুসন্ধান করা।

ঢ্যাকা—ধাক্কা।

ঢ্যাকার—উদ্গার। ঢোঁআ ঢেকুর (দ)=এ দিকে "ধয়া ঢ্যাকার"।

ত

তক্ (হি)—পর্য্যন্ত।

তক্‌রার (হি)—তর্ক। বর্দ্ধমানে "তক্‌রাজ"।

তরা—যখন গ্রীষ্মকালে নদীতে এত কম জল থাকে যে, হাঁটিয়া পার হওয়া যায়, তখন লোকে বলে,—নদীতে "তরা" পড়িয়াছে।

তহো—ভাঁজ। (সং) স্তবক।

তাই—মাটির কড়া। তিজেল (দ)।

তাক্—কোলোঙ্গা (দ)।

তাকা—দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।

তালবীচি—তাল-শাঁস (দ)।

তাহোই—ভাই বা ভগিনীর শ্বশুর।

তারাজু (হি)—দাঁড়ীপাল্লা।

তারোআল—তরবারি।

তালাই—তালপত্রের চাটাই।

তীর-বরগা (হি)—কোড়ি বরোগা (দ)।

তিষ্‌য়া—তৃষা।

তুমার, তুমাকে—তোমার, তোমাকে।

তুবরি—তুব্‌ড়ি (দ)।

তোস্‌বীর (হি)—বাঁধান ছবি।

ত্যানা—ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড।

থ

থয়লা—বস্তা।

থাও—থা (দ)। ডুব-জলে মাটি নাগাল পাইলে "থাও" পাওয়া বলে।

থুক—থুতু (দ)। এ অঞ্চলে একেবারে ফেলে, তাই "থুক্", আর দক্ষিণাঞ্চলে দুই বারে ফেলে তাই "থুথু" কি ?

থুৎনী—চিবুক।

থুব্‌র‍্যা—অব্যূঢ়।

থোকা—গুচ্ছ।

থোআ—রাখা।

দ

দঢ়ো—(সং) দৃঢ়, (প্রাং) দঢ়। দড়ো (দ)।

দরোদ (হি)—ব্যথা।

দরমাহা (হি)—বেতন।

দাই—ধাত্রী।

দর্পোণ—পিত্তলের দর্পণ। বিবাহে বর হস্তে করিয়া লইয়া যায়। ইহা নাপিতেরা রাখে। কাচ আবিষ্কারের পূর্ব্বে এইরূপ দর্পণেই লোকে মুখ দেখিত। বর মাঝে মাঝে মুখ দেখিবার জন্য সঙ্গে রাখিত। এখনকার এ দর্পণে আর মুখ দেখা যায় না। ইহা প্রথা মাত্র দাঁড়াইয়াছে।

দা, দাও—কাটারি।

দাউলী—ছোট কাটারি।

দাগ (হি)—চিহ্ন।

দাল—ডা'ল (দ)। দিক্ (হি)—বিরক্তি। দিঘল—দীর্ঘ।

দিলোই, দিল্লি—দিউলী (দ), মৃণ্ময় ক্ষুদ্র দীপ।

দিপগাছা—দে'লকো (দ)।

দিয়ার—নদীর চড়া (দ্বীপচর হইতে ?)।

দিস্তা—ঠিকানা।

দুপ্‌পহোর—দ্বিপ্রহর।

দুমুঠি—দোপাটি (ফুল)।

দুআর—দ্বার।

দুব্‌র‍্যা—দূর্ব্বা।

দোম্‌রান—দু-ভাঁজ করা।

দোর্মুন—পলা (তেলের)।

দোহিল—দয়েল (পাখী)।

দোহোর—ছখানি মোটা সুতি চাদর (এক সঙ্গে ব্যবহৃত হয়)।

দোহোরা—ছক্কেরা।

ধ

ধলো—ধবল। শাদা।

ধান্দা—কাজ কর্ম্ম।

ধুপ—ধুনো (দ)।

ধুপ্চি—ধুনোচি (দ)।

ধুম্যা—(১) ধূম। (২) ধুঁদুল (দ)।

ধুলোট—দোলের কিম্বা ২৪ প্রহরের পর দিন যে কীর্ত্তনের বা গানের দল বাহির হয়, তাহাতে আমোদ করিয়া লোকে পরস্পরের গায়ে ধূলা নিক্ষেপ করে। এইরূপে নগর প্রদক্ষিণ করার নাম ধুলোট।

ধোকোর—চটের বস্তা।

ন

নবান—নবান্ন।

নর মাদি—মদ্দা মেদি (দ)। পশু-পক্ষীর পুং স্ত্রী-ভেদে ব্যবহৃত হয়।

নয়ানজুলি—নর্দ্দমা (দ)। পয়োনালী।

নাতিপোতা—দৌহিত্র, পৌত্র। দক্ষিণাঞ্চলে উভয় অর্থেই "নাতি" শব্দের ব্যবহার হয়।

নাথ—দুষ্ট গরু কিম্বা মহিষের নাকে ছিদ্র করিয়া যে দড়ি বাঁধা হয়।

নাপা—ওজন ও মাপ করা উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হয়।

নামানি—ওলাউঠা।

নাহা—স্নান করা। (প্রাং) ণ্হান।

নাং—উপপতি।

নাড়া—মুণ্ডিত মস্তক। নিছনি—বরের বা দেবমূর্ত্তির পান দিয়া গাল সেঁকা। নিভ্যান—নির্ব্বাণ করা।

নিশান—পতাকা।

নিশানা—লক্ষ্য করা।

নিমকি—লেবুর আচার।

নিয়ান—বাটালি।

নিয়ান—শস্যক্ষেত্র হইতে আগাছা উৎপাটন।

নিযুতি—নিশীথ।

নুক্যাচুরি—লুকোচুরি, (দ) খেলা।

নেপুর (প্রাং)—নূপুর।

নেঢ়্যা—পাছা (দ)।

প

পচ্‌রা—খোস-পাচড়া (দ)।

পচ্‌কা—মাছ-মারা বরশা।

পটোল্লতি—পল্‌তা (দ)।

পঢ়ে—(সং) পঠতি, (প্রাং) পঢ়ই, (দ) পড়ে।

পদ্মচাকা—পদ্মের টাটি (দ)।

পরথ্‌—পরীক্ষা। বর্দ্ধমানে "পরফ্‌"।

পল্‌হোই—পীরামিডের ন্যায় মাছ ধরিবার যন্ত্র।

পলোয়ারি—কিনারা উঁচু থালা।

পাউলি—কাঁসার জলপাত্রবিশেষ।

পাগার—ক্ষেত্রের উচ্চ আলি।

পাঘা—গরুর দড়ি।

পা'ট—মজুর।

পাটা—শিল (দ)।

পাটি—খেজুরের চাটাই।

পাত—তুঁতপাতা।

পাতনা—মাটির ডাবা (দ)।

পাতান—ধানের আগরা (দ)।

পাতকাঠি—প্যাকাটি (দ)।

পাথ্‌রা—পাথরের থালা।

পাথ্‌রি—পাথর বাটি।

পাথাল—আড়ভাবে (দ)।

পান মিঠাই—পানের আকারের গজার ন্যায় মিষ্টান্ন।

পান্‌সী—দীর্ঘ আরোহীর নৌকা। প্রায় ১২।১৪ খানি দাঁড় থাকে।

পানিতাওয়া—পান্তুয়া (দ)।

পাব্‌তা—ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ।

পাভ্‌রা—ডালের বা বাঁশের ছোট টুক্‌রা। আমের ন্যায় ফল, নীচে হইতে পাভ্‌রা ছুঁড়িয়া পাড়া যায়।

পায়না—কৃষকের যষ্টি।

পায়জোব—পায়ের অলঙ্কার। পাঁজোর (দ)?।

পায়া—পুং মহিষ।

পায়োস—পরিবেশন।

পাল্‌হান—গরুর বাঁটের উপরিভাগ।

পাশা—(১) কর্ণের অলঙ্কার, (২) খেলা।

পাসানো (মাঁড়)—গড়ান (ফেন) (দ)।

পাহাড়—যথা—ঢেঁকিতে পাহাড় দেওয়া।

পাংখা (হি)—তালের পাখা।

পিঠ্যা—পিষ্টক (সং), পীট্‌ঠ (প্রাং)।

পিঠ্যালী—আঁস্‌সেওড়া (দ) ও কাষ্ঠে সারহীন মধ্যমাকারের বৃক্ষবিশেষকে বুঝায়।

পিদিম—প্রদীপ।

পিয়্যান—(১) পীর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। (২) জামা (দ)।

পিল্‌হোই—প্লীহা।

পিস্‌রি—৫ সের। পস্থুরি (দ)।

পিহুনি—জাঁতার নিকট মোড়ার মত বসিবার মাটির বেদী।

পিহান—মাটির কুঠির মাটির গোল ঢাকনা।

পিঁয়্যা—পীঠ (সং), পীঢ় (প্রাং), পিঁড়ি (দ)।

পিঁয়্যা—মাটির ঘরের সম্মুখের বারান্দা।

পুআল—আউশ ধান্তের শুষ্ক খড়।

পুআলি পুআলো—বেগুণ, কপি প্রভৃতির চারা গাছ।

পুট্‌কি—মলদ্বার।

পুঢ়োৎ—পুরোহিত।

পুরি (হি)—লুচি (দ)।

পুল—চারাগাছ।

পুস্ত্যা—মাটির ঘরের প্রাচীরের ভিত্তি মজবুৎ করিবার জন্য পার্শ্বে মাটি দিয়া বাঁধান হয়, ইহাই "পুস্ত্যা"।

পুস্তোক্—ঘোড়ার লাথি।

পুন্‌হা—পুণ্যাহ।

পেকোর—অশ্বত্থ।

পেক্যার—পাইকার।

পেছ্যা—ঝুরি (দ)।

পেন্‌সা—পান্‌সে (দ)। স্বাদহীন।

পেল্যা—(১) পাইলা (ক্রিয়া), (২) বড় হাঁড়ি।

পেহ্যা—গাড়ীর চাকা। (হিং) পাহিয়া।

পোক্তো—মজবুৎ, দৃঢ়।

পোখো'র—(সং) পুষ্কর, (প্রাং) পোক্‌খোর, পুকুর (দ)।

পোচ্ছিম—(সং) পশ্চিম, (প্রাং) পচ্ছিম।

পোহা—(১) শেষ হওয়া, যথা—রা'ত পোহাল। (২) তাপ গ্রহণ করা—যেমন আগুন পোহান।

পোলু—রেশম-কীট।

পঁহচি—হস্তের রৌপ্যের অলঙ্কারবিশেষ; এখন প্রায় অপ্রচলিত। পৈঁছে (দ ?)।

পাঁজর—(সং পঞ্জর শব্দজাত)। পার্শ্ব (শরীরের ও স্থানের); যেমন ঘরের পাঁজরে।

পাঁহটি—পৈঠে (দ)।

পাঁহুটা—পদচিহ্ন।

পিঁজ্‌র্যা—পিঞ্জর।

পিঁধ্‌—পরিধান কর।

পিঁধনে—পরিধানে।

পিঁপিআ—পেঁপে (দ)।

পুঁকুর্যা—পোকা লাগা।

পুঁড়্যা—কৃষিজীবী জাতিবিশেষ। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পুণ্ড্র। ইহারা এখন পুণ্ডরীক বলিয়া পরিচয় দেয়।

পুঁথোল—পুঁতুল (দ)।

পোঁটা—সিকৃনি (দ)।

পোঁদেয়ো—১৫।

প্যাট্‌রা—সে কালের বেতের বাক্স। প্যাড়া (দ)।

প্যাটারি—(হিং) পেটারি। ফানুষ (দ)।

প্যাকাম্‌—সঙ্‌ (দ)।

প্যাথ্‌না—ন্যাকামি (দ)।

প্যারাই—মুষ্কচ্ছেদন (গবাদির)।

ফ

ফাটক—কয়েদ (দ)।

ফাতা—মাছ ধরিবার ফাত্‌না (দ)।

ফানুষ—আকাশ-প্রদীপের নিমিত্ত অভ্রনির্ম্মিত আলোকাধার।

ফিরকি—একহারা। গাঁদা, দোপাটি প্রভৃতি ফুল সম্বন্ধে প্রয়োগ হয়।

ফুট্যা—ছিদ্রযুক্ত।

ফুট্যানি—অহঙ্কার।

ফেরুয়া—জলপাত্রবিশেষ।

ফোৎ—মৃত, ধ্বংসপ্রাপ্ত।

ফোতা—উড়ানী (দ)।

ফোচক্যা—ফাজিল (দ)।

ফেঁস্তার—ঘর ছাইবার ঘাসবিশেষ।

ফেঁচু—ফিঙ্গে পাখী (দ)।

ফ্যার—দাঁড়ী-পাল্লার পাষাণ (দ)।

ব

বছোর—বৎসর (সং), বচ্ছর (প্রাং)।

বজ্জাৎ (হি)—দুষ্ট।

রৎ—ব্রত।

বত্তোর—শস্তের বীজ বপনের সময়।

ব'ত্তে—বেঁচে। দক্ষিণে "বেঁচে-বত্তে"র সহচর শব্দরূপে ব্যবহার আছে, পৃথক্ ব্যবহার নাই।

বরাৎ—অদৃষ্ট।

বড়্—বট বৃক্ষ। প্রাকৃতে অনাদিস্থিত ট স্থানে ড হয়।

বড়া—ফুলুরি (দ)।

বাউলি—রন্ধনের বেড়ী (দ)।

বাগুন—বেগুন (দ)।

বাচ্চা—ছানা (দ)।

বাজু—তাবিজ (দ) অলঙ্কার।

বাট্খারা—যাহা দ্বারা ওজন হয়।

বাট্পার—জুয়াচোর।

বাটা—তাম্বূল রাখিবার পাত্র।

বাড্ডা—বড়, অতিশয়।

বাৎসা—বাতাসা।

বাতাচিতি—চিতিসাপ।

বাত্তি—বাখারি

বাতি—প্রদীপ।

বাথান—গো-মহিষাদির থাকিবার উন্মুক্ত স্থান।

বাদাবাদি—বিবাদ।

বাদাম—(১) বুট, ছোলা। (২) ফল।

বান—বন্যা। জোয়ারের বান এ অঞ্চলে অজ্ঞাত।

বানানো—প্রস্তুত করা।

বানোক—রেশম প্রস্তুতের স্থান।

বাবু—(১) পিতা, (২) বড় লোক।

বাব্‌রি—লম্বা চুল (পুরুষের)।

বালুন—মুড়ি দুই প্রকারে ভাজে। ১ম প্রকার—গরম বালিতে চাউল দিয়া কুঁচি দিয়া মুড়ি-গুলি তুলিয়া লওয়া হয়। ২য় প্রকারে মুড়ি হইলে বালি সুদ্ধ মুড়ি ছিদ্রযুক্ত হাঁড়িতে দেওয়া হয়। এই হাঁড়িটি নাড়িলে বালি নীচে পড়িয়া যায়, মুড়ি পৃথক্ হয়। এই প্রকারে মুড়ি ভাজাকে বালুনে ভাজা বলে। ছিদ্রযুক্ত হাঁড়িটির নাম "বালুন"।

বাস্তোকি—বেতো(দ)শাক।

বাঢ়া (ক্রি)—(সং বর্দ্ধতে, প্রাং বড্‌ঢই) এ অঞ্চলে "গাছ বাঢ়ে", দক্ষিণে "বাড়ে"।

বাঢ়ুন—ঝাঁটা। পশ্চিমে ঝাঁট দেওয়াকে "বাহরনা" বলে।

বাহাল—স্থায়ী। হিন্দিতে বাহাল=নিযুক্ত।

বাহান—মাচা (দ)। লাউ, শশা প্রভৃতি গাছের আশ্রয়-মঞ্চ।

বাহনা—(১) ছল, ভান, (২) ধান ভানা (দ)।

বাংলা—বৈঠকখানা।

বিউনী—(১) বিনুনি (দ)। (২) বেণী।

বিকুলি—ব্যাকুলতা।

বিচোন—বীজ।

বিজ্‌লি—(সং) বিদ্যুৎ, (প্রাং) বিজ্জুলী।

বিজি—নকুল (প্রাণী)।

বিজোটা—বাজু (দ) অলঙ্কার।

বিটি—কন্যা।

বিয়াল—বিড়াল।

বিহা—বিবাহ।

বিহাই—বৈবাহিক। বিহান্—ঐ পত্নী।

বু'লতে—বলিতে।

বেকুব—(ফাং) বেওয়াকুফ্। অশিক্ষিত, অজ্ঞান।

বেগ্‌চ্যা—(ফাং) বাগ্‌চা। বাগান।

বেয়্যাল—বাগানের ফলের ক্রেতা।

বেলি—হিং বেলা। (দং) বেলফুল।

বেহুদ্যা—(ফাং) বেহুদা। নির্ব্বোধ।

বেশ্তা, বেস্তা—(১) বাসি, যাহা টাট্‌কা নহে, (২) ২২ সংখ্যা জ্ঞাপক; যেমন ধোবাকে ২২ খানা কাপড় দিলে ১ বেশ্তা হয়; মাটির প্রাচীর নির্ম্মাণের সময় একেবারে যতটা উচ্চ হয়, তাহাকে ১ রদা বলে, ইহা দৈর্ঘ্যে ২২ হাত হইলে ১ বেশ্তা বলে।

বো—বধূ (সং), বহু (প্রাং)।

বোক্‌রি (হিং)—ছাগল।

বোগ্‌ন্না—বাসনের দোকানদার লেখে "বহুগুণা", বহু গুণ আছে বলিয়া কি? (দ) বো'গ্‌নো।

বোগ্যা—কলা গাছের পাতার নিম্নের অংশ, যাহা গাছের উপরে থাকে। পেটো (দ)।

বোঠ্যা—হস্তচালিত ক্ষুদ্র দাঁড়। ব'ঠে (দ)।

বোঠি—বঁটি (দ)।

বোন্‌শী—বঁড়শী (দ) মাছ ধরিবার।

বোম্—বোমা (দ)।

বোর‍্যা—(১) বস্তা, (২) বরবটি কলাই, (৩) বোরো ধান।

বোর‍্যাগী—বৈষ্ণব বৈরাগী।

বোর্যা—আগুন রাখিবার জন্য কাঁচা মাটির পাত্র।

বোর্ষুন—বৃষ্টির জল।

বোল্‌ (কথা)—বল্‌ (দ), বোল্‌ (হিং)। ক্রিয়ারূপে স্থানে স্থানে বুল্‌ হয়, যেমন এ দিকে "বুল্‌ছিস, বুলবি না", দক্ষিণে "বোলছিস, বোল্‌বি না"।

বো'ল—বকুল।

বোল্লা—বোল্‌তা (দ)।

বোল্যা—(খড়যের) বোলো, বোগ্‌লো (দ)।

বোহিন—(হিং) বহিন, ভগিনী (সং), বুন, বোন (দ)।

বোহির‍্যা—(সং) বধির, (প্রাং) বহির।

বোহোনি—বোউনি (দ), দোকানদারের প্রথম বিক্রয়।

বোহোনু—ভগিনীপতি।

ব্যাওয়া—(হিং) বেওয়া, বিধবা।

ব্যাগাত্তা—মিনতি।

ব্যামো—রোগ।

ব্যায়হা—বেহায়া (ফাং), নির্লজ্জ।

ব্যাড়া—বেষ্টন।

বাঁশরা—বাঁশবন।

বাঁশী—(১) বংশী, (২) সানাই।

বাঁহিচ—(১) নৌকার বাচ (race), (২) নৌকায় বেড়ান (অল্পক্ষণের জন্ম)।

বাঁহিচ্যা—ধান ছাঁটিতে দেওয়া।

বাঁহুক—বাঁক (দ)।

বুঁদি—প্রতিমা নির্ম্মাণের প্রথমাবস্থায় খড় দিয়া একটা আকার গড়ে। ইহাকে বুঁদি বাঁধা বলে। এক গোছা খড় একত্রে বাঁধিলেই বুঁদি হয়।

বুঁদিয়া—(হিং) ক্ষুদ্র গোলাকার মিঠাই বিশেষ। সং বিন্দু, হিং বুঁদ ; ইহা হইতে বুঁদিয়া, দক্ষিণে বোঁদে।

বেঁঠ্যা—বেঁটে (দ)। খর্ব্বাকার।

বোঁড্যা—(১) বিঁড়ে (দ)। (২) দাবা খেলার বোঁড়ে।

ব্যাক্—(প্রায়ই) নদীর বক্রাংশ।

ব্যাতাবার—ঢ্যামনা (দ) সাপ।

ভ

ভ'র—সমস্ত, যেমন দিন ভ'র—সমস্ত দিন।

ভাও—দর।

ভাঁজ—ভ্রাতৃজায়া।

ভাজা—মুড়ি (চাউলের)।

ভাজি—ভাজা তরকারী।

ভাটা—ইটের পাঁজা (দ)।

ভাতখাওনী—অন্নপ্রাশন।

ভাতিজ্যা—ভ্রাতুষ্পুত্র। (ভ্রাতৃজ শব্দজাত ?)

ভাপ—বাষ্পের উত্তাপ। (প্রাং) বপ্ফ।

ভারবোল—পৌষ মাসে ইতর লোকে সন্ধ্যা বেলায় একরূপ গান গাহিয়া বেড়ায়, মাসের শেষে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা লইয়া ভোজন করে। এই গানের প্রথম পংক্তি "তোরা ভার বোল ভার বোল" ইত্যাদি।

• ভিন্নো—ভিন্ন।

ভুক্ত্যান—শোধ (হিসাবে)।

ভুনি—কাপড়ের কোঁচা।

ভুজ্যারি—একরূপ পশ্চিমের জাতি। ইহারা সর্ব্বদা বালি গরম রাখে, কেহ শস্যাদি ভাজিতে গেলে তৎক্ষণাৎ ভাজিয়া দেয়।

ভুম্‌কুরি—বুদ্বুদ।

ভেক লওয়া—বৈষ্ণব হওয়া।

ভেট্যাল—স্রোতের দিক্।

ভেস্তিয়ে—গোলমাল ক'রে (তাস খেলায়)।

ভোগা—ফাঁকি।

ভোজ—যগ্‌গি (দ)।

ভোজী—বহুজী, ভ্রাতৃজায়া। এ কথাটি হিন্দুস্থানী ঔপনিবেশিকগণ ব্যবহার করে।

ভ্যাল্‌সান—মুখ ভ্যাংচানো (দ)।

ভ্যাঁড়াপোড়া—বহ্নি উৎসব (দোলে)।

ম

মট্‌কা, মোট্‌কি—মাটির বৃহৎ জলাধার, জালা (দ)।

ময়া—মৌরুলা মাছ।

মস্তো—বৃহৎ।

মহোচ্ছব—বৈষ্ণবদিগের মহোৎসব।

মাওরা—মা-মরা, মাতৃহীন।

মাকুন্দ্যা—গুম্ফবিহীন।

মা'গ—স্ত্রী।

মাচান—মঞ্চ।

মাথা'ল, মাথোল—টোকা (দ), কৃষকের বাঁশের মস্তকাবরণ।

মাদ্দান—মাদি ঘোড়া, অশ্বী।

মারিক্‌মারা—মারামারি।

মাড়—মণ্ড (ভাতের), ফেণ (দ)।

মালকোঁচা—মল্লকচ্ছ (?), কোঁচা পশ্চাৎ দিকে গুঁজিলে "মালকোঁচা" হয়।

মালী—মালাকর।

মালোই—নারিকেলের মালা (দ)।

মাহাতাব্—রং-মশাল (দ)।

মাহোই—ভাই-ভগিনীর শাশুড়ী। সং মাতৃক (?), (প্রাং) মাউও।

মিত্যা—মিত্র। একনাম হইলে মিত্যা, নতুবা বঁধু বা বন্ধু পাতায়।

মিরক্যা—মীরগেল মাছ (দ)।

মিহোনোৎ (হি)—পরিশ্রম।

মুগ শাঁওলী—মুগের পিষ্টক।

মুচি—কাঁসা, পিতল ও সোনা গলাইবার মাটির পাত্র।

মুনোফা—(হি) লাভ।

মুরি—নর্দ্দমা।

মুঢ়্যা—কাটা গাছের গুঁড়ি (যাহা মাটির মধ্যে থাকে)

মেছ্যা আল্লাদ—কেউটে (দ)।

মেতোর—মধ্যম। যেমন—মেতোর-বৌ।

মেয়া—স্ত্রী।

মেল্‌তে—ছড়াইতে।

মোছ (হিং)—গোঁপ (দ)।

মোধুচুষ্কি—টুন্‌টুনি পাখী (দ)।

মোর (বরের)—মুকুট (সং), মউড় (প্রাং)।

মোরিচ—লঙ্কা।

মো'ল—মুকুল (সং), মউল (প্রাং)।

মোস্‌রি—মস্থরি।

মোহোজিদ্‌—মস্‌জিদ।

মোহোনা—কোন নদীর যে স্থান হইতে অন্ত নদী বহির্গত হয়।

মোহোবিল—প্রতিমা বিসর্জ্জনের সময় বিভিন্ন প্রতিমার মিলন।

মোহোরি—মৌরী।

ম্যার—কলার ভেলা।

ম্যালা—(১) মেলা, (২) বহু।

য

যও—যব।

যোগানো—রক্ষা করা, আগ্‌লানো (দ)।

যোগানদার—সাময়িক রক্ষক, আগল্‌দার (দ)।

র

রগ—শিরা।

রহোর (হি)—অড়হর।

রাম পটোল—ভিণ্ডি, ঢেঁরস (দ), রামতরোই (বিহারে), রামঝিঙে (বাঁকুড়ায়)।

রা—কথা, শব্দ।

রাল—ধুনা গলাইয়া সরিষার তৈলের সহিত মিশ্রিত আঠা।

রিক্যাবী—রেকাব (দ), রকাবী (ফাং)।

রুখু—রুক্ষ, তৈলবিহীন।

রুহি—রুই (দ)।

রোজ—প্রত্যহ, ফাং রোজ = দিন।

রোজকার—উপার্জ্জন। (ফাং) রোজগার।

র‍্যাজা—রেজা (দ), রাজমিস্ত্রীর মজুর।

ল

লগ্‌বা—লোগি (দ), দীর্ঘ বংশখণ্ডের অগ্রে এক টুক্‌রা বাখারি বাঁধিয়া প্রস্তুত হয়। ছোট হইলে আকর্ষী।

লগোন ধরা—বিবাহে আশীর্ব্বাদ করা।

লঙ্ঘোন—জ্বরাদি রোগে উপবাস।

লট্‌কানো—টাঙ্গানো।

লট্‌কোন—একরূপ ফলের পীত বর্ণের বীজ। ইহা হইতে রং হয়। লট্‌কনা।

লবোডঙ্ক—লাউডগা (দ) সাপ।

লয়া—নব, নূতন।

লহলা—রুইজাতীয় মৎস্যবিশেষ।

লা—নৌকা।

লাওয়া—লাজ (সং), খৈ। রাজপুত জাতির বিবাহে খৈ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

লাগা (ক্রি)—(১) ব্যথা পাওয়া, (২) বোধ হওয়া, যেমন—জিনিষটা কেমন লাগ্‌ছে।

লাঙ্গোল্যা—বিদে (দ)।

লাট্টু—লাটিম (দ)।

লালোচ্‌ (হি)—লোভ।

লাহা—(১) লাক্ষা, (২) স্নান (সং), গহান (প্রাং), গ্‌হানা (হিং), নাওয়া (দ)।

লাহারি—(১) কৃষকের জল-খাবার, (২) গালার দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারী জাতিবিশেষ।

লিখি—উকুনের ছানা।

লিভ্যাও (ক্রি)—নির্ব্বাণ কর।

লুটিআ—ঘটির আকারের ক্ষুদ্র জলপাত্র।

লেগে—(১) জন্য, (২) লাগিআ।

লেল্‌ছ্যা—লোভী, (হিং) লাল্‌চি।

লোক্—চুপ।

লোক্‌রি (হি)—জ্বালানি কাঠ।

লোগ্‌ঘি—প্রস্রাব।

লোটা (হি)—ঘটি।

লোট্যা—নটে শাক (দ)।

লোড়ি—লাঠি।

লৌকিত্যা—লৌকিকতা, নৌকতা (দ)।

ল্যাচা—ফুল ঝাঁটা (দ)।

ল্যাল্‌হা—যে অধিকবয়স্ক ব্যক্তি জিহ্বার দুর্ব্বলতার জন্য সমস্ত বর্ণ স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারে না, ছোট ছেলের ন্যায় আধ আধ কথা বলে।

শ

শানা—(১) মাথা, যেমন—আটা শানা। (২) বস্ত্রের তানা, টানা সূতা।

শানি—গবাদির ছানি, জাব (দ)।

শামাদান (আং)—মোমবাতির আলোকাধার।

শিয়াল—শৃগাল (সং), (প্রাং) সিআল।

শিওর—শায়িত অবস্থায় মস্তকের দিক্।

শিক—সরু লোহার দণ্ড। এ অঞ্চলের "হুঁক্যার শিক", দক্ষিণে "হুঁকোর গজ"।

শিকৃলি—শৃঙ্খল (সং), শেকোল (দ)।

শিকোর—মূল (গাছের)।

শিত্যান—বিছানার মাথার দিক্।

শিশ্‌কি—ক্ষুদ্র ছিদ্র।

শিস্তা—(১) সীসা, (২) শিশু কাঠ।

শুকৃট্যা—শুষ্ক।

শুঝা—দেখা। দক্ষিণে "বোঝা সোঝা"য় ব্যবহার আছে, পৃথক্ প্রয়োগ নাই।

শুবচনী—"শুভচণ্ডী"র পূজা।

শো—(১) (ক্রি) শয়ন কর্, (২) জাতিবিশেষ, ইহাদের জল অচল। দক্ষিণের শুঁড়ীদিগের সহিত এক কি না, বলা যায় না।

শোধা—জিজ্ঞাসা কর্।

শ্যাকোরকন্দ—(হিং) শকরকন্দ, যাহার কন্দ শক্কর অর্থাৎ চিনির ন্যায় মিষ্ট। দুই প্রকারের হয়—লাল ও শাদা। লালগুলি দক্ষিণে "রাঙ্গা আলু" নামে কথিত।

শিঁক্যা—শিকে (দ)।

শোঁআস—শশা।

স

সৎমা—বিমাতা।

সন্‌বাবা, সনমা—ভাই-ভগিনীর শ্বশুর শাশুড়ী।

সন্দেশ—মিষ্টান্ন। দক্ষিণে কাঁচাগোল্লা "সন্দেশ" নাম পাইয়াছে।

সন্ধ্যামুনি—কৃষ্ণকলি (দ) ফুল।

সপ্—দক্ষিণে সপ লম্বা, মাদুর ছোট। এ দিকে উভয় অর্থেই সপ।

সভাই, সব্‌ভাই—সকলে। (দ) সবাই।

সম্বোরা—পাঁচ ফোড়ন (দ)।

সরান্, সরোক—সদর রাস্তা।

সল্লা—(আং) সলা, পরামর্শ।

সহোবোৎ—সৎ লোকের সঙ্গ। (ফাং)

সং—প্রহসন (যাত্রার)। জঙ্গিপুরে দোলের সময় গীত-বাদ্য সহকারে লোকে নানারূপ সাজিয়া বাহির হয়, ইহাকেও সং বলে।

স'ৎ—সজ।

সহাত্তর—৭০। সাগ্‌রিত—শিষ্য। সাক্‌রেত (দ), শাগীর্দ্দ (ফাং)।

সাজ্‌না—সোজ্‌নে (দ)।

সা'ৎ—(আং) সাঅৎ=মুহূর্ত্ত। প্রথম শুভ মুহূর্ত্ত, দোকানদারের প্রথম বিক্রয়। বিজয়া দশমীর দিন প্রাতঃকালে শিল্পী ও কৃষক নানারূপ দ্রব্য গৃহস্থ-বাড়ী দিয়া পয়সা ও মুড়ি পায়। পুরোহিত আসিয়া ঘট-স্থাপনা করিয়া কিঞ্চিৎ পূজা-অর্চ্চনাও করে, ইহাকেও সা'ৎ করা বলে।

সাতভেয়া—ছাতার (দ) পাখী যেখানে থাকে। ৫।৭টি একত্রে দেখা যায়।

সাতাশী—(১) ৮৭, (২) রাজপুত জাতির বিবাহে ছায়ামণ্ডপে কলসের উপর সরাতে সরিষার পুঁটুলি বাঁধিয়া সরিষার তৈল জ্বালান হয়। এই আলোকাধারের নাম সাতাশী।

সাবেক—পূর্ব্বের। (আং) সাবিক।

সামাট—উদূখলের মুষল। এক খণ্ড কাষ্ঠদণ্ডের মুখে "সামি" অর্থাৎ লোহার বেড় আঁটা থাকে। তাই সামি+আঁটা হইতে "সামাট" বোধ হয়।

সামি—কাষ্ঠ বা বংশদণ্ডের অগ্রভাগে আঁটা লোহার বেড়।

সাম্‌নাসাম্‌নি—মুমুক-মুমুকী (দ)।

সারা—মাটির সরা (দ)।

সারোক—শালিক (দ) পাখী।

সাহান—সান (দ), ইঁট, চুন-সুরকী দিয়া বাঁধান স্থান।

সাহানি—শানাই (দ)।

সাহার—সার (জমীর)। সাঁওই—(হিং) সেওই। মাথা ময়দা চাউলের ন্যায় ছোট ছোট টুক্‌রা করিয়া শুকান হয়। ইহার পায়স করিয়া লোকে খায়।

সাহক্যার—(হিং)—ধন ।

সাঁকো—পুল।

সাঁজাল—সন্ধ্যায় গোশালায় ধূমোৎপাদন।

সাঁজো—দধিবীজ।

সাঁকালো—শীঘ্র।

সেঁদুর—(সং) সিন্দুর, (প্রাং) সেন্দুর।

সোঁৎ—স্রোত।

সিঝ্যানো—সিদ্ধ করা।

সিদ্ধোপোড়া—ভাতে ভাত (দ)।

সিধ্যা—(১) সিদে (দ), সরল। (২) রন্ধনের দ্রব্যাদি, যেমন— চাউল, দাইল প্রদান।

সিয়ান, সিয়ানা—চালাক, চতুর।

সিংর‍্যা—সিঙ্গারা (হি), পানফল।

সুবর‍্যা—খাদ-মিশ্রিত রৌপ্য।

সুরকি—(১) দৌড়, (২) ইষ্টকচূর্ণ।

সুরুক—(ফাং) সুর্‌খ্‌=রক্ত। এ অঞ্চলে বলে "লাল সুরুক", অতিশয় লাল।

সুস্তার—সুবিধা, উপকার ।

সোআরি—যান, পাল্‌কি।

সোনাগুধি—স্বর্ণগোধিকা, গোসাপ।

সোরকি—বর্‌সা।

সোরুচুকলি—চাউল দাইল মিশ্রিত রুটির মত পিষ্টক। সোঁখা—দ্রান লওয়া।

সোঁটা—বড় মোটা লাঠি। সোঁথ্যা—তীর্থযাত্রার সাথী।

সোঁধা—(সং) সুগন্ধ, (প্রাং) সুঅন্ধ। কোন দ্রব্য ভাজিলে এক প্রকার যে গন্ধ বাহির হয়।

স্যাঁকারো—স্বর্ণকার।

হ

হয়রান—শ্রান্ত। (আং) হয়রান=বিস্মিত।

হল্‌হোল্যা—হেলে (দ) সাপ।

হলো'দ্‌—(সং) হরিদ্রা, (প্রাং) হলদ্দা, (দ) হোলুদ্‌।

হাওলে—ধীরে।

হাওলোৎ—বিনা লেখা-পড়ায় অল্প দিনের জন্য ধার দেওয়া। (আং) হাওয়ালাৎ—কাহারও জিম্মায় রাখা।

হাডুগুডু (খেলা)—কবাটি খেলা (দ)।

হাল—(১) লাঙ্গল। (২) অবস্থা, দুরবস্থা (আং)।

হিল্সা, ইল্সা—ইলিস্ মাছ (দ)।

হুব্—সাহস। (আং) হুব্ব্=প্রীতি, বন্ধুত্ব, ইচ্ছা।

হুব্যাহুব—অবিকল। (হিং) হুবহু।

হুর‍্যাহুরি—গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি।

হুলিয়ে—(কুকুর) লেলিয়ে (দ)।

হেঠ্যা, হোঠ্যা—অবিবেচক।

হেত্যার—অস্ত্র। (হিং) হাথিআর।

হেব্যা—হাল্কা (দ)।

হে'লতে—সাঁতরাইতে।

হোক—"হউক" শব্দজাত। দক্ষিণাঞ্চলে যথায় "আচ্ছা" প্রয়োগ হয়, এ দিকে তথায় "হোক" কথার প্রয়োগ হইয়া থাকে। দক্ষিণে "রাম যেও বাবা আচ্ছা", এ দিকে "রাম যেও বাবা হোক"।

হোঁট্যা—হাঁটু (দ)।

হোঁস্যা—(হি) হাঁসুয়া, পাতলা ফলকবিশিষ্ট কাটারির ন্যায় অস্ত্র ; ইহা শস্যাদি কাটিতে ব্যবহৃত হয়। (দ) কা'স্তে।

হ্যাদে—আহ্বানে, মনোযোগ আকর্ষণে সম্বোধন-পদ। অর্থ—এ দিকে দেখ।

হ্যারে—এখানে।

হ্যালান—(১) (দ) হেলান, ঠেস্। (২) সন্তরণযোগ্য, যথা—হ্যালান জল=সাঁতারজল।

শ্রীরাখালরাজ রায়

'জ্ঞানদাসের পদাবলী' শীর্ষক প্রবন্ধের

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯৪	১০	বত্নাকর	রত্নাকর
১৯৫	২৩	অব্দের	শব্দের
২০০	৮	দিব	দিব্য
২০২	৩	সুলললিত	সুললিত
"		৫—৯ পংক্তিগুলি প্রবন্ধের উপসংহার না হইয়া ১৮৮ পৃষ্ঠার ২৯ পংক্তি-স্থিত 'পিনাক' ও 'কপিনাশ' শব্দের পাদ-টীকা হইবে।	

কয়েকটি প্রাচীন পল্লী-সঙ্গীত

বিগত পূর্ব্ববৎসর "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে" যোগ দিবার জন্য আমি কলিকাতায় আসিলে আমাদের "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে"র স্বনামধন্য সভাপতি পরমশ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় আমাকে চট্টগ্রামের পল্লী-সঙ্গীত সংগ্রহ করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু এত কাল নানা কার্য্য-ব্যস্ততায় তাঁহার সে আদেশ প্রতিপালন করিবার অবসর পাই নাই। সম্প্রতি সংগৃহীত কয়েকখানি প্রাচীন পুথির মধ্যে একখানি হস্তলিখিত সঙ্গীত-পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে তাহা হইতে কয়েকটি সঙ্গীত যদৃচ্ছাক্রমে সঙ্কলন করিয়া এবং জনৈক পল্লীবৃদ্ধের নিকট শ্রুত কয়েকটি সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিয়া চট্টগ্রামের প্রাচীন পল্লী-সঙ্গীতের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

সঙ্গীত-পুস্তিকাখানি শ্রীনীলমণি বিশ্বাস এবং শ্রীরামরত্ন দাসদাসস্য কর্ত্তৃক ১২০৭ মঘী সনে বিরচিত হইয়াছে। চট্টগ্রামে এখন ১২৭৭ মঘী সন চলিতেছে। সুতরাং এই পুথিখানির বয়স সত্তর বৎসর। কিন্তু ইহার লিখনভঙ্গী, বর্ণবিন্যাস, কাগজ প্রভৃতি দেখিলে ইহাকে আরও পুরাতন বলিয়া স্বভাবতই মনে হয়। লেখকদ্বয়ের কোন পরিচয় পুস্তকের মধ্যে পাওয়া যায় না। তবে রামরত্ন দাস লিখিয়াছেন, চট্টগ্রামের অন্তর্গত কোয়েপাড়া গ্রামে তাঁহার বাড়ী; সম্ভবতঃ উভয় লেখকই এক গ্রামবাসী হইবেন।

এই সঙ্গীত-পুস্তিকাখানির একটি বিশেষ বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার আছে। আমরা জানি, প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্য শ্যাম ও শ্যামা-সঙ্গীতেই সমধিক মুখরিত ও অলঙ্কৃত। কিন্তু এ পুস্তকখানির সমস্ত সঙ্গীতই রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও লব-কুশের বিষয়ে প্রণীত। এ সম্বন্ধে লেখকগণের মৌলিকতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ ভাবের সঙ্গীত-পুস্তিকা প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে ইতিপূর্ব্বে আর আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না, আমি অবগত নহি।

আমি প্রাচীন সঙ্গীত-পুস্তিকা হইতে যে সকল সঙ্গীত এ স্থলে উদ্ধৃত করিব, সেগুলির বর্ণবিন্যাসাদি অধুনা-প্রচলিত রীতির অনুসারে পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিয়া লইব না। সে অধিকার আমার নাই; কেন না, প্রাচীনতার হিসাবে এগুলি যেমন বিশেষ মূল্যবান্, তেমনি আদরণীয় ও রক্ষণীয়। তবে যে সকল শব্দ বুঝিতে পাঠকগণের একান্ত অসুবিধা হইবে, পাদটীকায় সে সকল শব্দ সংশোধন করিয়া লিখিলাম।

১ম সঙ্গীত

ও ভাই সত্য বল না কৈর না ছলনা ঃ প্রাণের ভাই লক্ষন গুনমনি রে ॥ যুগ্য রথ লইয়ে আলি রে আলয়ে কোন বনে রেখে চন্দ্রাননিরে ॥ মম মন্দ মতি ঃ পতি হয়ে সতি বিনা দোসে দিলাম বনবাস ঃ না ভাবিলাম ত্রাস ঃ। গর্ব্ত পঞ্চ মাস ঃ। করি গন্তনাস হইল সর্ব্বনাস ঃ। সনিআ কুজনার কুবচন ঃ। হিতাহিত চিথে[১] না করিলাম সোচনা[২] ঃ। তেজিলাম জনকনন্দিনিরে ॥ সিতা নিরক্ষন না করে লক্ষন প্রান জায়ে জায়ে না জায়ে লক্ষন ঃ। ইচ্ছা হএ মন গরল ভক্ষন করি মরি বিলক্ষন ঃ। পুন না করিব ঐ মুখ দ্রসন[৩] বিনা দোসে করিলাম ঔপক্ষন[৪] বনে দিলাম একাকিনিরে ॥

১। চিত্তে। ২। বিবেচনা। ৩। দর্শন। ৪। উপেক্ষা।

২য় সঙ্গীত

মা তোমার কি চিন্তে কর কি চিন্তে চিন্ত চিন্তামনি ইন্দিবর স্যাম ॥ তারে জে করে চিন্তে ঃ। তাহার হরে চিন্তে ঃ। সেই ধরে চিন্তামনি নাম ঃ॥ সদায় ঐ রাম জার ভাবনা ঃ। জে ভাবে ভাবে তাহারে •। সে ভাবে উহারে •। তাহার সে ভাব জান না ০॥ বিপদে নাহি জার ঐ পদ মনে •। অঘোর কাননে ভুবন বনে ০। রাষ্ট বেদাগমে •। বিসম দুর্গমে •। তারে তারে দয়াময় রাম ঃ॥

৩য় সঙ্গীত

মম প্রতি রাম ঃ কেন হলে বাম ঃ অবিশ্রাম মম মন শ্রীপদে ০। তব দাসি রহি ঃ কোন দুসী নহি•। বনবাসি হই কি অপরাধে০॥ অন্তাপী ঐ পদে নাহি হই দুসী ঃ জন্তপী হইএ থাকি দাসি দুসী ঃ॥ রাম হে ঃ। জারে স্থান দিলে পাএ ঃ তারে পুনরাএ কর কিবা হাএ হাএ মরি হে খেদে •। রাম তুমি গুরু গুনান্বিত দিনদয়ান্বিত ঃ বিচারে পণ্ডিত ঃ ভুবনে কহে ঃ॥ আমার কিবা কুআচার ঃ হয়েছে প্রচার ঃ কৈরে কি বিচার ঃ বনে দিলে ছলে০॥ যুখে থাকি কিবা মরিগো দুখে ঃ রাম নাম কভু না ছোরিব মুখে ঃ রাম হে ॥ যুন কৃপাধাম[১] দুর্ব্বাদলের স্যাম ঃ নৈলে কি রামনাম ঃ সে পরে বিপদে •। বিনা দোসে ভার্জ্যে ঃ বন মাজে তের্জ্যে ঃ যুখে যদি রার্জ্যে থাক হে তুমি। সতিবতি যতি ঃ গর্ব্ভেতে সন্ততি ঃ বিনা দোসে বনে দিলে হে শ্যামি ০॥ দয়াময় নাম বেদেতে প্রকাশ ঃ কিন্তু এখন তাহা না হএ বিশ্বাব•॥ রাম হে•॥ আমার গর্ব্ভ পঞ্চ মাস ঃ দিলে বনবাস তবে কিছু ত্রাস নাই স্ত্রিবধে ০॥

৪র্থ সঙ্গীত

গর্ব্ব কর না থর্ব্ব হইবে নিশ্চয় ঃ। সক্রঘন জদি আমাকে না চিন॥ আগে কর রন॥ এখনি পাবে তবে পরিচয়। আমরা বোন্দহি[২] তোমার বির্দ্ধ[৩] রামের জজ্ঞ হয়•। ধনুদ্ধর নাম ধর ঃ। জদি থাকে সাধ্য॥ তবে কর জুদ্ধ•। এথায় গালবাদ্য কর ঃ। তুমি ত রামের ভাই॥ কর রামের বড়াই॥ আমরা তোর রামের রাখি কি ভয়॥ অভিপ্রায় বুঝা জায়॥ সিষু দেখি তুচ্ছ হএ অতিসয়॥ আমরা লব কুশ নাম ধরি॥ না মরি সমরে গতি কি তোমারে ত্রিন[৪] হেন জ্ঞান করি ঃ। আজুকার সমরে বাচিবে না মরিবে এককালে পাটাইব জমায়[৫]॥

৫ম সঙ্গীত

.কোথা রসময়[৬] হরি কর (?) করুনানিদান•। ঔরিগন আইল দেখি হরিতে জানকির প্রান•॥ সিংহ রিরি ব্যাঘ্র রিরি ঃ বিসম ভুজঙ্গ অরি ঃ সব রিরি ভয়ঙ্করি কর হরি পরিত্রান॥ অরিগন হেরি হরি ঃ কর কৃপাময় হরি ঃ সব রিরি হর হরি কর করুনা প্রদান॥

৬ষ্ঠ সঙ্গীত

দেবর ডারাও ওহে বারেক ডারাও•। যুন লক্ষন ধানুকী আমি শ্রীরামের জানকী•॥ কার কাছে রাইকে জাও তাএ বৈলে জাও•॥ ডারাও ডারাও দেবর ডাকিলে যুন না ভএ কিহে আমি তোমার সঙ্গে জাবো না •। বারেক ডারায়ে যুন গুটী দুই কথা•। অহে

১। কৃপাধাম—কৃপাময়। ২। বেঁধেছি। ৩। বৃদ্ধ। ৪। তৃণ। ৫। যমালয়।
৬। এ সময়। ৭। অরিগণ।

সিতানাথের সিতা তুমি ফেলে জাও হে কোথা০। অহে লক্ষন রামের তরে কঠিন হৃদয়। ভায়াজায়া১ বৈলে তোমার দয়া নাহি হএ ০। বনে দিলে তব ভায়া ০। গর্ব্ববতি আপন জায়া ০। তুমি ত তাহান ভায়া ০। নাহি দয়ামায়া ০। দেবর বনে দিলে ক্ষেতি নাই : লক্ষন আমি বলি তাই ০। কাহার আশ্রমে রভো ভয় পাই ০। ভালো হয় স্তববন২ করাইলে দরসন আনিএ ছলে দেবর ফেলে জাও ০। তুমি মনেতে ভাইব না সঙ্গেতে জাব না ০। তোমার রামের কিরায়৩ একবার ফিরে চাও ॥

৭ম সঙ্গীত

এ কি ধন্তে কার কন্তে কি লাবন্যে মরি হাএ হাএ॥ একা কি জন্যে এ ঘোর অরন্তে রাম রাম বৈলে উঠে পরে ধাএ॥ তরিত জরিত ভরিত রূপ০। সসোধরাধরে সুধার কুপ :। আসিয়া পসিল মৃগসী লুপ্ত তত্র গাত্র মাত্র নেত্র দেখা জাএ :॥ সিন্দুরবিন্দু অধর ভালে ০। কেসর বেসর নাসাএ দোলে ০। তাহে কন্তমূলে। সোভে কর্ণ্যফুলে। সোভে লোভে কত কামে মোহ জাএ ॥ করিকুম্ভ জিনি বক্ষবাকাখানি হরিমাঞ্জা জিনি কটী সোভনি। রামরম্ভাতরু জিনি উরু গুরু চরন সরনে কি বনের প্রাএ ॥

৮ম সঙ্গীত

কেনে গো কাননে একাকী ভ্রমনে দু নয়নে বহিছে বারি ০। কিবা ভাইবে মনে ০ কান্দেছ আপনে ০। রাম রাম বৈলে ফুকরি ফুকরি ০॥ পতিত ভুসন গলিত কেস বসনাভরন কিছু নাই লেস ০। বনে বনভেষ দেখি গো বিসেষ ০। রাম হাসিকেস(?) তব কিঅ দেবি ০॥ রাজার নন্দিনি ০। মনে হেন গনি ০। কেনে একাকিনি ০। হইএ দুক্ষিনি। গলিতনয়নি এ বিন্দুবরনি ০। কান্দে কেনে বলি হরি হরি ০॥

৯ম সঙ্গীত

আমাকে বোল রে বাছা হনুমান। বল রে স্বরূপে হইল রন কিরূপে॥ দেখ তেনের(?) আমা সেই বল স্বন (?) আমাঅ অনাথি করিলে॥ পাথারে ভাসাইলে॥ আমার কুলের সত্রু হইল দুইটী কুসন্তান॥ কিরূপে তোমারে করিল বন্দন॥ তাহি বল বাছা পবন-নন্দন॥ কিরূপে মৌল ভরত সত্রুঘন॥ মম প্রান সম দেবর লক্ষন॥ কিরূপে সমরে সত্রুঘন মরে॥ গেল কিরূপে রঘুনাথের গেল প্রান॥

১০ম সঙ্গীত

চল ঘরে জাই॥ আর কেহ নাই :॥ তুমি আমি দুটী ভাই বিনে॥ মনে হেন জ্ঞান॥ বুঝি জাবে প্রান॥ ধানুকি লক্ষনের ধনুর্ব্বান॥ কাল জম প্রায়॥ ঐ দেখা জায়॥ এ কি হোল দায়॥ না দেখি উপায়॥ হাএ প্রান জায়॥ কি বিধি ঘটায়॥ না সেবিলাম মাএর চরনে একেতে দুঃখিনি॥ জানকি জননি॥ লবকুস বলে সদায় পাগলিনি॥ তাতে জদি তুমি আমি প্রানে মরি॥ দুঃখিনিকে কে মা বলিবে বলে॥

১১শ সঙ্গীত

সুন গুনধাম রাম বাম সিতা প্রতি হইয় না ০। তোমার দয়া হএ না০। বিনা দোসে বনবাসে দিবে অঙ্গনা ০। সুন : শ্রীরাম ধানুকী ০। বিবচনা হইলো এ কী ০। ঐ পদ

১। ভ্রাতৃজায়া। ২। তপোবন। ৩। দিব্যে, শপথে।

বহি মা জানকী অন্য জানে না • ॥ জে সীতার কারনে তবো • । নাম হইল রাম রাঘব • । সে সিতাকে ভিন্য ভাব • । কি বিবেচনা • । সিতা জদি অপরাধি হইএ থাকে গুননিধি • । বনে দেওা১ নহে বিধি• ॥ যুন মন্ত্রনা • ॥ তব কানন গহিরে জাইতে বৈল না • । একে সিতা কুলবতি • । পঞ্চ মাসের গর্ত্তবতি • । হেন সিতা তেজে পতি • । প্রানে সহে না • ॥ পাএ ধরি গলবাসে • । এই ভিক্ষা দেও দাসে • । সিতা মাকে বনভাসে জেতে বৈল না • ॥

একবার আমি সমুদ্রতীরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ মুসলমান গৃহস্থ আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে গান করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি সেই দিগন্তপ্রসারিত বেলাভূমির উপরে বসিয়া অনন্ত আকাশ ও সাগর প্রতিধ্বনিত করিয়া, অশ্রান্ত জলকল্লোলের তালে তালে আপনার মধুর কণ্ঠ মিলাইয়া গাইতে লাগিলেন ;—

১। (ওরে) যাইবার কালে সঙ্গে নিবা কিরে ভাই সদাগর,—অসমের২ সারথী কেও নাই। নওয়া মুকাখানি৩ লৈয়া, বাণিজ্যেতে আইলাম ধাইয়া, ঘাটেতে পুরানা হৈয়া যায় রে ভাই সদাগর। ভবে আসিয়াছ মন, কামাইলা কিবা ধন, যাইবার কালে সঙ্গে নিবা কি। (রে ভাই সদাগর)। নির্ব্বোধ জল্লালে বলে, মুকাটী আন্যা দি পালে, ঠেকিল মুকা ঠাণ্ডা বালুর চড়ে। (রে ভাই সদাগর।)

২। গ্রাম ও পরবাসী রে। (ঘোষা) কারে কইমুম দুঃখের কথা কেবা শুনে কানে। দরেয়াতে ধূল গুঁজরে ভিও মারে বানে। উজান ঘাঁড়ায় ধূল গুঁজরে পিড়া লই যায় হোতে। গঙ্গা মরে জল তিয়াসে, বরমা মরে শীতে। লাহুর দরিয়ার মাঝে নিরঞ্জনের খেলা, পাথর ভাসিয়া উড়ে, তল পড়ি যায় সোলা। লাহুর দরিয়ার ঢেউ বেঙে ধরি খায়, পাথর ছেদিল ঘুণে কেবা প্রত্যয় যায় ॥

৩। আগমের ভেদ তোমরা জান পণ্ডিত। মরণের ভেদ তোমরা জান পণ্ডিত। বারুইগিয়ে গাছ কোঁদাতে বারুইরে কোঁদায় গাছে। দাঁয়বা৪ ছিড়ি দড়ি ধাইল, জাল্যারে দৌড়ায় মাছে ॥

জোম পহরে৫ ধান হুয়াত৬ দিল, পাতিলাত দিল বাড়া৭ মাদার গাছে ধরিয়াছে আঠ্যা কলার ছড়া আঁআঁসত৮ পাঁআস (?) নিল পাঁআস রৈল ডালে। তিন গরু দি নয় হাল চয়, ছিবায়৯ মানুষ গিলে।

৪। মন, সাধু জেইনে ছিলাম তোরে। এ কি করিলি আর, এ কি ব্যবহার, যে কর্ম্ম তোমার জানাব কাহারে। আশ্বাসে বিশ্বাস জন্মাইয়ে আমার, মহাজ্ঞান ধন করিলি অধিকার, শেষে ভুলাইলে কালীর নাম আমার, এ দেহ-ভাণ্ডার অর্পিলি শত্রুরে। জ্ঞান-মাজষ্ট্রের দরখাস্ত করিব, ব্রহ্মময়ীর পাশে যাইতে তোরে নিব, তিনটি কাল তোমায় আবদ্ধ রাখিব, তারিণীর শ্রীচরণ-কারাগারে।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

১। দেওয়া। ২। অসময়ের। ৩। নূতন নৌকাখানি। ৪। গাভী।
৫। জুমিয়াদের পাহাড়, যেখানে জুমিয়ারা শস্য বপন করে। ৬। শুকাইতে।
৭। ধানভানা। ৮। আকাশেতে। ৯। বর্শীর ছিপ।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-প্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। **সূচী**—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, দর্শতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

উল্লিখিত তিনখানি গ্রন্থের প্রকাশক—**শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঘোষ**

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী-সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স-জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—**এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং**, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (বঙ্গানুবাদ)

টীকা ও পরিশিষ্ট সমেত। সাধারণের পক্ষে—৩৲, সদস্য পক্ষে—২॥০, মূল্যের বিশেষ বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

প্রকাশক—**বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।**

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—**গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্**, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলীর মূল্য কমাইয়া সাধারণের ও সদস্যগণের জন্য অধিকাংশ স্থলে 'অর্দ্ধেক' ও 'সিকি' করিয়া দেওয়া হইল।

		সাধারণপক্ষে পূর্ব্বমূল্য	সাধারণপক্ষে বর্ত্তমান মূল্য	সদস্যপক্ষে বর্ত্তমান মূল্য
১।	কৃত্তিবাসী রামায়ণ (অযোধ্যা ও উত্তরকাণ্ড)	১৲	৷৷০	৷০
২।	বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	১৷৷০	৸০	৷৵০
৩।	ছুটিখানের মহাভারত	১৲	৷৷০	৷০
৪।	রাসায়নিক পরিভাষা	৷৵০	৶০	৴১০
৫।	কাশীপরিক্রমা	৸০	৷৵০	৶০
৬।	নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ	৶০	৵০	৴০
৭।	রামায়ণ-তত্ত্ব (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ)	১৷৷০	৸০	৷৵০
৮।	কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল	৷০	৵০	৴০
৯।	বৌদ্ধধর্ম্ম	৵০	৴০	৻১০
১০।	নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজপরিক্রমা	১৲	৷৷০	৷০
১১।	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	৵০	৴০	৻১০
১২।	শূন্যপুরাণ	৸০	৷৵০	৶০
১৩।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	৫৲	৩৲	২৷৷০
১৪।	শতপথ-ব্রাহ্মণ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)	৫৷৷০	২৸০	১৷৵০
১৫।	পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু (সচিত্র)	৷০	৵০	৴০
১৬।	পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর (সচিত্র)	৷০	৵০	৴০
১৭।	বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয় (সচিত্র)	৷৵০	৶০	৴১০
১৮।	বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা (১ম ও ২য় খণ্ড)	২৷৷০	১৷০	৷৷৵০
১৯।	বাঙ্গালা ভাষা (ব্যাকরণ)	১৷০	৷৷৵০	৷৴০
২০।	বাঙ্গালা ভাষা (২য় ভাগ) (১, ২, ৩ খণ্ড) শব্দকোষ	৪৷০	২৷০	১৷৵০
২১।	মহিলা-ব্রতকথা	৷৵০	৶০	৵০
২২।	কল্কিপুরাণ	১৷০	৷৷৵০	৷৴০
২৩।	প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	১৲	৷০	৷০

পুস্তক পাইবার ঠিকানা,—২৪৩।১ নং অপার সারকুলার রোড,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, কলিকাতা।

সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী

১। **কবি হেমচন্দ্র (সচিত্র)**—বঙ্গের সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় কৃত কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের সমালোচনা। প্রবীণ ও প্রাচীন সমালোচকের এই নূতন গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে পরম আগ্রহে গৃহীত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ৮৩, মূল্য ৷৶৹ দশ আনা।

২। **বিদ্যাপতির পদাবলী**—সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। এই গ্রন্থ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের ব্যয়ে ও নগেন্দ্র বাবুর সম্পাদকতায় পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধে কবির জীবনী, কালনির্ণয়, পাঠনির্ণয়, পদনির্ব্বাচন, আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ের বহু গবেষণার মীমাংসা আছে। এতদ্ভিন্ন রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ৮৪০টি পদ, হরগৌরী-বিষয়ক ৪৪টি পদ, গঙ্গাবিষয়ক ৩টি পদ, নানাবিষয়ক প্রহেলিকার ২০টি পদ ইহাতে আছে। পত্রাঙ্ক ৫৫২; মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা। পরিষদের সদস্যপক্ষে ৩৲ চারি টাকা।

৩। **গৌরপদতরঙ্গিণী**—সম্পাদক পণ্ডিত জগদ্বন্ধু ভদ্র।—এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এ সকল পদ বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্ত্তৃগণের রচিত। অনেক পদ নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ১৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী বৃহৎ ভূমিকায় ঐ সকল পদকর্ত্তাদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ ভূমিকায় বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্ঘণ্ট আছে। পত্রাঙ্ক ৫৬৮, মূল্য ২৲ দুই টাকা, কিছু দিনের জন্য সকলকেই ১৲ টাকা মূল্যে দেওয়া হইবে।

৪। **বাঙ্গালা শব্দকোষ**—(৪র্থ খণ্ড)। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্‌এ, বিদ্যানিধির সঙ্কলিত। মূল্য—সদস্য পক্ষে—৸৵০ আনা, সাধারণ পক্ষে—১৲ এক টাকা।

৫। **মায়াপুরী**—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ-প্রণীত। মূল্য।০ চারি আনা, সদস্যপক্ষে ৵০ দুই আনা।

৬। **বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা (৩য় খণ্ড)**—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস রায় বাহাদুর, সি আই ই কর্ত্তৃক অনূদিত। মূল্য পরিষদের সদস্যগণের পক্ষে ৷৹ আনা ও সাধারণের পক্ষে ১৲ টাকা। **ঐ ৪র্থ খণ্ড।** মূল্য—সদস্য পক্ষে।৵০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ৷৹, সাধারণ পক্ষে ৸৵০ আনা।

৭। **সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুম**—স্বর্গীয় কৃষ্ণানন্দ ব্যাস-সংগৃহীত৭ ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রালোচনা ও নানা প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত নানা সুরের প্রাচীন গান-সংগ্রহ। আকার বৃহৎ, ডিমাই ৪ পেজী, ৭০৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৫৲ টাকা।

৮। **প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম ও ২য় ভাগ**—শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল করিম সঙ্কলিত। মূল্য সদস্যপক্ষে যথাক্রমে।/০ পাঁচ আনা ও।০ চারি আনা মাত্র। সাধারণ-পক্ষে ৸৵০ আনা ও ৷৹ আনা।

৯। **সত্যনারায়ণের পুথি**—(শ্রীকবিবল্লভ-প্রণীত)—শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল-করিম সম্পাদিত। মূল্য—সদস্য পক্ষে ৵০, শাখা-সভার সদস্যপক্ষে ৵১০, সাধারণ পক্ষে ৶০।

১০। **মৃগ-লুব্ধ**—দ্বিজ রতিদেব-বিরচিত। শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল করিম-সম্পাদিত। মূল্য—সদস্য পক্ষে ৶০, শাখা সভার সদস্য পক্ষে।০, সাধারণ পক্ষে।/০ আনা।

১১। **জ্যোতিষ-দর্পণ**—শ্রীহট্ট, এম্ সি কলেজের অধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বিএ প্রণীত। ইহাতে জ্যোতিষের কঠিন বিষয় সকল অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মূল্য—সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১।০ আনা।

১২। **দুর্গামঙ্গল**—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত। মূল্য—সদস্য পক্ষে ৷৹ শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ৸৵০, সাধারণ পক্ষে ১৲ টাকা।